# হাওয়ার নিশানা

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

প্রকাশক :
শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী
চিত্রিতা প্রকাশিকা,
৯এ, কার্তিক বোস লেন,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫২—চৈত্র
মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীনলিন চন্দ্র রায়
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ,
১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বাবাকে :

যে উষ্ণ, উজ্জ্বল ও প্রাণবান চরিত্রটির প্রতি আমি আবাল্য অনুর
নিঃসীম অন্তরঙ্গতায় যে হৃদয়টির প্রতি আমি নিঃস্ব[illegible] ;
বন্ধুদের মধ্যে যিনি অকপট ও ঘনিষ্ঠ ;
আমার প্রথম বই উৎসর্গ করলাম তাঁকে।

# পরিচ্ছেদ সূচি ঃ

# ভূমিকা

আমার মনে হয়,—ভূমিকা,—প্রত্যেক লেখকেরই নিজেদের বই সম্বন্ধে লেখা অবশ্যকর্তব্য হওয়া উচিত। অবশ্য বলবার মত যদি কিছু থাকে। যে পারিপার্শ্ব, অবচেতনার যে সব খুঁটিনাটি ও ঘাত-প্রতিঘাত লেখকের মানসকে অভিব্যঞ্জনা দেয় পাঠকের দিক থেকে আগে-ভাগে খানিকটা জানা থাকলে লেখক ও পাঠকের সংযোগটা অনেক জায়গায় সবল হয়ে যায়।

আমার এই বইটি কোনো একটি ধারাবাহিক সময়ের মধ্যে লিখিত হয় নি। মহত্তর যুদ্ধের পূর্ববর্তী আমলে বইটির সূত্রপাত। তথাকথিত শান্তি ছিল বইটির পটভূমিকা। মধ্যবিত্ত জীবনে তখনো কোনো টোল খায় নি। আমার উপন্যাসের প্রথম নায়কের জন্ম সেই যুগে। উঁচকপালে, উন্নাসিক। বাইরের গড়নটা ডিমোক্রেটিক হলেও হাড়ে হাড়ে এ্যারিস্টোক্রাট। চরিত্রটি বুদ্ধিপ্রধান। সমাজব্যবস্থায় সেই পূর্বতন সংস্কৃতির অব্যাহতির ফলে আবেগের মধ্য দিয়ে চরিত্রটি আবৃত্ত। ঘটনাগুলোতে মনস্তত্ত্বের ঝোঁক বেশী পড়েছে। কারণ, এর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের ছাপ আছে। দৃষ্টিভঙ্গিটা সিনিক্যাল। বিশেষ করে ম্যানারিজিমের কালোয়াতির দিকটা।

এরপর এলো সাজ সাজ রব। রাশিয়া মার্কা বই এদেশে আমদানী হবার বাধা ঘুচেছে—বেপরোয়া পড়া সুরু হয়েছে। একটু লেখাপড়া জানা মেয়েদের ভেতরই ঢেউটা জোরালো—ফলে অরুণা পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি হোলো। ঝকঝকে চেহারা, চকচকে বুদ্ধি: আবেগগুলো স্পষ্ট, খাড়া—সঙ্গীনের মত উঁচানো। নির্ভেজাল চরিত্র। মনের নীচে কোন আলো-হাওয়া-হীন চোরকুঠরী নেই। কিন্তু ক্রমশঃই তার চরিত্রের হাস্যকর দিকটা চোখে পড়ল অনুভার চরিত্রের প্রতিঘাতে। অনুভার ছায়া বিকাশের মধ্যেই লুকানো ছিল। অনুভা হচ্ছে বিকাশের চরিত্রের পরিপূরক। কিন্তু যখন যুদ্ধ চলেছে তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম

অনুভাব চরিত্রের আর একটা পৃথক ভাব,—যেখানে সে সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ও উৎসারিত। জীবনের প্রতিদিনকার ক্ষতির মূলে যে নিরালম্ব বেদনাবোধ উটপাখীর মুখ গোঁজবার সেই হল একমাত্র ঠাঁই! বিকাশ তার কাছে এলে থমকে যায়—কথা হারিয়ে নিঃসহায় চেয়ে থাকে—অনুপমও খানিক না বসে পারে না। কিন্তু অনুভা আসলে চরিত্রই নয়, ওর মূল উৎপত্তি যা আমার কল্পনায় গড়ে উঠেছিল তা ছায়া, ছড়িয়ে থাকা প্রতিভাস।

যুদ্ধ বেধে গেল। দেশে পার্টি পলিটিক্সের হৈ-হৈ রৈ-রৈ। অনুপম চাকরী ছেড়ে দিলে। পার্টিতে যোগ দিলে। ভাবনা ছেড়ে কাজ। অথচ কাজে আর চিন্তায় মিল খায় না। সমাজব্যবস্থায় নীতি পরিবর্তন হচ্ছে: দ্রুত, দুরন্ত, দুর্নিরোধ্য। অনুপমের দরকার পড়ল।

ত্রৈলোক্যবাবু আসলে অনুপমের চরিত্রের খুঁটি, অনুভার প্রকৃতির মানদণ্ড। ত্রৈলোক্যবাবু অবচেতনার মত অন্ধকার—অনুপমের ঐখানে লড়াই। যেখানে সে স্বীকৃতি পেল সেখানে ত্রৈলোক্যবাবুর আর দরকার রইল না। অনুভারও তাই। অনুভা ও অনুপম আসলে একই। ভাই বোনের স্বভাবের স্রোত একই অবচেতনার গভীরে। উপরে কারুর ঢেউ কারুর আভা।

আর একটা চরিত্র—বড়মা: সুজাতা। আমার বইটির ভিতর এইটিই নিছক কল্পনার বিলাস। রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি অখণ্ড ও নিছক প্রভাব ঐ চরিত্রটির সর্বাঙ্গে। পটভূমিকায় আভাসে রেখে গেলেও চলতো। কিন্তু এসে পড়েছে ঠিক এক ফাঁকে আর এসে সমস্ত জিনিষটার হাওয়া বদলে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখলুম বিকাশের সঙ্গে জুড়ে না দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, বিকাশের চরিত্র বিশ্লেষণে বুঝলুম ব্যক্তিত্ববাদটা এর আসল কথা: ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ বংশধর। পরে ভাল করে লক্ষ্য করেছি সমগ্র বইখানির ভারকেন্দ্রের দিক থেকে সুজাতা অনস্বীকার্য ও অনন্যরূপা।

ক্রমশঃ চরিত্রগুলোর ক্ষেত্র বাড়লো—গতি প্রখর হল: হাওয়ার যে চাপ চারিয়ে থাকে অলক্ষ্যে চেপে বসল ও কোণ তৈরি করলে। চরিত্রগুলো আপনা থেকেই দানা বাঁধল। দেখলুম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারলে এটি একটি চেহারা নেবে।

শান্তি থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের যে পথটি সমাজের সরু গলি থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের বিস্তীর্ণ ফ্রণ্টে এসে মিশে গেছে তার বিকলনটি অন্তত বেশ ফুটবে। উপন্যাসে ঘটনার কাল আগষ্ট আন্দোলনের অব্যবহিত কাল আগে পর্যন্ত ধরলে সীমানা ঠিক বোঝা যাবে।

ইচ্ছা ছিল উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা। 'পরিচয়' পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি। শুনলাম এবং পরে জানলাম পরিচয় পত্রের শোচনীয় স্থানাভাব। তবু তিনি আশাতীত সৌজন্য সহকারে এবং সম্পাদক বিরল বিনয়ের সঙ্গে আমার পাণ্ডুলিপিটি দেখেন এবং আমি দাবী করতে তিনি মন্তব্য করেন। আমার ঘনিষ্ঠ মহলের বাইরে তিনি প্রথম পাঠক ও সমালোচক। তার মন্তব্যগুলিকে আমি ভবিষ্যৎ পাঠক ও সমালোচকদের প্রতিনিধি স্থানীয় কল্পনা করে ভূমিকা লিখতে চেষ্টা করছি। বইখানি পড়বার আগে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—বিষয়টা কি? একটু দ্বিধায় পড়ি। এক কথায় প্রায় তিনশো পাতা বইয়ের মর্যাল বলা—কারণ, বিদ্যালয়ের সংস্রব অনেকদিন ত্যাগ করেছি এবং বেশী বললেও বিজ্ঞাপন হয়ে পড়ে, কটু শোনায়। একটু ভেবে বলি—এক কথায় বলা শক্ত। তবে একান্তই যদি বলতে হয়—একটু ব্যাপক অর্থে মিডল-ক্লাস-স্যোসিয়-পলিটিক্স বলাই নিরাপদ। অতঃপর বইখানি পড়ে তিনি যা মন্তব্য করেন তা এই:

১। আপনি লিখতে জানেন। কলম শক্ত। বিদেশী সাহিত্যের ছাপ জোরালো প্রথম দিকটায়।

২। মধ্যবিত্ত জীবন সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি গভীর নয়। বুদ্ধির দিকটায় আপনার আসল আকর্ষণ। ঐখানটাতেই আপনার জোর। কিন্তু মধ্যবিত্ত সংসারে প্রতিদিনকার জীবনটাই আসল। এখানকার আশা ও আশাভঙ্গের মধ্যে অনেক প্রতিশ্রুতি আছে। সাহিত্যের একটা মস্ত খোরাক ওটা।

৩। আপনার লেখা বেশ কিছু প্যাশনেট্।

৪। লেখা আপনার যে পরিমাণে এ্যাডভানস্‌ড বানান সেই পরিমাণে দুর্বল—অত্যন্ত আশ্চর্য।

উত্তর :

১। প্রথমটার উত্তর না দিলেও চলবে। শেষের বাক্যটির উত্তর আগেই দিয়েছি।

২। আমি আঁচে যা বুঝেছিলাম তা' এই যে, তিনি আসলে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উৎকৃষ্টতর সংস্করণ চাইছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগরিক অনুক্রমণ। সে কথাও পরে হয়েছিল। যাক, সে অন্য প্রসঙ্গ। গোপালবাবুর লক্ষ্যটি ঠিক যায়গায় পড়েনি। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিদিনকার জীবন আসলে আমার বক্তব্যই নয়। সুতরাং গভীর কি অগভীর সে দিক দিয়ে দেখলে চলবে না। যা' বলেছি সেখানে ঐ দুটো জিনিষ কতটা আছে দেখলেই আসল সমালোচনা হয়। লিটন স্ট্রেচির Books and character বইতে এক জায়গায় পড়েছিলাম—আগের যুগের থেকে এ' যুগের সমালোচনার শোচনীয় পরিবর্তন · যা বলেছে তা কেমন হয়েছে থেকে, কি বলেছে এবং তা' বলা উচিত কি না। আমি অবশ্য স্ট্রেচির কথায় খুব সায় দিই না। কিন্তু গোপালবাবু আমার ভঙ্গীর দিক থেকে জিনিষটা দেখেননি, তাঁর ইচ্ছার দিক থেকে মন্তব্য করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আমার জানা দু'খানি বই আছে যার আবহ প্রকৃতির সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে। প্রকারান্তরে খানিকটা প্রভাবও আছে। প্রথমটি, ধূর্জটিবাবুর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস। দ্বিতীয়টি, অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' নামক উপন্যাসগুলি। ধূর্জটিবাবুর বইটিই বিশেষ ছাপ ফেলে আমার মনে। ব্যক্তির উপর পড়ছে ঘটনার চাপ ফলে চরিত্র তৈরি হচ্ছে : ভাঙছে, গড়ছে অথচ কাটা কুটিতে গতি থামে নি; আমার মনে হয় উপন্যাসের এ একটা নতুন সম্ভাবনা, একটি উজ্জ্বল আঙ্গিক। অন্নদাশঙ্করের আঙ্গিক আসলে উপলভ্যমান সংজ্ঞা · জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার মত। আগে থেকেই চরিত্রগুলি তৈরী—ঘটনার ভিড় ঠেলে ঠেলে চরিত্রগুলোর হেঁটে যাওয়াটাই হল বক্তব্য। দুটি ক্ষেত্রেই পটভূমিকা মধ্যবিত্ত সমাজ : চরিত্র বুদ্ধিজীবি, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়। আমার বক্তব্যটা ছিল এই দিক দিয়ে। প্রতিদিনকার মধ্যবিত্ত জীবন সম্বন্ধে গোপালবাবুর কথাটি কিন্তু আমাকে আরাম দিয়েছে।

অনেক বেহেড্ মার্কসবাদীদের উক্তি প্রত্যুক্তি স্মরণ করে মনে শান্তি পেয়েছিলাম। গোপালবাবুর প্রথম লেখা আমি পড়ি 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। চিন্তায় মার্কসবাদী হলেও ঐতিহ্যের ধারাটি যে এঁ'নার কাছে এখনো ভারতীয় তা' বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার হেতু অন্য জায়গায়, প্রতিদিনকার জীবন নয়. এই মধ্যবিত্ত সমাজে দু'টো মুখ দেখতে পাই—যারা ভাবনার মধ্যে, চিন্তার বিলাসের মধ্যে— আসন্ন ধ্বংসের দিকে তাদের গতি; অন্যটা কর্মের মধ্যে, সক্রিয়তার মধ্যে—জীবনের অন্য কেন্দ্রে উত্তীর্ণ হবার যাদের প্রয়াস—মাঝখানটায় একটা নিস্ফল শূণ্য। আমি প্রকাশ করতে চাই শূণ্যকে—আমার কাছে আমার পদ্ধতিই ভালো—প্রতিদিনকার জীবনের ছবি এঁকে এঁকে এই শূণ্যে পৌঁছানো হয়ত যায় কিন্তু তার পদ্ধতি আলাদা, তার আবহাওয়া অন্যরকম। আমার যুক্তি এই :

যে কোনো যুগের সাহিত্যই যে অর্থনীতির উপর আস্থাবান এই গভীরতম সত্যটি আমরা জানলাম যখন যুদ্ধের ঝড় আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ভিক্টোরিয়ান যুগটা এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। সুখ আর ঐশ্বর্যের চূড়ার উপর জ্বলছে সাম্রাজ্যবাদের সোনার সূর্য। টেনিসন রাজকবি। গ্লাডস্টোন রাজনীতিবিশারদ। জীবনের ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ এসেছে, ছন্দে গভীর লাবণ্য—চারিদিকে খুসি, চারিদিকে স্বস্তি। যেন লোটাস-ইটারের দেশ। কিন্তু এর মধ্যেও কয়েকটি চিন্তাশীল সাহিত্যিকের যেমন ওয়েলস, গলস্ওয়াদি প্রভৃতির লেখায় এক একটি আকস্মিক ঝলকানি দেখা যেত এই বন্ধ্যাত্ব ভেঙে ফেলবার, এই সুখ আর সংস্কারের জড়ীভূত স্তূপ বিদীর্ণ করে ফেটে ওঠবার কিন্তু কেউই আমরা বুঝতে পারিনি কি সেই অবচৈতনিক উৎক্ষেপ যতক্ষণ না এলো যুদ্ধ। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' কথাটা উদ্ভব হয়েছিল সেই সমৃদ্ধির যুগে। লড়াই এসে সব ভেঙে দিলে। মানুষের এতদিনকার ধারণাগত নীতিবোধ, সৎ-অসতের সামাজিক বিভেদ, ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্কিক মানদণ্ড পালটে গেল। সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা গভীর যন্ত্রণার মধ্যে গেল বদলিয়ে। যে ধর্মকে আমরা আধ্যাত্মিক মনে করে উৎসাহিত হয়ে উঠতুম তার মনোবিকলনে জিজ্ঞাসা কঠিন হয়ে ফুটল। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যই হল আধুনিক সাহিত্য। আধুনিক কথাটা আপেক্ষিক। আপেক্ষিক সত্যের গতি

ডায়লেকটিক্যাল। আর সাহিত্য কথাটির মানে অবিসংবাদীতভাবে আজো নির্ণিত হয়নি। সাহিত্যই জীবনের মুকুর কিংবা জীবনই সাহিত্যের ভাবকেন্দ্র প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক—এর ইতিবৃত্তটা আধিভৌতিক। সময় ও কালের মধ্যে আমরা গতির নির্দেশ পাই। আধুনিক সাহিত্যে সেই গতিটা আসল—বাকীটা অধুনা ও অধিক।

শান্তিই সৃষ্টির আদিম বীজ। আমার মনে হয় এটি একটি সার্বভৌমিক তত্ত্ব। সেই যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতে উৎসাহ পেত যে কাব্য বা সাহিত্য মানে এমন এক প্রকার মানসিক নিঃস্রাব—যা' সৃষ্টি হয় মনের দুর্লক্ষ্য, রহস্যময় অবচেতনায়—সেখানে বুদ্ধির আলো না পৌছনাই ভাল।

বের্গস হল এদের দার্শনিক মুখপাত্র। তাঁর মতে সময়ের স্রোতে আমাদের যে স্মৃতি ভাববাহী তার মধ্যেই আত্মার পরিমুক্তি ঘটতে পারে। অবশ্য বের্গসর ব্যাখ্যায় সময়ের মধ্যে যে স্মৃতির পুঞ্জিভূতি তা সম্পূর্ণ বোধির অন্তর্গত তাই তার গতি দেশকালের সীমা অতিক্রম করে। বিশ্লিষ্ট হলে বুদ্ধির চমক লাগে বটে কিন্তু সেটা স্নায়ুর চাঞ্চল্য, যৌন তৃপ্তির মত · তাই একটা পর্যায়ে এসে পড়ে: সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য। ক্রোচে অবশ্য আর একটু এগিয়ে যান। তার মতে প্রত্যেক অনুবোধের মধ্যেই একটি ছন্দিল গতি আছে, আর সত্যের যে স্বরাট স্বরূপ তার মুখোমুখি দাঁড়াবার অধিকার কেবল শিল্পিরাই পায়—তাদের অনুভূতির আন্তরিকতায়।

যাই হোক এত গেল একপক্ষের উক্তি। ইতিমধ্যে আবার যুদ্ধ বেধেছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সাহিত্যকে বিচার করে দেখতে গেলে একটা জিনিষ প্রথমেই চোখে পড়ে। ক্লাসিক রীতি থেকে অত্যন্ত দ্রুত এবং আশ্চর্য রকমের অবিমৃষ্যকারিতায় এক পাশে সরে গেছে কিন্তু নতুন কোন পটভূমি তৈরি হ'য়নি। এর কারণটা পাওয়া যাবে সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যায়। যুদ্ধের পর যে ভৌগলিক ওলট পালট ঘটল যার ফলে অনেক রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে গেল এবং বিশেষ পরিসর ও সীমানায় আটকে রইল। রাশিয়াতে সাম্যবাদ গাজর বসাচ্ছে। জার্মানীতে ফ্যাসিজিম্, চীনের সামন্ততন্ত্র ভাঙবার উপান্তে, গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, ভারতবর্ষে বৈদেশিক শোষণ ও ধনিক-তন্ত্রের প্রভাব সংস্কৃতির মুখ চেপে রয়েছে। আসলে, যুদ্ধের পর সবচাইতে বেশী

ঘা খেয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। দ্বিধা, সংশয়, সবার উপর উন্নাসিক বৃত্তি। এর শেষ উপকরণ হল প্রতিক্রিয়া। প্রাক্‌লড়াইয়ের যুগে এই বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সাম্প্রদায় সমাজের যে অংশটিতে বাস করত সেটা হোল চিল কোঠা। ডিমোক্রেটিক রাষ্ট্রে এদেরকে খুব বাহবা দেওয়া হয়। কিন্তু চারপাশের চাপে রাষ্ট্রের গড়নটা তুবড়ে গেলে এদের অবস্থা হয় ত্রিশঙ্কুরের মত। শান্তির সময় এরা সব চাইতে সেরা ঐশ্বর্য ভোগ করেছে বিনা দায়িত্বে—যুধ্যমান ও যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রে এদের জিজ্ঞাসা হল মন্তব্যহীন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাস করা তথা, পপুলার গভর্ণমেণ্ট, খুবই সহজ যদি সময়টা হয় নিরবচ্ছিন্ন শান্তির। একের সঙ্গে অপরের যোগের মধ্যে যে দলগত স্বার্থ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাকে অধিকেন্দ্রিক করতে গেলে যে মাঝামাঝি পথ নিতে হয় তার নাম অর্থনীতি। বেঁচে থাকবার এইটাই স্থূল ও নিয়মতান্ত্রিক প্রণালী। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, শান্তির সময় এই আরাম ও আয়োজনের মধ্যে বাস করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে অত্যন্ত উৎসাহ দেখাবার ফলে দলগত স্বার্থে আর এক জোট হতে পারেনি ( কিংবা পারা সম্ভব ছিল না, যদি ইতিহাসের কালকে মেনে নেই )। 'বেঁচে আছি কিনা' জিজ্ঞাসাটা তখনই মনে আসে যখন 'কি করে বাঁচবো' প্রশ্নটা সামনে বদন ব্যাদিত করে দাঁড়ায়না। যুদ্ধোত্তর যুগে সামনা সামনি হতে হল এই প্রশ্নটার। এই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল সভ্যতা ও কৃষ্টির লাগাম। অথচ, পরিবর্তনমুখী সমাজবোধের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। নেতিবাদ হল আশু প্রতিক্রিয়া। সকলের ভিতর সজ্ঞান মন্তব্য ফুটছে আর কঠিন যান্ত্রিক সচেতনতায় সকলেই ধিকৃত হচ্ছে, মুখ ফেরাচ্ছে স্বভাবের মধ্যে। পলায়ন মনোবৃত্তি হল শিল্পের নৈসর্গিক উপলম্বন। আসলে, এরা বেড়ে উঠেছে ভিক্টোরিয়ন যুগের আলো-হাওয়ার মধ্যে; কাজেই যুদ্ধোত্তর আবহাওয়ায় তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক গতি বারবার পথ হারাচ্ছে, ঘুলিয়ে উঠছে। এইবার যুদ্ধের সময় এটা আরো স্পষ্ট হল ও প্রমাণিত হল। সম্প্রদায় হিসাবে এদের দাবীটাই হল গৌণ। মন্তব্যগুলো হল হাস্যকর, চরিত্রগুলো দেখাল চ্যাপ্‌টা। অথচ জীবনের দাবী অনস্বীকার্য। বেঁচে থাকবার বৃত্তিটাও আদিম ও প্রাকৃতিক। এই লড়াইটা হল মধ্যবিত্ত জীবনের ভারকেন্দ্র।

আমি পূর্বেই বলেছি শান্তিই সৃষ্টির আদিম বীজ, এবার তার কারণটা জানা যাবে। আমাদের চেতনার পেছনে যদি সক্রিয় নিশ্চয়তা (positive value) না থাকে কোন সৃষ্টিই সার্থকতা পেতে পারে না। প্রত্যেক সভ্যতাই অভিব্যক্তির সোপান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হার্বার্ট রীড যেমন দেখিয়েছেন, এই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি যা শিল্পের বহুধা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বিকশায়িত আসলে একটি দেশকালপাত্রভেদহীন, অন্তঃশীল একবর্তানুবোধ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার তার একটা প্রতীক। কিন্তু চেতনার মূলেই ক্ষয় ডিকেডেনসের এইটেই হল লক্ষণ। কারণ, ব্যাপক অর্থে একথা প্রমাণিত হয়েছে সমগ্র জীবনের চাপে আমরা প্রত্যেকে এগিয়ে চলি। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোথায় এই চেতনার জোর? সক্রিয় নিশ্চয়তা? যা ছিল শান্তির যুগে যখন তাদের সাহিত্য ছিল, শিল্প ছিল, ঐতিহ্যের মধ্যে জীবনের উচ্চারণ ছিল, স্বাক্ষর ছিল রাষ্ট্রিক চেতনায়।

মহৎ যুদ্ধের ধাক্কাটা যখন থিতিয়ে আসছে, আমাদের শরীরে ও মনের খানিকটা রদবদল করে নিজেদের ব্যবহার্য করে আনবো আনবো এমন সময় এল মহত্তর যুদ্ধ! ব্যাপারটা যাই হোক না কেন এই যুদ্ধের পর আমরা একটি ফলবান নিষ্পত্তি পাব সেটা হয় যান্ত্রিক প্রতিপত্তি নয় নিরাপত্তি। কিন্তু এর মধ্যে একটা মজার জিনিষ হল এই যে ইতিমধ্যেই একদল লোক ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় শিল্প, দর্শন তৈরি করতে সুরু করে দিয়েছে। সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসে এর সাফল্য অন্ততঃ যে'টুকু আমরা পেয়েছি অনিশ্চিত হলেও প্রতিশ্রুতিবান। কারণ এর মূল ভিত্তি রয়েছে জীবনের চলচ্ছীলতার মধ্যে, যে কোন সৃষ্টি কেবল তারই পরিবেশিতায় পূর্ণতা পায় বা পেতে পারে।

আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে আদ্রে জিঁদ্ যা বলেছিলেন সেইটাই চরম কথা। সাহিত্যিককে যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নাক গলাতেই হবে তা' নয় কিন্তু পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। সংবেদনশীলতাই ধরা যাক যা' ভিক্টোরীয়ন সমালোচকরাও সাহিত্যিক বিভেদবিন্দুরূপে ধরে নিয়েছে পারিপার্শ্বকে বাদ দিয়ে দাঁড়ায় কোথা? আর

সাহিত্য ব্যক্তি সাপেক্ষ হলেও ব্যষ্টির মধ্যেই যে মূল একথা'ত প্রমাণিত হয়েছে—ব্রাডলে থেকে গিলবার্ট পর্যন্ত এক কিংবা অন্য উপায়ে স্বীকার করেছে। তবে ব্যষ্টি সাধারণতঃ গণতন্ত্র শীর্ষক সামাজিক অধ্যায়ে ও তথাকথিত গির্জা ও মন্দিরের আওতায় প্রায় জায়গায় মাইনরিটির পরিভাষায়, মুষ্টিমেয় আভিজাত্যের ষড়যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এইগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যখন অর্থনৈতিক বিভেদটা দগ দগ করে যখন ফুটে বেরুতে থাকে।

এই যে জীবনের ধারাটি আজকের রাষ্ট্রে প্রকট এই দিক দিয়েই আমার বক্তব্য। প্রতিদিনকার জীবনের বাইরে এই যে বৃহৎ জীবনবোধ যার অখণ্ড চাপে আমরা সম্প্রদায় হিসাবে বেগবান, চিহ্নিত, সেইদিক থেকে চাপ দেখানই আমার উদ্দেশ্য। কাজেই একটু এক ঘেয়ে না লেগে পারে না। জিনিষটা মোটেই রসালো নয়। চিন্তাগুলি সৃষ্টি করেছে চরিত্র। চিন্তার মধ্যে যে রস তা হ'ল বুদ্ধির। শোবার আগে পান খেয়ে যে বই পড়লে আরাম পাওয়া যায় এ বই সে জাতের না হয় তার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করেছি।

৩। প্যাশনেট বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন ঠিক বুঝিনি, তবে আমার মনে হয় এখানেও তাঁর লক্ষ্যটা ঝাপসা। যে লেখার পিছনে প্যাশন নাই তা' হ'ল মেয়েলি আত্মপরিচয় : শারদীয়া সংখ্যার গল্প। আসলে আমার চরিত্রগুলির কামনাই হল প্যাশনেট। এখানে আমি লরেন্সপন্থী। তিনি,—আমার মনে হয়, এই দিক থেকেই বলতে চেয়েছেন। যেখানে যৌনটা ব্যবহারিক,—প্যাশন সেখানে জমেনা—সেটা সামাজিক, গতানুগতিক, থস্‌থসে। দৃষ্টিভঙ্গীটা সেখানে স্বভাবতই ঘোলাটে। আমি ষ্টেইনবেকের লেখা উল্লেখ করব। চরিত্রগুলো আবেগে এসে শুব্ধ হয়ে যাচ্ছে—প্রকাশ পাচ্ছে না। এই আবেগের কোন ব্যবহার নাই। দুঃসীম, দুঃসহ ও আদিম অন্ধকারের মধ্যেই তার পরিক্রমণ। কামনাটা এখানে নিরালম্ব, কোন পৌর্বাপর্য নাই। এইটাই আমি দেখাতে চাই। অনুপমের চরিত্র বেশী আবেগশীল—তার ক্ষেত্রেই একথা প্রমাণিত হয়েছে বেশী। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি যদি ঠিকভাবে অনুপমকে প্রকাশ করতে পেরে থাকি বাঙলা সাহিত্যে আমিই এই দিক দিয়ে প্রথম কৃতি লেখক।

৪। বানান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অকাট্য। কিন্তু বানান সম্বন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বী। বানান জিনিষটা বানানো।

* * *

পৃথিবীর আলো দেখতে হয়ত আমার বইখানির আরো সময় লাগত যদি বন্ধুবর শ্রীনির্মল চন্দ্র রায়ের অকৃপণ প্রীতি এর পিছনে না থাকত। তার কাছে ধন্যবাদ প্রকাশ নিরর্থক নয় হাস্যকর। আরো, বর্তমান প্রেসের যে দুরবস্থা তার মধ্যে ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজের অন্যতম স্বত্বাধিকারী, মাননীয় শ্রীদ্বারিকা নাথ ধর, এফ, আর, জি, এস, এম, আর, পি, এস, (লণ্ডন) মহাশয়ের সহৃদয়তা, সাহায্য ও স্নেহ আমার পক্ষে আশাতীত। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

বইখানির প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও এঁকে দিয়ে বইটিকে শোভিত করেছেন শিল্পী শ্রীরজনীকান্ত সিংহ। তাঁকেও আমার অনেক ধন্যবাদ। বইখানির ব্লক করতে শ্রীশিবদাস মজুমদার যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা' আমি আন্তরিক ধন্যবাদের সঙ্গে স্মরণ করছি।

বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। }

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

# প্রথম পরিচ্ছেদ

"আমার আমি ছাড়া তোমার কোনো অর্থ নাই। এমন কি এত বড় পৃথিবীর একমাত্র প্রতিনিধি আমি আমার এই অস্তিত্ববান অনুভূতি। তুমি একথা মানো না, 'সকলের জন্য সকলে' কিন্তু তা' কেমন করে সম্ভব? আর তাই যদি হয়, তার অর্থ কি? আমার মধ্যে আছে একটি অপরূপ মোহ; তেমনি তোমার মধ্যে আছে এক বিস্ময়কর সংস্থাপন। তেমনি—"

বিকাশ অন্য একটা পরিচ্ছেদ সুরু করল।

"সকলের জন্য সকলে নয়। কিন্তু সকলের জন্য প্রত্যেকে থাকুক এ আমি চাই। আমি মানে তুমি, এ আমার মনস্কামনা নয়। অধিকার ভেদ আমি ভালবাসি না, কিন্তু আত্ম অনুদার চিন্তা আমার কাছে অসহ্য। আচ্ছা, তোমার কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করি সম্ভাবনা কি? পৃথিবীর সৃজন-লীলায় যদি উপলব্ধিক সত্য অনুপস্থিত থাকে তা'হলে গতির গতি কি হবে? পৃথিবী প্রসব করবে কি?"

বিকাশ আর একটা পরিচ্ছেদ ধরল। একটুও না থেমে; দ্রুত, বেগচ্ছল অক্ষর-গুলি নেমে আসছে এক অনুমিত প্রণালীতে। লেখবার সময় সে সাধারণতঃ থামে না। আর থামলেই সে লিখতে পারে না। যতক্ষণ সে লিখতে পারে ততক্ষণ সে ক্ষিপ্র, রকেটের মত উদ্দীপ্ত। যেই কোনো শব্দে এসে হোঁচট খেলে—অমনি সে বোবা: অকর্ম্মণ্য পঙ্গুতায় নিঃসাড়। শিশুর চোখের মত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের লেখার দিকে আর ভাবে—আর হাজার জিহ্বায় মন কথা কয়ে উঠে। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বেগবাহী শব্দ। শব্দের ঝাপটে ঋজু ও সংবেদনশীল হয়ে উঠে তার শরীর ও স্নায়ু। বিকাশ একটুও থামলে না কথার জন্য, চিন্তার জন্য। ভাবনা এলে সে শুধু ভাববে। ঠিক শব্দ, নির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত এক দুর্নিরীক্ষ্য উপায়ে কলমের মুখে নেমে আসতে লাগল।

"বড়মা, তোমার পরিষ্কার চেহারাটি মনের টেলিভিশন দিয়ে দেখছি। তোমার প্রচুর আর দীর্ঘ চুলে আঁট করে বাঁধা মাথা; তলায় দুটি উজ্জ্বল ও অনায়ত চোখ; আর তারই তলায় সূচালো হয়ে আসা আমের মতন তোমার মুখাবয়ব। থুতনির দিক্‌টা একটু চাপা: কমলালেবুর মত। পৃথিবীর প্রতিনিধি কমলালেবু। সংহতি আর তিতিক্ষা। সংযত ঠোঁট দুটিতে তলোয়ারের মত ধার: ইপ্সায় দৃঢ় ও কঠিন। অনর্থক কথায় চঞ্চল নয়, অনুভূতির রেখায় আদিষ্ট। অবাহুল্য মেদে একটি ঋজু ও স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য। সব মিলিয়ে তুমি একটা রেখা; একটি অখণ্ড ছবির নৈবর্তিক পটভূমিকা। যে বয়সটা মেয়েদের কাটে ইস্কুল কলেজের বাসে, প্রতিবেশী ভায়েদের সঙ্গে রহস্যালাপ করে ও প্রবীণাদের নিলর্জ্জনার প্রতি নিলর্জ্জনা প্রকাশ করে—এগজামিনে পাশ করে আর কিছু চিন্তা না করে সে সময় তোমার বাহিত হয়েছে লাইব্রেরীর বইঠাসা ঘরে, খোলা ছাদে নির্জন পায়চারীর সঙ্গে মনের নিঃসঙ্গ প্রসব করিয়ে।"

বিকাশ অবলীলাক্রমে পাতা উল্‌টালো। চুলের নীচে কপালের কোলে সারি সারি ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠেছে। হাত দিয়ে মুছে নিলে—শেষের কথাটি একবার দেখে নিলে পাতাটি উল্টে:

'নিঃসঙ্গ প্রসব করিয়ে।'

—আচ্ছা, বড়মা, বিকাশ একটা আবেগের সাহায্য নিলে। [ কোনো কিছু বলা হয়ে গেলেও যদি তার জের টানতে হয়, প্রয়োজন পড়ে এমনি কতগুলি কথার। অর্থহীন, অবান্তর কিন্তু ব্যঞ্জনাময়। নাটকীয় সংঘাতের বিভেদ বিন্দু এইগুলি। 'আচ্ছা', 'বল'তো', 'সেদিন' এইসব শব্দগুলি থেকে জন্ম নেয় অন্য একটি আবেগ, আরো নানা শব্দে ছড়িয়ে পড়ে সেই ইচ্ছার বিদ্যুত: ধ্বনির স্পৃহায়, গতির ব্যগ্রতায়; আবার অন্য একটি 'সেদিন' উদ্রেক করে অন্য একটি স্মরণের উদ্বেগ। ]

"আচ্ছা, বড়মা, এই তুমি যদি 'তুমি' না হতে, তা হলেই কি সার্থকতা আসত? যাকে শুভ বলি, মঙ্গল বলি। কিন্তু ভেবে দেখো তুমি তাদের জন্য। এই কারণে, তোমার কাজের তারা object, চরিত্রের কেন্দ্র; অপরদিকে তারাও তোমার হেতু। তোমার 'তুমি' কে তৈরি করবার জন্য একটি অনুভূতিহীন যন্ত্র: নিয়মতান্ত্রিক ও সাধারণ।

বড়মা, তোমার কথা পড়লাম। তোমার পথে আর আমার পথে যে দূরত্ব তা একই বড় রাস্তার এমাথা ওমাথা। ঠিক যেন একটি সরল রেখার দুটো extremity, হাতে হাত দিতে পারব না।”

বিকাশ থামল। নিজের মধ্যে থামবার একটা যান্ত্রিক সঙ্কেত পেলে। লেখবার মত কোনো বাষ্পীয় ব্যাকুলতা তার মধ্যে নিঃশেষ—সে অনুভব করল। কলমটা রাখলে টেবিলের উপর। নিজেকে অত্যন্ত শিথিল ও শূন্য বোধ করতে থাকে। পিঠটা চেয়ারের গায়ে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে আঙুলে আঙুলে ফাঁস গেঁথে শরীরটাকে টান করে ধরল, মুখের বিস্তারিত গর্ভ হতে একটা ভারী বায়ু নির্গত হয়, তারপর পাতা উল্টিয়ে নিরুদ্বেগে পড়তে লাগল।

[ আমরা যখন লিখি তখন পড়িনা। তখন আমরা বিদ্যুতের মত তরঙ্গময় ও তীক্ষ্ণ। লেখবার সময় যে বিশেষ উত্তেজনা আমাদের মধ্যে থাকে তার ফলে প্রত্যেকটি অক্ষরের সঙ্গে থাকে একটি প্রখর ও কণ্ঠকিত যোগাযোগ। অভীপ্সার আগুনের মত কথাগুলি . এক একটা ফুলকি। আর যে মুহূর্তে সেই আবেগটি নিষ্কলুষ হয়ে গেল গাণ্ডীবহীন ধনঞ্জয়ের মত নিরুত্তেজ হল স্নায়ু সেই অদ্ভুত, বিদ্যুতময় শব্দগুলি তখন জ্ঞাপনাত্মক কোনো অর্থ ছাড়া কিছু নয় ]

বিকাশ হঠাৎ শিথিল চোখ বুলিয়ে আসতে আসতে এমনি বোধ করল। কথার অজস্র বাষ্পে তার মন ঋজু হয়ে উঠল। আমরা যখন কথা বলি তখন কথাকেই কেবল বলিনা ; আরো সহজ, কথা—ইঙ্গিত : অতীন্দ্রিয় কোনো সঙ্কেত। আমি যেই কিছু উচ্চারণ করলাম তোমার কাছে তা একটা জ্ঞাপনা, একটা অনিবার্য নির্দেশ। আবার—বিকাশ ভাবলে, মাথাটা গেল বাঁ দিকে হেলে, বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের ডগাটি ইঁদুরের মত দাঁত দিয়ে খুঁটতে থাকে,—সমস্ত কথার মধ্যে কোনো কথা : একটি কথা। কথার বাহ্যিক শরীর আসলে দাম্পত্য প্রেমের মত নির্জিব ও ক্লান্তিকর। কথার প্রসারণ, তার বিস্তৃতি তার ইমোশনে . প্রসবনীয় টেকনিকে ; যেমন ধর—ভালবাসা। শব্দটা মনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে শরীরে সচকিত হয়ে উঠে — ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসে। চুলগুলোর উপর অজ্ঞাতে একবার হাতটা বুলিয়ে নেয়—আমি ভালবাসি প্রত্যহ

সকালবেলা আমার ঘুমভরা চোখের পাতার উপর চায়ের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করতে কিম্বা, আমি ভালবাসি না রাত্রিবেলা খানিকটা শারীরিক আদর' সোহাগ দেখিয়ে আমার স্ত্রী সকালবেলা খাওয়ার সময় পাখার হাওয়া দিতে দিতে কোনো পড়শীর পরা শাড়ী কি অলঙ্কারের জন্য মাৎসর্যময় আবদার করুক। বিকাশের শরীর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে কর্মক্ষম। আঙুলে আঙুলে ফাঁস্ তৈরি করে আটকে দেয় হাঁটুতে। জোড়া হাঁটু টেনে আনে বুকের দিকে—আমি ভালবাসি রোজ রাত্রিবেলা আধখানা পড়া ডিটেকটিভ বইয়ের বাকী নিশ্চয়টুকু স্বপ্ন দেখতে। কিম্বা আমি, ভালবাসি-না আমার সামান্য ত্রুটিতে আমার ওপরওলা সঙ্গমেচ্ছু প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরের মত দাঁত দেখাক ও ওস্তাদী গায়িয়ের মত মুখভঙ্গী করুক। এ হ'ল ভালবাসার সাধারণ সংজ্ঞা। দশটি সন্তানের জননীর আর একটি সন্তান প্রসবের মত নির্বেগ ও নির্বিকার। কিন্তু—হাঁটু থেকে বিকাশের হাত দুটি খুলে যায়। চুলগুলি পড়ে মুখের উপর হেলে—কিন্তু মনে করো, কোনো একটি সন্ধ্যা নীলাভ ও নিস্তরঙ্গ। নিরুপদ্রব একটি ঘর। কথা না কয়ে কাটাবার মত প্রচুর ও নির্বাধ সময়। বাইরের গোলমাল কানে লাগে না; আর এমন একটি মেয়ে তোমার পাশে যে বয়স, সদ্য গোঁফ উঠা ছেলের মুখে সুইনব্যার্ন শুনে মনে মনে চমকাতে লজ্জা পায়, সুন্দর লাগে; কিছুই তোমরা করছ না অথচ, অনেক জিনিষ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ কিছু বলছ না অথচ, অনেক অবোধ্য জিনিষ বুঝছ। আর যদি দেখো একটি পুরো চাউনিকে তোমার ও মাটীর দিকে ভাগাভাগি করে দিচ্ছে: ঘূর্ণমান কালের একটুকরো ভগ্নাংশ: পাকা ফলের মত সেই মুহূর্তটি তোমার সামনে ঝুলমান: প্রলোভনের আদিম উষ্ণতা—সেই সময় বল: শুনতে না পাওয়া গলায় বল: ভা-ল-বা-সি। জিভের কয়েকটি সাধারণ উঠা-পড়া অথচ, পৃথিবীর সর্বভৌম বিস্ময়, অঘটনীয় মিরাক্যল—আচ্ছা হমোশন—মনে মনে থামল একটু বিকাশ।

—ইমোশনই'ত ইমোশনের শেষ নয়। না তা'কেমন করে। সে রকম দেখতে গেলে কোনো কিছুই কোনো কিছুর শেষ নয়।

বিকাশ নড়ে চড়ে বসল। সরল হল তার বসবার ভঙ্গী। শরীরে শিথিলতার

রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে—আর গভীর বলে যা বলি দেখতে গেলে সেও একটা emotion. কোনো সাধারণ কথার পিছনে বিশেষ একটা উত্তাপ যা আমরা প্রয়োগ করি।

নিস্তব্ধ দুপুর। অবসাদগ্রস্ত মনের মত। দু' একটা গাড়ী সময়ের মন্থরতায় আঘাত দিয়ে চলে যায়। লোক চলাচল অল্প। বিকাশ বসে বসে লিখছিল। দক্ষিণ দিকের জানলাটি খোলা। বাইরে একটুখানি আকাশ সামনের বাড়ীগুলির অনতি-প্রশস্ত জটিলতার মধ্যে ত্রিভুজাকৃতি রূপ পেয়েছে। উগ্র নীল রং সূর্যের তাপে জ্বলছে। জানলার সামনেই এক অসামান্য লম্বা শরীরের বাড়ী পথের ও'পাশটিকে আড়াল করে রেখেছে। ফ্লাট। দুটি তলায় যে কতপ্রকার জীবের সংস্থাপন বিকেলের ধূসর আলোয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। কয়েক গজ বর্গ-জায়গায়, চিহ্নিত দেওয়ালে এক একটি পরিবারের আয়তনিক নির্দেশ। কোনো বারাণ্ডায় দাঁড়ায় দুটি বোন—একটি শিশু নিয়ে মা অপর কোণে; বাস থেকে নামল দূর সম্পর্কের কোনো ভাই—ছোট বোন হেসে কি বললে বড় বোনকে। কোনো বারাণ্ডায় একটি সংক্ষিপ্ত দম্পতী টেবিলে বসে খাচ্ছে চা। বিকেলটা অনাবশ্যক আলাপে জমে উঠেছে। কোনো বারাণ্ডায় কুকুর নিয়ে একটি প্রৌঢ়া; ওপর থেকে থুথু ছেড়ে গতি পরীক্ষা করছে একটি ছেলে; নীচে হিন্দুস্থানী গৃহিণীটীর মস্তক স্পর্শ করাতে চেঁচামেচি উঠল একটু। একই সময় রবীন্দ্রনাথের গান উৎকীর্ণ হয়ে উঠছে কোনো স্কুলের মেয়ের নির্বোধ গলা হতে—জ্ঞাতি ভ্রাতা আড়চোখে উপভোগ করছে যৌবন পুষ্ট দেহের রেখাভাস। অদ্ভুত এই ফ্লাট। বিকাশের বেশ লাগে। একটা জাহাজের মত। আধুনিক সভ্যতার একটা অর্থ তার কাছে সহজ হয়ে যায়। পৃথিবীর উৎপাদন পরিমিত। প্রয়োজনের পায়ে পায়ে তাকে আমরা মেরে এনেছি; এইবার ফ্লাট। System. কয়েকগজ বর্গ জায়গা। আর তার মাঝে তোমার প্রয়োজনের গুটিয়ে আনা একটা স্থূল সংস্করণ। সব আছে। খাবার ঘর; স্নানাগার; এমন কি টাকার অঙ্কটা স্ফীত করতে পারলে শোবার ঘর থেকে চাঁদও দেখা যাবে—আকাশের ত্রি-কোন বিস্তারে আধফালি চাঁদ: শীর্ণ শশী। সংলগ্নিত বারাণ্ডা। ফুলের গাছ বসাও: ঘুমের অন্ধকারকে সুরভিত করে

তুলবে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসো ; সংক্ষেপ করো। যা প্রয়োজন তাই তোমার প্রাপ্য। অপচয়-ই ইতিহাসের দূষিত বীজ। অতএব system ; অভ্যস্থ হও সীমাধর্মের। বিকাশের কাছে এই ফ্লাট একটা প্রতিরূপ। সে ডিমোক্রেসীতে আস্থাবান। তার কাছে নিজেকে অনুভব কবাই ঐতিহ্যবান উপলক্ষ্য কিন্তু সকলকে বিয়োগ তাব আত্মাব উৎকর্ষতা নয়। ওয়র্ডস্বর্থেব নির্জনতাব সঙ্গে তার সমবেদনা নাই। সে নিজে কবিতা লেখে। সেই কবিতায় দুটি নিস্তরঙ্গ আলাপন অনেক ভীডেব মধ্যে নিঃশব্দে ফেনায়িত হয়ে ওঠবাব দেহবান ব্যাকুলতা দেখা যায়।

মাথাটাকে চেয়াবেব পিছন দিকে ছড়িয়ে দিল। উত্তব দিকেব ত্রিতল বারাণ্ডাব কোণেব ফ্লাটে প্রত্যহকাব বৃদ্ধটি একটি বই পডছে, গ্রন্থাবলী বোধ হয়। হিন্দুস্থানী প্রৌঢ়াটি কুকুরটিকে অনর্থক সামর্থেব সঙ্গে বুকে জড়িয়ে আদর কবছে। দুপুরের স্তিমিত উত্তাপটি ধীবে ধীবে তাব চিন্তাশীলতাব উপব ছড়িয়ে পড়ে। ছুটিব দিন। লিখতেও আর ভাল লাগছিল না। বাবাণ্ডায উঠে এসে দাঁড়ায়। যে সব ছুটি আচম্কা ক্যালেণ্ডাবেব পাতাব বাইরে থেকে ছিটকে আসে সেগুলি সাধারণতঃ আমাদের উদ্ব্যস্ত করে তোলে। কাবণ, ছুটিকে আমবা ব্যবহাব কবি নিয়মেব মাপে, জানি কবে আসবে ছুটি, আব জানি সেদিন কি আমাদেব কাজ। বন্ধু আর সিনেমা আব ঘুম। না জানা ছুটি সেই কাবণে না জানা উপন্যাসেব মত। বিকাশের হল তাই। বন্ধুরা যে যাব কাজে, আড্ডা বসবে সন্ধ্যার পর, অথচ সমস্ত দিনটা ভবে এক নিদারুণ অবসর। একটি দিনের মধ্যে যে এত সময় আর সে সময় যে এত দীর্ঘ ও ভাবী বিকাশ হঠাৎ অনুভব কবল। সূর্য বাড়ীর পিছনটায় পডায় বাস্তায় পডেছে ছায়া। বিকসোটাকে একপাশে বেখে রিকসোওলা বিড়ি টানছে। একটা কুকুরীব উপব হঠাৎ একসঙ্গে তিনটে কুকুর বেগবান আক্রমণ করল, চীৎকাব করে উঠল কুকুরীটা, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এক উত্তেজক দংষ্ট্রা বিকশিত কুকুরের—হিংস্র যুদ্ধ সুরু হয়।—উঃ, কি instinct দেখেছো ! কোনো একটা চিন্তা করবার উপলক্ষ্য পেয়ে সুস্থির বোধ করল। —Libido ; হঠাৎ মনে হল দরজা গোড়ায় কে নড়াচড়া করছে, খানিকটা ভয়

পেয়েই সে তাকাল—একটি মেয়ে। মেয়েটি। সেদিনের নূতন আসা দ্বিতলের তেরো নম্বর ফ্লাটের মেয়েটি। অল্প বয়স। মধ্যবিত্ত ঘরের সঙ্কোচ ও শীর্ণতা চোখে-মুখে। বিকাশ কৌতূহলী বিস্ময় বোধ করল। চোখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল কাকে চায় সে। তার গলায় সচেতন সৌজন্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল তার মাকে খুঁজছে কিনা। চোখের দিকে একবার স্পষ্ট চাইলে। মেয়েটি কথা বললে। যুগপৎ দ্বিধা আর জড়তা বিদীর্ণ হয়ে উঠে কণ্ঠস্বরে। মেয়েটির মা হঠাৎ মূর্ছিত হয়েছে, বাড়ীতে কেউ নাই। সে সাহায্য চায়। তার ভয় করছে। বিকাশ দ্রুত শারীরিক ভঙ্গী করে গেল তার সঙ্গে তার মাকে দেখতে যদিও সে জানত না যে, সে কি করতে পারে ও করবে। একটি বিধবা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, মুখটা বাঁ দিকে হেলান। কপালে অনেকগুলি রেখা; বয়েসের, ভাবনার: একটি সবল রুক্ষ শরীর।

কয়েকদিন আগে এরা ভাড়া এসেছে। বিকাশ দেখেও ছিল বারাণ্ডায় দু-একখানা কাপড় তুলতে ও শরীরের দু-একটা আচমকা প্রবেশ ও প্রস্থান। একটু সাধারণ লক্ষ্য করবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু তার বেশী নয়। সে নিজে এই বিরাট বাড়ীর বহু অধিবাসীকেই চেনে না। একদিন বাসে, একদিন সিনেমার হলে দুটি আলাপী ভদ্রলোককে বাড়ী থেকে নির্গমনের সময় দেখতে পেয়ে জানতে পারে তারাও নাকি এই বাড়ীরই কোনো কোনো কোণের বাসিন্দা।

বিকাশ মেয়েটিকে ঠাণ্ডা জল আনতে বললে। মেয়েটি দ্রুত জল নিয়ে আসে এবং অল্প অল্প ছিটে দেয় মুখে ও কপালে ও অনাবৃত কণ্ঠতালুর কাছে। বিকাশ হাত পাখা নিয়ে অল্প অল্প হাওয়া চালায়।

—মাঝে মাঝে এমন হয়?

—না।

—এই প্রথম?

—হ্যাঁ। মেয়েটির কণ্ঠস্বর দুর্বল; শঙ্কায় অস্বচ্ছ। চোখের চাউনি জলের রেখায় ভারী।

—ভয় নাই—এখুনি সেরে যাবে—মানসিক চিন্তার দরুণ বোধ হয়।

প্রত্যেক কথার শেষে এক একটু ফাঁক্ রাখে। উত্তর আবির্ভাবের পরিপুরক শূন্য। মেয়েটি কথা কয় না। বিকাশ মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে থাকে। শীর্ণ। ছোট্ট কপালের তলায় ছুটি শীতল চোখ। মুখটা নবম। বিকাশ ক্রমশঃ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। চোয়াল নাই। সুব বিয়ালিষ্টদের ছবির টানেব মত থুতনির দিকটা অস্পষ্ট, যেন ভয় পেয়ে হারিয়ে গেছে। সরু শরীর। খানিক পবে সে জিজ্ঞাসা করে তাদের এখানে কে আছে।

—দাদা আছেন।

মেয়েটি একবাবও চোখ তোলেনি। বিকাশ স্পষ্ট কৌতুক অনুভব কবছিল। মেয়েটির অসহায় ও অবিনীত বসে থাকা একটা চাপা বিদ্রোহেব মত। প্রাতিভাসিক। বিকাশ আরো নিপুণ হয়ে পরীক্ষা কবে যেন সে আগন্তুক, বিয়ে কববার আগে পরীক্ষা করছে। কিন্তু ক্রমশঃ তাব লজ্জা পেতে লাগল। মেয়েটির উত্তরগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে নিজের কথাগুলিই অত্যন্ত রূঢ় ভাবে শোনা যায়। হঠাৎ সে নিজেকে প্রশ্নহীন মনে করল। নিস্তব্ধ। মাঝখানে পাখার হাওয়াব শব্দিত তরঙ্গ। এক সময় তার মনে কইবাব মত একটি কথা এল। কিন্তু নিস্তব্ধতার আয়তন এত দীর্ঘ বোধ হয় তার দ্বিধা আসে, লজ্জা হয়, তাব নিরপেক্ষতা ভেঙে যায়।

মেয়েটির একটা হাত তার মায়ের শরীরে। অন্য হাতে ক্ষিপ্র বাতাস কবে চলেছে। মুখে কোনো রেখা এমন কি, শবীরে কোনো স্পন্দনও যেন অবর্ত্তমান। কেন যে থাক্‌বে তা' না জান্‌লেও বিকাশ মনে মনে অসুখী হল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সময় চলে যায়। খানিকক্ষণ কি, অনেকক্ষণ বাদে প্রৌঢ়াটি চৈতন্যের শব্দ করে পাশ ফিরল। মেয়েটি মুখ নামিয়ে শুধায়—মা।

—য়্যু।

—মা। মুখটা আরও নামিয়ে সন্তর্পণে উচ্চারণ করে। গলা উদ্বেগে দোলে। প্রৌঢ়াটি এক গ্লাস জল চাইলো। জল এনে দিলে মেয়েটি। এক নিঃশ্বাসে জল পান করে উঠে বসল। চোখে-মুখে তখনও অসুস্থতার চিহ্ন। বিকাশকে দেখে পরিধানে শালীন হয়ে নেয়। আর এই সমস্ত সময়গুলি বিকাশ নিজেকে অত্যন্ত

বিচ্ছিন্ন ও পৃথক বোধ করে। নাটকীয় ভাবে বিপন্ন বোধ করবে। যেন সে কোনো অসাধারণ দৃশ্যের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখলে মেয়েটি কাঁদছে। নিঃশব্দে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কাঁদছে আর নিভৃত আরামে তার সরু শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। প্রৌঢ়াটি তার মাথায় হাত বুলায়। চোখ দুটি তার স্নেহে ও করুণায় অপার্থিব ও ভারী নিশনারী মানবতার মত। বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললে যে, হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে গেছল। এরকম তার কখনো হয় না। হঠাৎ ভয়ানক গরম বোধ হল আর সমস্ত শরীর অসাড় আর মাথাটা যেন গুলিয়ে উঠল। গরম যে খুব বেশী-ই পড়েছে — বিকাশ মন্তব্য করল, — কাগজে দেখেছে ১০৮° ডিগ্রি গরম। না, শুধু আবহাওয়ার উষ্ণতা নয়। তিনি অকুল ভাবনার মধ্যে পড়েছেন। একটি মাত্র মেয়ে ও ছেলে নিয়ে তিনি বিধবা ও মহিলা। ছেলেটির বয়স বছর বাইশ। মাট্রিক পাশ করবার আগেই তাকে চাকুরীতে যেতে হয়েছে সেখানে গুলি বারুদ তৈরী হয়। কিছুদিনের ভেতর-ই হয়ত তাকে বিদেশে চালান যেতে হবে। লড়াইয়ের জন্য। নানা ভাবনা, বিশেষতঃ অর্থ-নীতিক চিন্তাই নাকি তার মূর্চ্ছার একটি অন্যতম কারণ। বিকাশ ভাবছিলো ডাক্তার দেখাবার কথা বলবে, হঠাৎ ভয় পেয়ে চুপ করে রইলো। এক সময় প্রৌঢ়াটি মুখোমুখী প্রশ্ন করলেন।

—তোমারাই ত তিরিশ নম্বরে থাক ?

—হ্যাঁ। চোখ ও কণ্ঠস্বর অবিকৃত রাখবার মানসিক চেষ্টা করল বিকাশ।

—কি কর তুমি ?

—চাকুরী।

—কতদূর পড়েছো ?

—বি-এ। তার মেরুদণ্ড শির শির করে। এবার হয়ত জিজ্ঞাসা করবে তোমরা ক' ভাই-বোন। মেয়েটি তার স্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে বসেছে— বিকাশ অনুভব করতে পারে। স্থির, নিস্পলক, রুষ্ট বসে থাকা তাকে সতর্ক করে তোলে।

—তোমার বাবা কি করেন ?

—কাগজের সাব এডিটর।

—তোমরা ব্রাহ্মণ ?

—কায়স্থ। বিকাশের শরীরে যন্ত্রণা সুরু হয়। মেয়েটির দিকে আচম্‌কা একবার তাকায়। ঠিক জানলার দিকে পিঠ করে শরীরে একটি ঋজু, অনস্থিরতা নিয়ে বসে আছে। আর তার চোখের শীতল ঘৃণা বিকাশকে বেঁধে। কপালে তার ঘামের ফোঁটা দেখা দেয়। কোনো অকাট্য বিহ্বলতায় সে অস্থির হয়ে উঠে। অতর্কিত এক সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, দ্রুত বাইরে চলে যায়। প্রশ্নের মাঝে ফাঁক পেয়ে বিকাশও এক সময় উঠে দাঁড়ায়। নমস্কার করে বাইরে চলে আসে। পিছন ফিরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায়, যেন সে তার জন্য অপেক্ষা করছে। একটা টুনটুনি পাখীর খাঁচা শিকে ঝুলছে। দুটো হালকা ছাই রঙের পাখী, লাল ঠোঁট, ছোট খাঁচায় লাফালাফি করছে। খানিকক্ষণ থম্‌কে দাঁড়ায় বিকাশ। কিছু বলবার ইচ্ছা গেল তার. কিছু শোভন, সামাজিক। —কোনো আবশ্যক হলে—আবৃত্তির মতন বলল,—প্রতিবেশী হিসাবে দ্বিধা করবেন না। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। চোখে-মুখে অপমানিত হবার কঠিন দাগ। স্পষ্ট নির্লজ্জতায় চোখের উপর চোখ রেখে ঘরে চলে যায় এবং দরজাটাকে আওয়াজ করে ভেজিয়ে দেয়। বিকাশ কিছু বুঝল না। খানিকক্ষণ নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, মার খাওয়া কুকুরের মত উঠে এল এক সময়।

দুপুরটি গড়িয়ে গিয়েছে বিকেলের প্রাথমিক ব্যস্ততায়। মন্থরতার ভার ভেঙে এসেছে। ক্ষিপ্র চলাচল ও জন-যানের পাশে বিশৃঙ্খলতার আভাস পাওয়া যায়। বিকাশ উঠে এল। মায়ের দিবা নিদ্রায় তখনো অশান্তি স্পর্শ করে নি। ফ্যান ঘুরছে। খানিকটা শূন্য ঘিরে একটি চক্রাকার আবর্তনের পৌনপুনিক আঘাত। এত জোরে ফ্যানটা ঘুরছে যে মৌমাছির ক্ষিপ্ত ঝাঁকের মত একটা শব্দ উঠে। বেশী জোরে পাখা না ঘুরলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। মেদের বাহুল্যে হাওয়ার প্রয়োজন একটু অধিক পড়ে। নিদ্রার গভীর ছাপটি মুখে-চোখে নিবিষ্ট। বিকাশের হঠাৎ মনে হল তার মা যে কোনো একটি বিশেষ জীবের মত। প্রাণহীন কোনো শারীরিক অস্তিত্ব। আহার নিদ্রা ও প্রাত্যহিক ধারার মধ্যে

যে কোনো জীবের মত ক্লেদাক্ত। মায়েব সঙ্গে কোনো সময়, অনুভূতির কোনো নিঃসঙ্গতায়, কল্পনার বিচরণে কোনো সংবেদনশীল যোগাযোগ সে পায় না। তাব ছাব্বিশ বছরেব যৌবনের মধ্যে তাব মা পরিপূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু অদ্ভুত যোগ আছে তাব মায়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের প্রণালীতে। সেখানে সে মায়ের ইচ্ছাব মধ্যে খুঁজে পায় এক দুর্বিনীত পৌরুষ। দাম্ভিক, বলশালী সর্বময়তা। ঘটনাব মধ্য দিয়ে তাব মা মানুষ। তাব নারী বৃত্তির জৈবিকতার মধ্যে এই ইচ্ছাব পুরুষ বিদ্যুৎ কোনো ঘটনাকে মানিয়ে নিতে দেয়নি অথচ, মেনে নিতে হয়েছে। সেই প্রতাবণা তাব সন্তান পালনেব মধ্যে লোলুপ ও উদগ্র। বিকাশেব মনে কবতে বিভৎস লাগে তাব ছেলেবেলা। তাব মায়েব কঠিন, পরুষ হাত তাব জীবনের এক একটি ঘটনাকে স্তূপীকৃত কবছে আব তাব মনেব অবচেতনে ক্রুশীল ও জৈবিক আবেগ বচনা যাব প্রতিক্রিয়া। কোনো মুহূর্তে সে স্থায়ী নয়—নিশ্চিন্ত হতে পাবেনা মায়ের পরিবেশিতায়। বিকাশ প্রায়ই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবে, তার নিজেব মধ্যে; তার মনে, তাব শবীরে, ব্যবহারিক জীবনের স্থূলতম প্রাত্যহিকতা থেকে কল্পনাব ঊর্দ্ধয়নশীল আকাশ পর্যন্ত তাব বিডম্বিত আত্মচেতনা। দেহ ও মনেব এই দুর্নিবোধ্য যুদ্ধ সে পৃথিবীব ভাব কেন্দ্রের মত। আপেক্ষিক সংযোগে স্বীকৃত। সেই অদৃশ্য নিজেকে ঘিরে ঘিরে বুনে বুনে সে চলে। অগোচব, অলক্ষ্য মায়ায় বঙ ফেলে ফেলে। এই নিজেকে সে জানে না। ভাবে—অথচ জানেনা। যৌন-জীবনে তাব মায়েব অপরিমেয় স্বকীয়েচ্ছা তার দেহ ও পেশীব সংগঠনে আগ্নেয়। অথচ, বিকাশ সচেতন। এই পশু প্রাণ-শক্তিব প্রতি সে ঘৃণাশীল। নির্জিব ও তন্দ্রালু বোধ কবে নিজেব প্রতি, শবীবেব প্রতি, ব্যবহারের প্রতি। সে ভাবে। ভাববাব কিছু নাই তবু ভাবে। আর এই ভাবনাব মধ্যে নিজের চারপাশে একটা নির্জন শূন্যতা ও মুক্তির বিশ্রাম লাভ করে।

এই তার শীতল ও সংবেদনশীল মন এ তার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। এখানেই তার পিতার সঙ্গে নির্জন ও অবিভাজ্য একাত্মবেগ। অথচ, যখন সে ভাবে, তার বাবার কথা, হৃদয়েব একাগ্র ও বিস্তৃত সম্পদ নিয়ে পরাজিত: পরাজিত নিতান্ত

একটা স্থূল প্রয়োজনের আতিশয্যে—একটি কঠিন ও অপৌরুষেয় ঘৃণার উদ্রেক হয় মনে যা সে রোধ করতে পাবে না। শৈশবের ঐশ্বর্যবান প্রার্থনার মত অপটু ও অপরিণত মনে হয়-তার বাবাকে · তাব পিতার ঐ প্রকাণ্ড মন ও মানসাবৃত্তি। নিজের সঙ্গে পিতাব এই যোগাযোগ সে নিঃসহায়ভাবে স্বীকার কবে। বিকাশের মানস জীবনের অতি সূক্ষ্ম স্তবে তার পিতা-মাতার এই যৌন বিসম্পর্ক অতি সচেতন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে তাব মায়েব কাল্পনিক অতিক্রম নাই। কিন্তু তার পিতার বহু উজ্জ্বল, প্রতিশ্রুতিবান নিঃশ্বাস অপহৃত হয়েছে তাব মায়েব অনুদ্বেল যৌন চাতুরিব মধ্যে। বিকাশের অবচেতনে এই চিন্তা প্রবল। এই ইচ্ছাপূরণ ও মীমাংসা চলে নানা অভিব্যক্তিতে। জীবনকে যদি জীবন বলেই স্বীকার করে নেওয়া যায় তা'হলে তাব মধ্যে থাকে না . এক, দুই, তিন : কোনো সংখ্যার বিভাজ্যতা। তেমনি আমাদেব এই মন। সত্যি, কি আমি চাই : কি আমবা চাই—শাবীরিক পীড়ার মত এই মানসাতঙ্ক। জীবনকে অথচ ব্যবহাব কবি পুবাণো বইয়েব মত : প্রচুর জ্ঞান৷ শোনায়—প্রতিদিনকাব ধাবায় ভাসিয়ে দেওয়া একটা কাগজেব নৌকা। তবু, তাদেব মধ্য থেকে এক একটি প্রয়োজন তীক্ষ্ণ হতে থাকে আব মনের অগোচর সতর্কতায় লালিত হতে থাকে সেই ইচ্ছা, সেই অতিরিক্ত প্রাণশক্তি। সেই স্ফীত ইচ্ছায়, প্রবল প্রাণশক্তিতে আমবা স্বীকৃত হই। ব্যক্তিত্বে দৃঢ় ও কর্মক্ষম হয়ে উঠি। আর সেই ব্যক্তিত্বের পবিবেশিতায় গ্রহণ কবি জীবনের খুঁটিনাটিকে, চেষ্টা করি রূপ দিতে। কিন্তু, এই যে উদ্গীবিত ব্যক্তিত্ববোধ—বিকাশ ভাবে,—যা, যৌন-জীবন থেকে অনেক দূরের কোনো একটি বলবান আত্মোপলব্ধি। যৌন জিনিষটার বাইরে যৌন জিনিষটাব কোনো সদর্থ নাই। কে না জানে, কোন এক অনিবার্য মুহূর্তে আমাদেব শবীরেব কঠিন অনমনীয়তায়, পেশীর কাঠিন্যে যে কোনো একটা সাধারণ মেয়েবও ক্লেদোক্ত ও প্রচুব তৃণ-ভোজী গরুর মত পুষ্ট ও মেদবহুল দেহও কি অপূর্ব, বহস্যময় ও লাবণ্যান্বিত হয়ে উঠে। সেই সাপের মত সোহাগেব হিস্ হিস স্বব, আর ভাবী কোমরের জঘন্য ভঙ্গীগুলো—অথচ, কি নির্লজ্জ সুখকব : উপভোগ্যময়। কিন্তু, ঠিক পর মুহূর্তেই আমবা তাকে ঘৃণা করি—করতে বাধ্য হই। সেই ক্লান্তিকর, উন্মুক্ত

ঘৃণায় আমরা বাঁচি। সূর্যের ক্ষয়ের মত এই অসন্তোষ আমাদের মধ্যে বর্দ্ধমান। অথচ, এই সুখ, এই উপভোগ, আমাদের ব্যক্তিত্বের ভাঁজে ভাঁজে, পেশীর কোণে কোণে প্রক্ষিপ্ত ও গোপন। —তোমার চোখ, বলতে গিয়ে বলব,—মাটির গর্ভে, মণির মত। চুলের সঙ্গে শ্রাবণ শর্বরীর। এমনি করে মিশিয়ে ফেলি ব্যবহারিক কামনার সঙ্গে শূন্যের নিরাভ বাষ্পের। উপমা ব্যবহার করি। বিকাশ জানে, অত্যন্ত রূঢ়ভাবেই জানে,—পুরুষের পেশী হতে মেয়েদের যে রোমাঞ্চময় নিগ্রহ সেইখানেই কোনো পুরুষ পুরুষ ও নারী নারী। আর কোনো মুহূর্তে যদি আমরা দুর্বল হয়ে যাই কামনার উলঙ্গতায়, শিলার আধিপত্যে, কোনো মেয়ের চুলের দিকে চেয়ে মেঘের কথা স্মরণ করি . দেহের সঙ্গে বিদ্যুতের, ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতায় তা তারা বুঝবে, আর পাশবিক হিংস্রতায় করবে আক্রমণ। যৌন জীবনে কল্পনাশীলতার ভয়াবহ পরিণাম দেখে তার পিতা : তার পিতার প্রবল প্রাণশক্তি বাসনার দুর্জয় দুর্বিপাক।

এই পিতা-মাতার বৃত্তি প্রাধান্যে গঠিত তার দেহ ও মন। লঘু মন, নরম শরীর। কোনো কাজের সঙ্গে তার মনের যোগ নাই—মনের সঙ্গে নাই ইচ্ছার অবিভাজ্যতা। তাই, বিকাশ যখন লেখে তখন লেখে এবং যখন ভাবে তখন ভাবে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার লেখা আর ভাবা আঙ্গিক হৃদ্যতাহীন। হয়তো কোনো কিছু করছে, কিন্তু খানিক পরেই তার মন সেখানে থাকে না। ভাবনার মধ্যে তলিয়ে যায়; ভাবনার সমুদ্রে শব্দের ঢিল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলে। এটা তার একটা মানসিক ব্যাধি। অনর্থক শব্দ নিয়ে ছেলেমানুষের মত সব কিছু ফেলে খেলা। আলস্যের স্তূপে, বন্ধুদের সহবাসে, এমন কি রজনীর নিঃশান্ত মন্থরতায় তার মনে কথা আসে : শব্দ। স্মৃতি-হীন, অপ্রযুক্ত সব শব্দ। আর এই শব্দের ইঙ্গিতেই সে পায় আপন-সীমা ও স্বাধিকার। বোঝে তার অপ্রয়োজন ও সংযুক্তি। অথচ, সাধারণ ভাবে অত্যন্ত নিস্তব্ধ সে। মন্থর ও পরিহারশীল। সব-কথার আড়ালে থাকে সে : সব কথার পিছনে। ঘটনার বিস্মৃতির মধ্যে তার অধিবাস। জীবনে সে এত সংগঠিত ও সংগোপন যে, কোনো ঘটনা, কোনো অপ্রত্যাশিত, নিয়মানুবর্তিতার কোনো ফলশালী বীজ তার মনের মাটিতে ফলন্ত হয়নি। ছাব্বিশ বছরের

যৌবনে এত আত্মপরায়ণ সে। তার সতর্ক সীমারেখার মধ্যে কেউ আসতে পারে না আপন স্বাধিকারে। বন্ধু ও বান্ধব তার অপ্রচুর। আর প্রত্যেক পরিচিত এমন কি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও তাকে ভয় করে : নিজেদের অজ্ঞানে খানিকটা ঘৃণা। বিকাশ বোঝে' তা। নিজের স্বীকৃতি আরো তীব্র হয়। নিজের মধ্যে চলে সতর্ক সংগঠন। একমাত্র মুক্তি তার লেখায়। যতক্ষণ সে লেখে ততক্ষণ সে হালকা : ঘাসের ডগায় শিশিরের মত স্ফুট ও উজ্জ্বল ও হালকা। হালকা। নিজেকে এই সময়টুকু মনে হয় লঘু ও সবল। আশ্বিনের মেঘের মতন স্বচ্ছন্দ। কিন্তু, লিখতে সে পারে না, পারে ভাবতে—বিছানায় নিবলস প্রসারণের মধ্যে। কারণ লিখতে গেলেই তার একটা শারীরিক ব্যায়াম দরকার : কোনো অবয়বিক পরিশ্রম। অন্তুত তার ভয় এই শরীরের প্রতি। শরীর যতক্ষণ তার কাজে নিশ্চেষ্ট ততক্ষণ সে পরিপূর্ণ : ঠাসা, নিরেট ও অস্তিত্ববান।

বিকেলের ধূসর আলো পথে দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে।

* *

—আজ একবার তোমায় মাসীমার বাড়ী যেতে হবে। মা এক সময় তাকে বাইরে বেরুবার উদ্যোগী দেখে বললে।

—দরকার আছে ?

—হ্যাঁ, শুনলুম আবার অসুখটা আরো বেড়েছে।

—আচ্ছা, যদি সুবিধা পাই—হাঁসপাতালে দিলেই-ত পারে।

—হা, যেমন বুদ্ধি তোর। সংসার'ত ঐ তিনটি প্রাণীর। তবু'ত সুখে-দুঃখে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। সুরভি এসেছে শুনলুম।

—সুরভি ! কবে এল ? বিকাশ এক ঝলক মায়ের মুখের দিক চেয়ে নেয়।

—মায়ের অসুখ শুনেই এসেছে। রুনা এসেছিল কাল। কোথায় বক্তৃতা আছে। এমন তড়বড়ে হয়েছে মেয়েটা ; বিস্তর লম্বা আর চন্‌মনে। তোকে খুঁজছিল। মা একটু থামলো। ঠিক কি বলতে হবে খুঁজে না পেয়ে মৃদু গলায় বললে,—সুরভির ছেলে হয়েছে একটা। ওর বাবা নাম রেখেছে দীপঙ্কর।

বিকাশ নিঃশব্দে চুলগুলো পিছন দিকে ফেলতে থাকে। মা আবার একটু থামল।

—ওরা বজবজের দিকে একটা বাড়ী করেছে।

—কারা ?

—সুরভির স্বামী। চিন্ময়। রঙের ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছিল যে আরবানের যুদ্ধে। এখন কারখানা খুলেছে নিজে, কতবড় বিদ্বান।

বিকাশ পথে নেমে পড়ল। বাড়ী, ঘর আর ঘর ভর্তি সেই কলরব। বিকাশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বংশোদ্ভূত। নিয়মিত জীবন যাপন করবার কোনো এক অকাট্য ফাঁকে সে একদা মনে করে ফেলেছিল যে তার কিছু করবার আছে। ক্রমশঃ সে নিজের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে উঠল। সে সুরু করল লিখতে। আর সেই যা-ইচ্ছে লেখাকে আর্ট ভেবে তর্ক ফেঁদে বসতে লাগল। বি-এ পাশ করেই ঠিক করে ফেললে সে পড়বে না। কারণ, সে অকারণেই বুঝতে পারলে পড়তে গেলে করতে পারবে না। আর কোনো কিছু করবার, হবার, ব্যকুলতা বর্ণে বর্ণে তার মধ্যে উদ্গীরিত হয়ে উঠল। প্রফেসরদের বক্তৃতা শুনে পাশ না করবার ইচ্ছাটাই হল তীক্ষ্ণ। বিকাশ ঠিক করলে সে লিখবে। খানিকক্ষণের জন্য সে তার পট-ভূমিকা ফেললে হারিয়ে। কলমের ডগায় স্পন্দমান নক্ষত্রের মত অক্ষরগুলি ; সে এক মুহূর্তেই বুঝে ফেললে ব্রাউনিংএর কবিতার অন্তর্লীন বিস্ময়। সূর্যালোকের মতন ঝলমল করে উঠল সে। বিকাশ লিখলে। লিখলে অদম্য, লিখলে রাশি রাশি ; লিখতে লিখতে সে মরীয়া হয়ে উঠল। কিন্তু অতর্কিত একদিন আবিষ্কার করে বসল একটি পা-ও সে সরে যায় নি। তার পায়ের তলাকার ভূমি তেমনি নির্বিচল। তার মনে সন্দেহ এল। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল সময়ের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। ইতিমধ্যেই সে লিখে ফেলেছিল দুখানি গল্পের বই, একটি প্রেমের উপন্যাস এবং চতুষ্কোন বিশিষ্ট একটি 'কাব্যলেখা'। 'কাব্যলেখা'ই বইটার আসল নাম ছিল। লেখা সে বন্ধ করে দিলে ; লিখতেও তার অবসাদ আসে। চায়ের দোকানে বসে আলোচনা করলে টলষ্টয়, বালজ্যাক—আধুনিক কবিতার মর্মার্থ ও লক্ষ্য বুঝে নিয়ে উদ্বুদ্ধ তরুণরা তাকে ছাই চাপা আগুন ভেবে সম্মান করতে আরম্ভ করল। এই সময়, এত সময়কে নিয়ে সে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। এমন সময় একটি চাকরী পেলে। তার ভেতর স্বস্তি এল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—সুরভি। অনেকদিন পরে মুখোমুখি দেখবে সুরভিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করল বিকাশ। যেখানে ইচ্ছা করলেই সে আসতে পারে সেইখানেই তার দ্বিধা প্রবল হয়ে উঠে। আত্মীয় শব্দটির প্রতি তার গভীর বীতরাগ। রক্তের আনুবেক্ষণিক সূক্ষ্মতায় ব্যক্তি জীবনের সম্পর্কগুলি তার কাছে রহস্যময় ও হাস্যদ্দীপক। আসলে, আত্মীয়তা সে ভয় পায়।

—আর সুরভি, বিকাশ সশব্দে সিগারেটটায় একটা টান দিলে,—নরম, সবুজ চোখ; হাসবে; আর মৃদু শরীর থেকে লাবণ্যের স্তূপগুলি খান্ খান্ হয়ে খসে পড়বে। বিকাশ ঢুকল বাড়ীতে। সিঁড়িতে নামছিল সুরভি।

—তুমি। একটু থমকে গেল সুরভি। বিয়ের পর এই প্রথম দেখা। বিকাশ সস্মিত হবার একটু সলজ্জ চেষ্টা করল।

—কেমন আছ। চেয়ারে বসে তাকাল সুরভির দিকে। সুরভি হাসছিল। অনেকদিন আগের মত। যখন কেউ তাকে কিছু বলত, স্তুতি করত, সে যেমন চুপ করে তাকিয়ে চোখ দিয়ে মৃদু মৃদু হাসত।

—বস না। হেসে একটু বলবার চেষ্টা করল বিকাশ,—তারপর, আছ কেমন?

—ভাল। পাশের কুশানটায় বসল সুরভি,—তুমি কেমন?

—এক রকম। সুরভির চোখের দিকে চেয়ে আবার একটু লাজুক হাসল। নরম, সবুজ চোখ; ভুরুর রেখা দুটি একটু বেঁকানো।

—মাসিমার অসুখ বেড়েছে?

—দেখতে এলে? সুরভির গলার আওয়াজ স্বাভাবিক পাৎলা। বিদ্রূপের মত। অনেক আগের দিনে, অনেক কথা বলতে গিয়ে থমকে যেত, বুঝতে পারত

না সেই তার ঐ কণ্ঠের ঝিল্লি আওয়াজ : সরু ও শাণানো। সন্তানেব আর্দ্রতা সুরভিব শরীরে। চুল থেকে একটা বৈদেশিক মিষ্টি গন্ধ উঠছিল।

—কেমন আছেন এখন ?

—ঘুমোচ্ছেন। এখন একটু ভাল। সুরভি তাব দিকে চেয়ে হাসলে। ঠোঁটের কোণে এক ফোঁটা কালির মত ছোট্ট একটি তিল। হাসলে নড়ে। বিকাশ অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য কবে।

—কবছ কি এখন ? অপেক্ষা কবে জিজ্ঞাসা করলে সুবভি।

— চাকবী।

—পডলে না কেন ? অনর্থক আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়াজডি কবতে কবতে বললে। যেন আবহাওয়ার খবর জানতে চাইছে।

—পডলাম না।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দ। বিকাশ নিজেকে অসহায় বোধ কবতে থাকে—তাব ভেতর উদ্বেগ আবো তীব্র হয়।

—তোমার ছেলে দেখালে না ? এক সময় প্রয়োজন মনে করে বলল বিকাশ।

—কবি মানুষ ! হেসে বললে সুরভি। সেই তিলটি ঠোঁটের সঙ্গে উঠে পড়ে।

—আমি'ত জানতুম ছেলে-পুলে তোমাদের চেতনার বাইরে।

—তোমাব জানাটা সংশোধন করে দেবো। কথাব পিঠে কথাব মতন বললে। সুরভি তার ছেলে আনতে গেল। বিকাশের একটা নিঃশ্বাস পড়ে। সমস্ত স্নায়ু আবার সবল হয়। অজ্ঞাতেই রুমাল দিয়ে কপাল মোছে। —এদেব সঙ্গে বাক্যালাপ করার চেয়ে, সে এতক্ষণে সুস্থির হয়ে ভাবতে পারলে,—ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম আলোচনা সহজ। বাস্তবিক ! মেয়েরা নির্বোধ হলে তাদের আশ্চর্য রকমের সুন্দর দেখায়। যা ইচ্ছা কথা আর সেই কথার ফেনায় ফেঁপে উঠতে পারলে হিংস্র রকমের দীপ্তিমান হয়ে উঠে তারা। সবাব উপর দেহের প্রতি এক পাশবিক ভালবাসা। এমন কোনো সময় নাই যখন নাকি এরা শারীরিকতায় অপ্রস্তুত। মাথার ঘন রেশমী চুল থেকে পায়েব চলে যাওয়ার ভেতর পর্যন্ত এক নাটকীয় সচেতনতা।—অসম্ভব,—বিকাশ হতাশ হয়ে ভাবলে,

মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ শুধু অসম্ভব নয়, অসমসাহসিক ও রীতিমত ব্যায়াম-সাপেক্ষ।

সুরভি ছেলে নিয়ে এল। একতাল শুভ্র মাংসপিণ্ড। কতকগুলো আদিম আদরের শব্দ কবতে করতে চুমো খায়।

—বাঃ, চমৎকার ছেলে। বিকাশ ভাবছিল জীবতত্ত্বের কথা। কি আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় ঐ নিছক রূপহীন মাংসপিণ্ডটি চিহ্নিত হবে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, ঝলমল করবে প্রাণের প্রাচুর্যে: স্পন্দমান। একটা য়ুটোপীয়া। জড় থেকে প্রাণ; এক সময় প্রাণ ছিল বায়ুতে; কোনো এক সময় পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না। বিকাশ বুঝলে সব সম্ভব—কিছুই আশ্চর্য নয়।

—বাঃ, চমৎকার ছেলে। বিকাশ বললে,—চমৎকার গায়ের বঙ হয়েছে।

—আরো ফবসা হবে। খুসীতে ডগমগ কবে উঠে সুরভি।

—কার মত হযেছে বলতো? বিকাশ ভাবনাব মধ্যে পডল। কেমন করে ঐ মাংসপিণ্ডটি কোনো মানুষেব সঙ্গে উপমিত হতে পারে। বিকাশ হঠাৎ যা বলতে যাচ্ছিল তা বললে না।

—বাপেব চেহারাই মনে হচ্ছে।

—কিন্তু গায়ের রঙ আমার মত; বড় হলে আরো ফবসা হবে। বড্ড রোগা। 'রিকেট' না কি। কডলিভার মাখাতে বলেছে ডাক্তার। ছেলেটি হঠাৎ চীৎকাব কবে উঠল। অদ্ভুত, অমানুষিক চীৎকাব। সুরভি হাঁফিয়ে উঠে। ছেলেটি মরীয়া হয়ে যায়। বিকাশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সুবভি তাকে দুধ খাওয়াতে বসলো। অনেকক্ষণ বাদে বিকাশ নিশ্চিন্তে চক্ষুষ্মান হয়ে তাকে দেখে। কাঁধের নমনীত ক্ষেত্র ঢালু হয়ে বুকের কাছে ফেঁপে উঠেছে মাংসের প্রচুব স্তূপে। পরেছে ফিকে ফিরোজা শাড়ী। দীর্ঘ আঙুলের ডগায় রক্তের অতিরিক্ত সঞ্চয় আভায় উজ্জ্বল। আঙুর-আঙুল। পেশীর প্রত্যেক ভাঁজে ভাঁজে এক অপরূপ, রহস্যময় প্রচুরতা। গলার শুভ্র মেদে অনেকদিনের নিশ্চিন্ত নিদ্রা দুটি সুন্দর ভাঁজ ফেলেছে। কোমল গ্রীবা ত্বক: চুলের একটি স্তবক সেইখানে পুঞ্জিত। বিকাশ দেখতে ভয় পাচ্ছিলো। ঐ শরীরকে ঘিরে এক বিচিত্র রহস্যের জাল। বৈদ্যুতিক

আলো নড়ছে—বিকাশের নিঃশ্বাস অসরল হয়ে উঠে। অনেকদিন আগের ভয়, সেই মুখর ভয়, তাব দিকে চেয়ে থাকবার : তাব সবুজ, অনুদ্বিগ্ন চোখ : রেখায় নিঃসাড : ইচ্ছার কোনো দাগ যেখানে পডেনি : নির্বিকাব নির্বুদ্ধিতায় পিচ্ছিল ও দুর্গম। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ সে একবার মুখ তুললে। পিঠেব আলগা কাপডটা টেনে দিলে। বিকাশের দিকে চেযে একটু বোধগম্য হাসে। বিকাশ লজ্জিত হয়।

—একটা বিয়ে-থা কর। আমবা নিমন্ত্রণ খাই। ছে'লকে আদব করতে কবতে বললে সুরভি।

-মেয়ে কই

—ভুলে গেছলাম। লেখক মানুষের যোগ্য মেয়ে ত সহজে মেলে না। বিকাশেব বিরক্তি কঠিন ও অদমনীয় বোধ হয়। নিজেকে বোকা মনে হয়।

—রুণা কোথায়? তার গলায় সমস্ত অনুভূতি নির্জীব, উৎসাহ নাই।

—হৈ হৈ করে বেডাচ্ছে। অত বড মেয়ে একটুও স্থিবতা এল না। চা খাও। সুরভি বাইরে গেল। বিকাশেব ঠোঁটের এক পাশে লুকানো হাসি এইবাব প্রকট হয়ে উঠে। সুরভি বসে থাকতে ভালবাসত।

'হৈ হৈ করে বেডাচ্ছে'। কি অপরূপভাবে তার ঈষৎ বিস্তৃত ঠোঁট দুটি খুলে গেছল। সুরভি চুপ করে বসে থাকত। রাণীব মত। স্তূপীকৃত লাবণ্যেব মধ্যে। সিঁড়িতে হিল তোলা জুতার সশব্দ আওয়াজ করতে কবতে ঘবে এসে ঢুকল রুণা, ওবফে অরুণা : সুরভির ছোট বোন।

—তুমি! গলায় একটা বিস্ময়েব রকেট ফাটিয়ে পাশে এসে বসল।

—তুমি ত ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ। মনুষ্যত্বের বালাই যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিক হলে বুর্জোয়াদের চক্ষুলজ্জার মত উবে যায় জানি : এ ঘবে এসো; এখনো দিদির সঙ্গে আর তার এই ভয়ানক সম্ভ্রান্ত ঘরে বসে ছিলে কেমন করে : subtle.

—Make yourself at home. তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার দরকার ছিল। তাকে নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে তার হাতলের উপর বসে উপরোক্ত উক্তিটি করলে অরুণা।

—ব্যাপার কি ?

—জানো, খবর রাখো, আমি সমাজতত্ব পড়ছি।

—তুমি'ত ট্রিট্‌চ হবার সাধনা করছিলে শুনতে পেলাম।

—ছেড়ে দিলাম। শূন্যের উপর নিটোল হাতখানি ঘুরিয়ে বলল, —আমার প্রতিভা তার চেয়ে অনেক বড়।

—প্রতিভার সঙ্গে সমাজতত্বে কি ?

—আসল কথা lifeকে sports করতে চাই কিন্তু, সমাজতত্বে আটকাচ্ছে। help me বিকাশদা এরা আমার বিয়ে দিতে চায়। আমাকে জায়গা দাও: risk করতে দাও।

—উত্তম প্রস্তাব। কলেজের বইয়ের আড়ালে ষ্টোপস পড়েছো কিনা জানিনা—আমরা পড়ি যখন স্কুলের ছাত্র। Radiant Motherhood পড়লে দেখতে পাবে মা হবার যথেষ্ট লক্ষণ তোমার শরীরে বর্তমান।

—কিছু বই বাকী রাখিনি। Marriage and Moralsএর নোট পর্যন্ত নিয়েছি খাতায়। কিন্তু, দিদিকে দেখেছো—ছেলে হবার পর ? আমি যা কল্পনাতেও ভাবতে পারি না—তা শিশুকে স্তন্য দান।

বিকাশ শব্দ করে হেসে উঠল। সুরভির চেয়ে দু'বছরের ছোট। ছিপছিপে। কথা বলবার সময় ঢেউ-এর মত দোলে। অনেকক্ষণ পরে মেয়েটিকে দেখতে তার ভালো লাগল। কালো চোখের মণিতে সজীব উত্তেজনা। নাকের গোড়াটা একটু উপর দিকে তোলা। গালের হাড় দুটি চিতিয়ে পড়েছে। মুখটি আরো দৃঢ় ও কর্মঠ দেখায়।

—ঘরে মন বসছে না কেন ? ঘর সাজাও। এত সাদা দেওয়াল চোখের পক্ষে খারাপ।

—গান্ধীজি কেন দেওয়ালে ছবি টাঙান্‌না জানো ?

—গান্ধীজি সম্পর্কে বেশী-জানি না; হয়ত তিনি ভালো ছবি খুব কম দেখেছেন।

—সিনিকের মত কথা বলো না। ভালো জিনিষ শিল্পগত-ভাবে কেবল তাই, যা absolute good. ঘরে টাঙানো ছবি কোনোকালে ভাল হয় না।

—মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হতে পারে তো। ছবির রঙ মনের উপর ছাপ ফেলতে পারে।

—রঙীন হয়ে উঠা বুর্জোয়া ভাবুকতা। যা যুগ-ধার্মিক নয় তার মধ্যে স্বাস্থ্য নাই।

—রঙ ফুরিয়ে যাবে এমন একদিন পৃথিবীতে আসবে কি?

—বাজে ফিলজফি কপচাচ্ছ কেন? অরুণা ফুঁশে উঠল,—রঙ মানে স্বাভাবিকতার জৌলুষ। ছবি দিয়ে ঘর সাজানোর চেয়ে পাঁচিল ভেঙে দাও।

আমি বাঁচতে চাই বিকাশদা। রুণা বলছিল, —তুমি হাসছ। চারবছরেব বড় হয়ে বুদ্ধদেবের করুণা নিয়ে অজ্ঞানতার প্রতি হাসছ। কিন্তু তুমিও যে আর সবায়েব মত নির্বোধ একথা দয়া করে আমাকে ভাবতে সুযোগ দিও না। কারণ যখন আমি বড় হব, ছাড়িয়ে যাবো তোমাদের মাথা, তোমার দিকে চোখ পডলেও চিনতে পাববো না।

সুরভি চা নিয়ে এল। সঙ্গে কিছু খুচরো খাবার।

—তুমি একটু বাইরে যাবে দিদি—কণা বললে,—একটা বিজনেসের স্কীম নিয়ে আলোচনা করছি। তোমাব থেকে কোনো লাভ হবে না, কাবণ এর পরিভাষা তুমি বিসর্গও বুঝবে না।

—তবে থাকিই না।

—না আমাদের ক্ষতি হতে পারে। মন্ত্র-গুপ্তি-ই হল প্রত্যেক শুভকাজের প্রথম কথা। দরজাটা সুবভিকে বাইবে রেখে ভেজিয়ে দিলে।

—শোনো বলি ফিল্মে একটা চান্স পাচ্ছি। এখন এটা এ্যভেল না করাটা গাধামী। অথচ, এখানে, মানে বাড়ীতে, যে থাকৃতে পাবি না এ বিষয়ে কোনো ফাটল নাই। মায়ের অবস্থা যতই খারাপ হচ্ছে বামকৃষ্ণ মঠে বাবার আনাগোনা ততই বাড়ছে। নিয়ম করে তিনি বেদান্ত আর গীতা পড়েন। অরুণার গলায় উদ্বেগ ও উত্তেজনা রিন্ রিন্ করে। যতক্ষণ সে কথা বলছিল বিকাশ নিবিষ্টভাবে তাকে লক্ষ্য করে—যেন একখানা কড়া পাকের উপন্যাস। আগাগোড়া পড়ে সমালোচনা লিখতে হবে। কথা বলতে বলতে সে উত্তেজনায় হাঁপায়, আর কথার অকথ্য ঝাঁঝে তার শরীর দোলে।

—আজ ডিরেক্টর সেনের সঙ্গে দেখা করলুম। এপ্রিল থেকে চান্স দেবে একটা। ভাবছি কন্ট্রাক্ট করব। তুমি কি বল?

—তুমি ফিল্মে যাবে? বিকাশ এক বিমূঢ়তার মধ্য থেকে যেন কথা বলছে, —কিন্তু ফিল্মে কেন তুমি যাবে? ফিল্মে যাবার কি হেতু তোমার?

—ফিল্মে যাবো না তারই বা হেতু কি? আসল কথা, আমার এমন কতগুলি গুণ আছে যা ফিল্মে চলে আমি তার সুযোগ নিতে চাই।

—সমাজতত্ত্বে কি মত পেলে? বিকাশ ক্রমশঃ প্রাসঙ্গিক ও সবল হয়ে আসে।

—ননসেন্স—কেউ কিচ্ছু বোঝে না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এই risk কেন? life কে sports করার ভেতর সিনেমাকে টেনে আনার কি বুদ্ধিমান যুক্তি থাকতে পারে। আসলে সেটাও একটা system.

—তর্কটাকে নেতিবাচক করে তুলছো কেন? তুমি সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে পারো, একটা জীবন্ত ব্যক্তি তার সমস্ত আয়ুষ্কালটা কেবল সন্তান প্রসব করবে, মোটরে চড়ে লেকে হাওয়া খাবে আর দুপুরবেলা ঘুমিয়ে উঠে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে স্বামীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের গল্প জমাবে। আর তারপর কি জানলে, সিনেমাটা একটা system হলেও আমার সঙ্গে একটা ব্যক্তিক লেন্-দেন আছে, যেটাকে আমি feeling বলি। আসলে আমি feel করতে চাই যে আমি বেঁচে আছি।

বিকাশ তার চোখের দিকে তাকাল। থবথর করছে চোখের অপরূপ অসহমানতা। গ্রীক প্যাটার্ণের নাক : চাপা চিবুকের উপর উদ্ধত। বিকাশের মনটা দুলে উঠে। খানিকক্ষণ কথা না কয়ে থাকতে ভালো লাগে।

—তোমার অভিভাবক যদি সম্মত না হন?

—হবেন না; না-হবার কারণ-না থাকলেও হবেন না; তাদের সামাজিক সম্মান। ড্যাম্-ইট্! আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো এরা আজো যে অর্থে বলে সামাজিক সম্মান তার অস্তিত্ব আজকে কোথায়। আমরা কি আজো সেই ফিউড্যালিজিমের মধ্যে বাস করছি না কি! আসলে এরা চার পাশের ঘটনাগুলো দেখবে না, জানবে না, অথচ এই সম্পর্কেই মন্তব্যগুলি তাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ও

সাত্ত্বিক হয়ে উঠবে। Brave New Worldএর কথা মনে আছে? যুক্তি না থাকলেই সেইক্সপীয়র আর মনুসংহিতা : কবিতা আর বিধান।

—কিন্তু তোমার ইভোল্যুশনের ক্ষেত্রটি সব কিছু জড়িয়ে ব্যক্তিক-ই থেকে যাবে। তোমার ব্যক্তিক অভিব্যক্তিতে তুমিই হয়ে পড়বে অপাংক্তেয়। কারণ সামাজিক কি মানবিক অর্থে এর কোনো প্রতিশ্রুতি নাই।

—যা বলছ সেটা হয়ত কেন, খুবই ঠিক। কিন্তু আমার condition কে ব্যবহার করা ছাড়া এই মুহূর্তে আমার কি কর্তব্য থাকতে পারে?

—থাকতে পারে না এ-টা তুমি ধরে নিচ্ছ।

—ধরে নিচ্ছি না, মেনে নিচ্ছি। আর মেনে না নেওয়া ছাড়া তোমার মানবিক অর্থের কোনো ব্যাখ্যাই তুমি তৈরী করতে পারবে না। তুমি কি condition বলতে হল্‌কেন বা শরৎ চাটুয্যের উপন্যাসের বিষয়বস্তু মনে করো?

—একটা জিনিষ কল্পনা করতেও অপ্রিয় লাগছে রুণা। বিকাশের গলায় আবেগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে,—একপাল বয়াটে, চাকরী না পাওয়া অশিক্ষিত ছেলে আর ডাঁসা পেয়ারার মত রসালো মেয়েদের মধ্যে জায়গা নিয়েছ।

রুণা সশব্দে হেসে উঠল। টেবিলে চড় বসিয়ে দিলে একটা।—বলেছ চমৎকার! ডাঁসা পেয়ারার মত রসালো। দিদিকে দেখেছো? অবশ্য হেমেন মজুমদারের আর্ট নিয়ে তর্ক ওঠাটাই অস্বাভাবিক, কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন পুরুষ কবি মাতৃত্বের ব্যথায় ছটফট করে। অবশ্য কবি জাতীয়দের ভেতর female hormones টাই বেশী, তবে সুকৃতি এই আজকাল গদ্য কবিতা বেরিয়েছে।

অরুণা দুলতে দুলতে বলছিল—নিজেকে আমি ছড়িয়ে দিতে চাই : হারিয়ে যেতে চাই : ফুরিয়ে যেতে—প্রাণের প্রবলতায় কেঁপে উঠতে। তুমি আশ্চর্য হবে আমি কোনো দিন স্বপ্ন দেখিনি। শোনো বলি, বিকাশদা, আমার একটা থিওরি আছে। আমি চাই জীবনকে ব্যবহার করতে—যেখানে আমি সক্রিয় ও সচেতন। নিজের মধ্যে আর্টকে রেখে আমার প্রয়োজনকে জড় করে তুলতে পারবো না। আসলে এরা ভুলে যায় পরিবেশকে? যত বাড়ছে নগর, ছড়াচ্ছে কারখানা, রাজায় রাজায় বাধছে লড়াই তত বেশী আমরা ছড়িয়ে যাচ্ছি,

ভেঙে যাচ্ছি পরস্পরের কাছ থেকে, সম্মেলনতা থেকে। আজকের এই রাষ্ট্রের আওতায় যখন তা হতে বাধ্য তখন তাকে তা নয় বলে অস্বীকার করার নাম বুড়োমী, বোকামী। আমার বক্তব্য কি জানলে, bare-facts হিসাবে যতক্ষণ এগুলো না দেখতে পাবছো, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ততদিন তুমি শোচনীয়ভাবে অপটু; হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া ছাগলের মত অসহায়। তোমার শক্তি তোমাব সচেতনতায়। কডওয়েল পড়েছো? আহা। ছোকরা মারা গেল। কি সাফ্ যুক্তি।

—কিন্তু তোমার পরিবেশ তুমি কাটিয়ে উঠবে কি করে? বিকাশ যেন এতক্ষণ কিছু শোনেনি, কিংবা বোঝেনি, কিংবা, তাকে উত্তেজিত দেখবার জন্য অনর্থক বললে।

—জানি—condition! যেটা নর্মাল সেইটা নিয়েই সমাজতত্ব, আলডুসের নাক বেঁকানি: scholastic philosophy. কিন্তু conditionকে কাটিয়ে উঠাই'ত প্রাণধর্ম। probabilityকে না মানাই'ত খানিকটা পিছিয়ে থাকা। আব তা'ছাড়া conditionকে জীবনের উপর স্বীকারই যদি কবে'নি তাহলে আমার চাওয়াটাকে তাব মধ্য থেকে নাকচ কববো কি করে?

—তুমি যা চাও কোনো পাঁচ মিনিট এক সঙ্গে বসে। ভেবেছো সেটা কি? বিকাশের গলায় আওয়াজ আবাব শাণানো হয়ে উঠে: চোখে ব্যঙ্গ টলমল কবে। হাসিকে দমন কবে সে বললে।

—তোমার মনটা আশাতীত রকমের scholastic ধাঁচে। সরল জিনিষেব মানে তোমাবা বুঝতে পারো না।

—Scholastic কথাটা কি গালাগাল?

—না, বিকাশদা, ঠাট্টা নয়: সীরিয়স আমি। সিনেমা আমার লক্ষ্য নয়; বিয়ে আমি করতেও পারি কিন্তু সে কেবল অবশ্যম্ভাবী বলে নয়। আমার খুশীর মধ্যে আমি থাকতে চাই . আমার স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে।

—কেউ যদি তোমাকে ছেলে মানুষ বলে রুণা।

—স্বচ্ছন্দে তাকে বুড়ো মানুষ বলবো।

—অভিজ্ঞতাকে মানো?

—অভিলাষকে মানি। একের অভিজ্ঞতা অপরের কাছে ঘটনা।

—শেলী যা কবিতায় প্রকাশ করতে চেয়েছিল তুমি তা জীবনে উচ্চারণ করতে চাও। পৃথিবী যে কারণে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে পৃথিবীতে আপেল ফল পড়ছে সেই কারণে; আর মানুষ যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এর কারণও হাওয়ার চাপ।

—তুমি pragmatist. তুমি life-forceকে স্বীকাব করো না। তুমি প্রাগৈতিহাসিক।

—Pragmatist মানে প্রাগৈতিহাসিক নয়।

—জ্বালিও না। কারুর ভাববার পথ বুদ্ধি দিয়ে, কারুব বোধ দিয়ে, কারুব বা স্বভাবেব ভেতব দিয়ে: নির্ভেজাল আবেগেব মধ্যে: লবেন্সের মত।

—লবেন্স সভ্যতার বিবোধী ছিলেন।

—কারণ তাব আবেগেব রূপ ছিল আদিমতার, অজ্ঞানতার, স্বাভাবিক বিশুদ্ধতাব; আর আমার আবেগেব ধর্ম হল আধুনিকতার, সচেতনতার, যান্ত্রিক বিক্ষুব্ধতার। বিকাশদা,—যোয়ান অফ আর্কেব হাতের মশালেব মত মুখটা তুলে ধবে,—বিকাশদা, প্রত্যেক মুহূর্তকে আমি মুচড়ে নেবো: গভীর আনন্দেব মত জীবনকে আমি গ্রহণ করব। তুমি নিশ্চয় জেনো জীবনে একবারেব বেশী আমি মরব না।



*   *

ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথ হাঁটছিল বিকাশ। জনবিবল পথ। বাত্রি অনেক হয়েছে। সিগাবেটে একটা টান দিতেই মাথাটা ঘুরে উঠল। এখুনি যেন সে পড়ে যাবে। খানিকটা স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কবল। মাটি দুলছে। প্রায়ই তাব এমনি হয়। মাথার মধ্যে সমস্ত রক্ত দুলতে থাকে, চোখ ভারী হয়ে আসে—যেন নেশা করেছে: ঘুম পেয়েছে। ডাক্তার পবীক্ষা করে বলেছিলো—Nervous debility: স্নায়বিক দুর্বলতা। একটা রিক্‌সো নিলে। বেশ ঝিরঝিবে হাওয়া দিচ্ছিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শার্সির ধারে দাঁড়িয়ে বিকাশ বর্ষা দেখছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাঁচেতে মাঝে মাঝে এসে লাগছে হাওয়ার এক একটা ঝাপট। জনবিরল পথ — আর একটানা বৃষ্টি পতনের আওয়াজ পথের পিচের উপর বাজছে। শার্সিটা খুলে ফেললে বিকাশ। এক ঝলক ভিজে হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে। বাইরে হাতটি বাড়িয়ে দেয়। নরম, ভিজে, সরু ফোঁটাগুলি হাতের উপর পড়তে থাকে। চুপ ক'রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। নীচের পিচ দেওয়া টুকরো পথটায় গ্যাসের আলো চিক্ চিক্ করছে। এক সময় সে মুখটা বাড়িয়ে দেয়; মুখে এসে লাগল বৃষ্টির ছাঁট। গলার জামাটা গেল ভিজে। বিকাশের ভালো লাগল। মনটি তার বিন্যস্ত হয়ে উঠে। হঠাৎ পাশের ঘরে কয়েকটি কণ্ঠ উল্লাসে ফেটে পড়ে: ব্রিজ খেলার ফলাফল। খাটে এসে বসল। অপ্রশস্ত ঘর। এটি একটি মেস। বিকাশের বাড়ীর সব বায়ু পরিবর্তনে যাওয়াতে তাকে উঠতে হয়েছে মেসে। সমস্ত সকাল থেকে বাদল নেমেছে। অবিশ্রান্ত জল আর জলের আওয়াজ। মাথার ভিতর সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। সকাল থেকেই ভালো লাগছিল না বিকাশের। অফিস কামাই করেছে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে অফিস কামাই করতে তার আধ্যাত্মিক রকমের ভালো লাগে। সমস্ত সকালটা উপদ্রব করেছে ছেলেদের সঙ্গে, ব্রিজ খেলায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে হল্লা করেছে প্রচুর; নিজেকে উৎসাহিত করবার নানা চেষ্টার পর সে শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক সময় তার একা থাকবার ইচ্ছা হয়। চলে এল নিজের ঘরে। রুমটি পরিপূর্ণভাবে ফাঁকা। রুম-মেটটি বেরিয়েছে প্রণয়িনী সম্ভাষণে। বি-এ ক্লাশের ছাত্র। প্রণয়িনীর সে প্রাইভেট টিউটর। আঠারো বছরের মেয়ে, পড়ে সেকেণ্ড ক্লাসে। শিক্ষক ও ছাত্রীর প্রেমের ভিতর নাকি হৃদয়বৃত্তির এক অপরূপ উদ্ঘাটন আছে। অমূল্য খুব উৎসাহী শিক্ষক ও মেধাবী প্রেমিক। প্রত্যেক রাত্রে ঘুমের পক্ষে তার

কন্‌ফেসন্‌গুলি হিতকর কাজ করে। বিকাশের ঘুম খুব পাৎলা। ঘুমাতে না পারলে ছটফট করে।

একটা সিগারেট ধরালো বিকাশ। পড়ে থাকা কবিতার বইটা আবার চেষ্টা করলে পড়তে। কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলে তার চোখ অক্ষরগুলিকে অনুধাবন করতে পুরোপুরি নারাজ। একটা ব্যাধিগ্রস্ত ভালো-না-লাগা ক্রমশঃ মনের উপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। এই ভালো-না-লাগা মন নিয়ে ছটফট করতে করতে খানিকটা নির্বিকারভাবে শুয়ে রইল—সিগারেটটা শেষ করলে। একটু লিখলে কি হয় বাদলের কবিতা। বাদলের সময় বাদলের কবিতা লেখা যায় না কেন? দুঃখের সময় দুঃখের কবিতা? বিকাশ হঠাৎ ভাবতে পারলে আমরা কি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে অভ্যস্থ। কি চমৎকার অন্তর্বেদনাই প্রকাশ হয় আমাদের ভঙ্গীতে মানসাবৃত্তির অসাড় ইতিহাস। কিন্তু ভাগ্যিস আমরা অপটু হয়ে পড়িনা, বেদনার মত ব্যথিত হই না। অথচ একমাত্র সময়ের বিস্তীর্ণতায় আমাদের ভাবুকতা সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন হয় ও হতে পারে কারণ, আমাদের যে কোনো ভাবুকতা নিছকভাব হিসাবে বিশুদ্ধ নয়। যে কোনো একটি ভাব আসলে কতকগুলি ক্রিয়াশীল ঘটনার সমষ্টি: অন্ততঃ মানবিক ভাব হিসাবে এইটাই সত্যি কথা। তার মানে, আমরা যখন ভাবি, তখন এই প্লবমান সময়কে আমাদের মধ্যে ঘন হতে' দি। অথচ, বিকাশ অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে ভাবলে, এই পরিমাপহীন সময়ের মধ্যে যে কবিতা, বা যে কোনো আর্টের সৃষ্টি তার মধ্যে প্রাণের বেগ উহ্য থাকে কি করে। এই সময়কে কি অতিক্রম করা যায় না? দুঃখের সময় দুঃখের কবিতা · বাদলের সময় বাদলের? চেষ্টা করা যাক্। বিকাশ ফাউন্‌টেন থেকে কালি ঝাড়ল। ৬ই মার্চ। অক্ষর বসালে। কলিকাতা। থেমে থেমে লিখলে। কিন্তু তার মনে কথা এল না। নিঃসাড়, পঙ্গু মন। সন্ধ্যা ৭॥০টা। প্রত্যেকটি অক্ষর সযত্নে স্থাপন করে কাগজের মাথায়। যদি হঠাৎ শব্দ এসে পড়ে: ঢেউ-এর মত বানের মত। বিকাশ খানিকক্ষণ কাগজের উপর আঁচড় কাটতে থাকে। কবিতা লেখবার রীতি তার এমনি। কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করে ইতস্ততঃ—আর মেঘের মতন ভারী হয়ে উঠে তার মন। তারপর, এক আশ্চর্য দৈবিক উপায়ে তার মনে একটি শব্দ আসে: অকাট্য, নির্মম,

বাষ্পের একটি শব্দ। আব হঠাৎ সে প্রখর হয়ে উঠবে : সচেতনতায় ঋজু ও উজ্জ্বল। ধারালো হয়ে উঠবে। আর এক সময় তারার ফেনার মত ফেটে পড়বে শব্দের জলন্ত ঝাপটে। সে জ্বলবে, কাঁপবে, আর খানিকক্ষণ বাদেই নির্ঘাৎ একটি কবিতা তার কলমের মুখে জন্ম নেবে!

বিকাশ শব্দের জন্ত অপেক্ষা কবতে লাগল। কবিতা লেখবার জন্ত যে 'পারিপার্শ্বিক দরকার, দরকার ভাব ও স্বর্গীয় অনুষঙ্গের তাব কাছে কবিতার এ সব ভাঁড়ামী। যে কোনো সময়ে সে লিখতে পারে যে কোনো উপলক্ষ্যে, কেবল তাব চাই শব্দ। কোনো শব্দে সে শৃঙ্খল পরাতে পারলে স্বচ্ছন্দে তৈরি করে দেবে শব্দের সিঁড়ি। কিন্তু তাব মনে কোনো শব্দ এল না। কোনো শব্দ স্থির হল না। পিছলে পিছলে পড়ে মনেব দুর্জ্ঞেয় অতলতায় যা সে অনুভব পর্যন্ত করতে পারেনা। কোনো একটি অখণ্ড উচ্চারণে তার মন নমনীত হয় না। কোনো শব্দ ধরতে পাবে না সে। নিঃশব্দে কলম হাতে তাকিয়ে রইল সাদা কাগজটার দিকে।

হঠাৎ এক সময় দরজা ঠেলে ঢুকল অনুপম। বর্ষাতি থেকে টস্‌টস্‌ কবে জল ঝরছে। নিঃশব্দে জামাটা খুলে আল্‌নাতে টাঙিয়ে বাখলে। তোয়ালে দিয়ে শক্ত কবে মুছলে ঘাড় ও মাথা।

—কবিতা লিখছ! একলা বসে থাকার কবিতা।

—জানলাটা ভেজিয়ে দাও। বিকাশ এক সময় বলল। হঠাৎ সে সম্বিৎ ফিবে পেল,—কোথা থেকে আসছ?

—ডাক্তাবখানা থেকে। একটা সিগারেট দাও।

—অসুখ বেড়েছে নাকি? সিগারেটে আগুন ধবিয়ে বললে বিকাশ। অনুপম উত্তর দিলে না। সে সাধাবণতঃ কথা বলে অল্প। সিগারেটেব ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকাব করলে।

খানিকক্ষণ বাদে আচমকা বলে উঠল,—আমি ভাবছি চাকরী ছেড়ে দেবো।

—পম, কিছু হয়েছে তোমার পম। ক'দিন থেকে তোমার মন ভালো নাই।

—কদিন থেকে ভালো করে ঘুম হচ্ছে না—প্রত্যেক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি। এলোমেলো, ঝাপসা, মন-ভারি করা স্বপ্ন।

—অফিসে বড়বাবুর সঙ্গে কি হয়েছিল ?

—তুমি জানো না বিকাশ, সেদিন লোকটাকে আমি খুন পর্যন্ত করতে পারতুম। অনুপমের চাউনি চক্‌চক্‌ করছে। বিকাশ তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে তাকাল।

—চাকরী ছেড়ে দেবে ঠিক করে ফেলেছো ?

—এক রকম।

বিকাশ কিছু বললে না। নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। অনুপমের যে কিছু না করলেও চলবে এমন নয়। আর কিছু না করে সে থাকতে পারে না। বিকাশ অনুপমকে জানে। সে চুপ করে অনুপমের দিকে তাকাল। অনুপম কিছু চিন্তা করছিল। সে যখনই কিছু ভাবে বোঝা যায়। কপালের চামড়াতে একটা মৃদু রেখা পড়ে। পাৎলা, দৃঢ়, সংবদ্ধ মুখ। রোদে রূঢ় চামড়া। মাথার সামনে একটু টাকের আভাস। কিন্তু অনুপমের চলবে কি করে। সে একজন প্রথম শ্রেণীর কেমিষ্ট। মেকানিজিমেও তার পুরো দখল আছে। চাকরীর জন্য অবশ্য সে ভাবেনা। কিন্তু অনুপম চাকরী ছেড়ে দেবে। বিকাশ সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাল।

—ভাবছি বিকাশ—চাকরী করবনা। অনুপম চোখ তুলল,—আমি চাকরী করে যা পাই তার চেয়ে কম পেলে আমার চলে যাবে। অনুভা চাকরী নিতে চায়। দরখাস্ত পাঠাচ্ছে এখানে সেখানে।

—কি বলতে চাইছ পম ?

—বাবা আরো অনেকদিন বাঁচবেন। অনুভা পালাতে চাইছে। আর আমি নিশ্চিত সে একদিন বাবার কাছ থেকে ছিটকে যাবে। ঐ ছায়ায় সে ঢেকে রয়েছে।

—এই কথাটা তুমি এত বেশী করে ভাবছ কেন ?

—ঠিক এইজন্যই। ভাবতে আমি চাই না। ভাবনাতে আমি পঙ্গু হয়ে পড়ি বিকাশ। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো, বাবা যেদিন থাকবে না, তার মৃত্যুর ছায়া যেদিন আমাদের ভাই বোনের উপর থেকে সরে যাবে সেদিন সেই

একলা, সেই অনাবৃত মুক্তি কেমন। অনুভা জানে সেই নিষ্প্রাণ একাকীত্বের মধ্যে সে দাঁড়াতে পারবে না ; সে কোনো অকাট্য উপায়ে তা' জানে আব তাই পালাতে চায়। তাবপর আমি ; নিজেকে সেদিন যে কোনো ভাবে ব্যবহাব করতে পারি। কিন্তু বলতে পারো আমার এই স্বেচ্ছাচারেব মধ্যে স্বাধীনতার যুক্তি কোথায় ? তার চেয়ে অনুভা ভাল, সে পালাতে চায়।

অনুপম আবার চিন্তাবিষ্ট হল। আর বিকাশ এক সময় তার কথা শুনতে শুনতে অনুপমের কথা ভুলে গেল। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল যে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ; শার্সিতে এসে বাজছে তার এক একটা ঝাপটা—সে বৃষ্টির বাজনা শুনতে থাকে।

—আচ্ছা, এদেব সঙ্ঘ সম্বন্ধে কি ভাব তুমি ?

—কিছু ভাববার মত অবস্থায় এসে এখনো পৌছয়নি।

—আচ্ছা, তুমি কি মনে কবো—অনুপম যেন মনে মনে কথাগুলিকে সাজাচ্ছিল। বিকাশের কথার সঙ্গে সঙ্গে বললে,—তুমি কি মনে কবো বিকাশ, দশ জনের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই নিজের বোধশক্তিব তীব্রতা সামাজিক হয়ে উঠবে ?

বিকাশ তার দিকে অর্থহীন তাকিয়ে রইল। সে অনুপমকে বুঝতে পাবছিল না।

—ধব, আমার ইচ্ছা, আব ইচ্ছার সংঘাতেব মধ্যে কোনো অভিযোগ থাকবে না। সকলের সঙ্গে যুক্ত হলুম বলে মুক্ত হলুম।

—কি করতে তুমি চাও ? বিকাশ তৎপব হয়ে প্রশ্ন কবল। অনুপমেব কণ্ঠস্বরে সে স্বস্তি বোধ কবে।

—সঙ্ঘেব কাজের সঙ্গে সহযোগীতা করতে চাই।

—পম !

—আমরা যা চাই তা' একটা সমন্বয়। এতে মতভেদ নাই। রাষ্ট্র কি আধ্যাত্ম যে কোনো অবস্থাতেই একটা উপলভ্যমান বাস্তবতা আমাদের পেতেই হবে। সেই আমাদের আত্মসীমার নিরীথ।

—পম, তুমি চাকরী ছেড়ে দেবে সঙ্ঘের কাজ করতে ?

—কারণ আমি এই বিভেদ-বিন্দু আবিষ্কার করতে চাই। আমি জানতে

চাই স্বাধীনতার মধ্যে যে মুক্তি তাব চেহাবাটা কি? আমি যা উপার্জন কবি তাব চেয়ে যথেষ্ট কম হলে আমার চলে যাবে।

—তুমি তোমার সামর্থের চেয়ে কম রোজগাব কববে এবং তা'. কেবল আধ্যাত্ম জগতের বিভেদ-বিন্দু আবিষ্কার করতে।

—বিকাশ, তুমি লেখ কেন? অনুপমের চোখ চক্ চক্ করছিল কণ্ঠে তার আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। চোখ দেখে বোঝা যায় না সে হাসছিল কি-না। অনুপমেব চোখ ছোট। জোড়া ভুরু দিয়ে মোড়া।

—পয়সা আসবে বলে।

—আর যার পয়সা আছে সে বই কেনে কেন?

—অনেক কারণে হতে পারে: আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার, বন্ধুর বৌকে উপহার দেবার এমন কি পড়বার জন্যও কিনতে পারে?

—সুতবাং তুমি লিখতে পারো বলেই পয়সা পাও: আব তারিণীচরণেব পয়সা আছে বলেই সে কিনতে পায়। একটা বিশেষ জিনিষেবই দুটো চেহাবা।

—পম তোমার শরীর খারাপ।

—চুপ করো; মাথাটা আমার আশ্চর্য বকমেব সাফ্ আজকে। কথা বলতে দাও। কিন্তু এই যে দুটো চেহারা এটা সাধারণ: সামাজিক। একটি রাষ্ট্রিক সংযোগ। কিন্তু এইবায় বলো, তুমি যখন লেখ তখন তোমার মধ্যে তুমি ছাড়া আর কি আছে।

অনুপম সামনে ঝুঁকে পড়ে। সোজা তাকায় বিকাশের চোখের দিকে। বিকাশ বিহ্বল হয়ে যায়। তার ভালো লাগছিল না। অনুপমের নিঃসংশয় প্রত্যয়শীল কণ্ঠ তার মস্তিষ্কে ভারী হয়ে উঠে।

—তুমি লিখছো, তার বিহ্বল, পীড়িত চোখের দিকে চেয়ে স্থিব গলায় বলছিল,—তুমি লিখছ। নিঃসঙ্গ মন আর নিরন্তর সময়। কি আছে তোমার মধ্যে তখন।

—আমার কামনা। আমার কামনা করবার শক্তি। অনুপমের সতর্ক, চাপাউচ্চারণ ও শব্দের সাযুজ্যে সে হঠাৎ উত্তর পেয়ে গেল।

—তাই। তোমার কামনা করবার এক দুর্বিলাষ অনুভূতি। অনুপম সিধে হয়ে বসল।—কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখো তোমার কামনার মধ্যে তুমি তখন নিশ্চিহ্ন। তুমি মরে গিয়েছ কামনার উত্তাপে, আর তুমি সৃষ্টি হচ্ছ। সেই সৃষ্টি তোমার নয়, আমার নয় : বিশ্বজনের : নৈবর্তিক। এরই নাম বৈদগ্ধ।

—কিন্তু তুমি—

—হ্যাঁ, কারণ জীবনে যখন ব্যক্তিত্ব প্রবল হয়ে উঠে তখন সমন্বয় থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। নিজেকে হারিয়ে দিতে হবে। আর আমার মনে হয়' তা ঐ কামনার মত ব্যাপ্ত চেতনায়। চেতনায় আমরা জলবো।

—এই সত্য চেতনা। বিকাশ যন্ত্রণার মতো বলে উঠলো। হঠাৎ অনুপম নিষ্ঠাবান হয়ে তাকাল বিকাশের দিকে। তার ঠোঁটে ব্যঙ্গের সেই কোঁচটি তার চোখে পড়ে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে নিঃশব্দে চোখ ফেরালে অনুপম। তার গলার আওয়াজ হঠাৎ অনুপমের কাছে ধরা পড়ে যায়। বিদ্রূপ করছিল এতক্ষণ। ব্যঙ্গ! বিস্ময়ের হুল রয়েছে বিকাশের গলায়, তার চোখে। জ্বালার মত অনুপমকে বিঁধলো। ক্ষিপ্র সে টেবিলের উপর থেকে বইটা তুলে এলোমেলো পাতা উল্টায়।

গানথারের Inside Europe : বিক্ষুব্ধ য়ুরোপ : ভঙ্গুর য়ুরোপ : ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বীজ। সে নিজেকে ঘোষণা করছিল, শব্দ দিয়ে : সশব্দে। বিকাশের বিস্মিত বিদ্রূপ! সে নিঃশব্দে বইয়ে মনোনিবেশ করে।

হঠাৎ বিকাশ থমকে গেল। সে কি বিদ্রূপ করছিল। তার ভেতর লজ্জা আসে। অনুপমকে সে জানে। আর যা সে জানে না তাকে সে ব্যঙ্গ করতে পারে কোন সাহসে। ধীর, নিষ্ঠাবান, কর্মিষ্ঠ অনুপম। বর্ষার সঙ্গে অনুপমের বক্তব্যের কোথায় যেন একটি সাম্য আবিষ্কার করে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। অনুপম খুলছিল। একটু একটু করে নিজেকে নিরাবৃত করছিল। কিন্তু কি সে বলছিল? কিছুতেই বিকাশ মনে করতে পারলে না। কেবল সেই নাটকীয় নিঃশব্দতার উপর জ্বলতে থাকে বিকাশের দুরন্ত লজ্জা। বৃষ্টি পড়ছে—বিকাশ জোর করে অনুভব করতে চাইলে এক সময় : বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু তার অনুভবকে আড়াল করে অনুপম বসে আছে ঐখানে।

নিজেকে ছাড়িয়ে কেউ কোনো দিন বোঝে না। বিকাশ বুঝবে—এই কি সে আশা করেছিল। অনুপম পাতা উলটায়। বিকাশ। পরিচ্ছন্ন ছেলে। ভদ্রযুবক। মার্জিত, রুচিসম্পন্ন, কাব্যামোদী।

—Life in me! Life with me. অনুপম কি এই কথা বলতে চাইছিল। সে'ত জানে অনুপম কি? প্রবল স্রোতে বিকাশ তরঙ্গিত হয়। ওর সংবদ্ধ মন কি দৃঢ়।

'Life, Life! The word is magical They sing.
And in my darkened soul the great sun shines.'

সিগারেটের কৌটাটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলে বিকাশ।

অনুপম একটা নিলে। দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা এগিয়ে আনলে বিকাশ। নত হয়ে অনুপম আগুন ধরায়; আড়চোখে তার মুখটা দেখে নেয় বিকাশ: স্থির সংবদ্ধ; ওর পাৎলা মুখখানি যেন চিরকাল তার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

—পম। বিকাশের গলায় ভয় কেঁপে ওঠে। অনুপম তার দিকে তাকাল।

—Yes.

—Are you hurt! I am sorry

—Don't worry. অনুপম নিশ্চিন্তে বললে,—আমরা সব সময় পরস্পরকে ছাড়িয়ে চিন্তা করি।

বিকাশ তার একখানি হাত ছুঁল। সরু আঙুলের ডগাগুলি। কোনো অব্যক্ত আগুনের তাপে সে পুড়ছে,—পম। জীবনকে মেনে নাও।

তারা দুজনে বাইরে তাকাল। বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কোনো কথা না কয়ে দুজনে সেই আওয়াজ শুনতে থাকে।

* *

কলকাতা সহরে এই বর্ষা তিনদিন থামল না। জল আর অবিশ্রান্ত জল পড়ার আওয়াজ। সমস্ত দিন আর দীর্ঘ রাত ধরে এই বৃষ্টি। সুরভি শুয়ে শুয়ে তার স্বামীর পিঠে ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল।

—এই বাদলা কি থামবে না। হাড় শুদ্ধ স্যাঁতসেঁতে করে দিলে।

—সত্যি। সুরভির স্বামী বিস্তৃত হয়ে পাশ ফিরলেন,—সত্যি। এমন দিনে চায়ের সঙ্গে পাঁপড় ভাজা আর ফুলকপির সিঙ্গাড়া খুব জমাটি।

—দাঁড়াও বলে আসি। সুরভি বোম্বাই খাট থেকে নামল। সুরভির স্বামী পাটের ব্যবসা করে। গত যুদ্ধে রঙের কারবারে ফেঁপে গিয়েছিল। শেয়ার মার্কেটে যথেষ্ট টাকা ছড়ান আছে। বাড়ীর দরজায় লটকান চক্‌চকে পিতলের ফলক: তাতে নাম খোদাই। দেউড়িতে দরোয়ান। গাড়ীবারান্দাওলা বাড়ী। সুরভি আবার এসে পাশে বসল। তার হাতটি চেপে ধরে চিন্ময় সরকার—সুরভির স্বামীর নাম, সজল চোখে তার দিকে তাকায়। চিন্ময় সরকার স্বাস্থ্যবান। মেয়েদেরকে খুসী করবার মত তার শরীরের আয়তন। চওড়া কাঁধ, মাংসল মুখ। সুরভিকে আকর্ষণ করল একটু।

—আশ্চর্য সুন্দর তুমি। সুরভি ভুরু বেঁকিয়ে হাসে। —গায়ে আঙুল দিলে দাগ বসে। ইচ্ছা করে অয়েল পেন্টিংয়ের ছবির মত তোমাকে টাঙিয়ে রাখি, কেবল দেখি। সুরভি আবার উপরোক্ত রূপ হাসে। ঠোঁটের নরম তিলটি নড়ে।

—ব্রুচটা আনবে বলেছিলে যে। বুকের উপর শরীর রেখে লম্বা ঘাড়টিকে একটু তুলে সুরভি বলে। চোখের ভুরু দুটি আরো একটু বেঁকে যায়। চোখের তারা দুটো যায় দুপাশে সরে।

সেটা কালকে আনা হবে। আজ দোকান বন্ধ ছিল। চিন্ময় সরকার একটু মৃদু আদর করলেন।

—কে জানত তোমাকে পাব।

—কেন ?

—তুমি এত সুন্দর তোমাকে আশা করা যায় না।

—আহা।

চিন্ময়বাবু চুম্বন করলেন। সুরভি আঁচল দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নেয়। হঠাৎ কি মনে করে হেসে ওঠে। স্ফীত নাকের তলায় ঐ গোঁফটা যদি না থাকত: কি রকম দেখাত—সুরভির কৌতূহল হয়। আর হঠাৎ মনে হয় বিকাশের মুখটা

কি অসহায় রুচি ; আর তার চিকন মুখের উপরে যদি এমনি একটি জমকালো গোঁফ গজিয়ে উঠত। তলায় পুরু মাংসে মোটা দুটো ঠোঁট। সুরভি হেসে ওঠে হাসির ধাক্কায় অপ্রস্তুতে পড়ে যায় চিন্ময় সরকার।

—বিকাশ ছেলেটাকে কি বোকা বোকা দেখায় দেখছ ?

—হ্যাঁ। চিন্ময় সরকার আশ্বস্ত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন। ছোকরা বেশ লেখে নাকি : আমাদের ক্যাশিয়ার ওর মহাভক্ত। চিন্ময়বাবু আবার একটি চুম্বন করেন।

—শোনো, ঠোঁট মুছে সুরভি বলে। বুক থেকে মাথাটা তুলে নেয়। গলা থেকে চিন্ময় সরকারের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে,—শোনো, ইয়ারকি নয়। খোকার অন্নপ্রাশন'ত আশ্বিনে। আর'ত মোটে একমাস।

—কি রকম করতে চাও।

—একটা পার্টি দাও। মিত্তিররা সেবার দেমাক দেখিয়েছিল মনে আছে।

—এইখানে করবে না বজবজের বাড়ীতে।

—সরকার গিন্নি নূতন বাড়ী দেখালে।

—সত্যি, মা হবার পর রূপ যেন তোমার খুলছে। এত লাবণ্য রেখে বেড়াও কি করে!

সুরভি মিটি মিটি হাসছিল। চিন্ময় সরকার তাকে আরো ঘন করে নেয়। সুরভি অস্ফুট স্বরে কি বলল।

—My love : আদরে চিন্ময় সরকার ফুঁপে উঠলেন,—Darling : dear me : You are awfully sweet.

নির্বেগ শরীরে আদরগুলিকে গ্রহণ করতে করতে সুরভি বলে,—শীত করছে। বর্ষার হাওয়া।

চিন্ময় সরকার জানালাটা ভেজিয়ে দেয়।

* * *

ফিটনের অন্ধকারে রূপাকে একটু আকর্ষণ করল উৎপল। উৎপল সিনেমার গান লেখে।

—তোমায় character টা এতো suit করবে।

—সত্যি ! তুমিই'ত ডায়লগ দেবে। বেশ চোখা চোখা ডায়লগ দিও বুঝলে। বার্ণাড-শই।

—চমৎকার বৃষ্টি, না। উৎপলের গলা সাধারণতঃই মিষ্টি, আরো একটু মিষ্টি করে বলবার চেষ্টা করল।

—silly, চমৎকার ! শরীরে ঘাস জন্মে যাবে। বাদলের মত কুৎসিত কিছু আছে। মন মেজাজে মরচে ধরে যায়।

—আচ্ছা রুণা, তুমি স্বপন দেখো না। উৎপল কথাকে দীর্ঘ করবার জন্য বলল।

—মানে। অরুণা ফেটে পড়ল,—তুমি আমাকে রোগী মনে করো ? আমি যখন ঘুমোই তখন জেগে থাকি না।

—কিন্তু তুমি যখন ঘুমাও তখন অনেকে জেগে থাকে।

রুণা সশব্দে তার কাঁধের উপর একটা চড় বসিয়ে দেয়। তার কাঁধের উপর মাথাটা রেখে গুড়িয়ে যাওয়া কাঁচের মত আওয়াজ করে হেসে উঠল। চুলগুলি মুঠো মুঠো করে চেপে মুখ রাখল উৎপল। পাৎলা একটা গন্ধ। ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল,—নাই বা গেলে আজ রিহার্স্যালে।

—ক্ষেপলে নাকি ! অরুণা অবাক হয়ে বললে,—কোথায় যেতে চাও এখন।

—এমনি ঘুরে বেড়াই। নির্জিব গলায় উৎপল বলে,—তুমি আর আমি আর অন্ধকারে দু-জনের হাত।

—আর মাঝে মাঝে কবিতার টুকরো, মাঝে মাঝে চুম্বনের পশলা। তোমার মধ্যে পেচক বৃত্তি আছে, বুঝলে।

হঠাৎ অরুণা কাঁধ থেকে মাথাটা তুলে নেয়। ক্ষিপ্র দুহাতে উৎপলের মুখটি নেয় কুড়িয়ে। দু'তালুর ঘনতায়, আরামে, দুটি চোখ বুজিয়ে সূর্যমুখীর মত বাড়িয়ে দেয় উৎপল। অরুণা নিষ্পলক চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ—সেই ভীরু, স্পন্দমান অসহায় মুখটির দিকে। বাইরের এক ঝলক বর্ষার হাওয়ায় চুলগুলো উড়ে পড়ে উৎপলের মুখে ; আর একটি উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়ে অরুণা।

—I wish, you were a girl. I would do write poetry on you. উৎপলের ঠোঁটে একটি শব্দময় চুম্বন বেজে উঠে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—অনুভূতির শূন্যে আমরা সকলে আলাদা আলাদা জগৎ। বিকাশ চুপ করে শুনছিল। চওড়া টেবিলটার উপর রাশিকৃত কাগজপত্র। টেবিলের ওধারে তারিণীচরণ সিগারেটের টিন বার করলেন। একটা ধরালেন। নাতিপ্রশস্ত ঘর। আলমারীতে মোটা মোটা বৃহদাকার বই (যা পড়বার জন্য নয় সাজিয়ে রাখবার জন্য)

—তার প্রমাণ, সিগারেটের ধোঁয়া উদ্গীরণ করে বললেন,—তার প্রমাণ, পৃথিবীতে আমরা মনের মানুষের দেখা পাইনা।

বিকাশ নড়ে চড়ে বসল। চোখে মুখে সংযমের দৃঢ়তা কঠিন ও সংবদ্ধ।

—কারণ, অনুভূতির বন্ধুতায় আত্মার অবিভাজ্যতা বোধ। তারিণীচরণ প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। সাহিত্য সংসদের সভাপতি। তারিণীচরণ মাসিক বৈঠকে অভিভাষণ পড়ছিলেন। ক্লাসিক্ সাহিত্যে তার পাণ্ডিত্য ছাত্র-মহলে বিস্ময়ের বস্তু।

—অথচ, এমন একটা আকাশ আছে যেখানে, পজেটিভ নেগেটিভ বিদ্যুত হয়ে ছুটোছুটি করার ফলে আকর্ষণে মিলন, বিচ্ছেদ নয় সে আকাশ—তারিণীচরণ তার অস্বচ্ছ গলায় একটি বাগ্মী মোচড় মারলেন,—সে আকাশ কবিতার আকাশ। কারণ, দেখো,—তার উত্তোলিত হাতটি আওয়াজ করে টেবিলের উপর পড়ল। বাড়ীটি তার নিজের। অধ্যবসায়ী সাহিত্য রসিকদের নিয়ে সাহিত্য আলোচনা করেন, সভাপতি হন ও অভিভাষণ পড়েন। চা ও সিগারেট বিলি করতে বাহ্যতঃ কার্পণ্য করেন না। অনুপম রুমাল বার করে মুখ মুছলে।

—ভয়ানক গরম। বিকাশ তার দিকে চেয়ে চাপা হাসে। সেও রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

—মনের হাজার বৈষম্য নিয়ে, তারিণীচরণ বলছিলেন—মনের হাজার বৈষম্য নিয়েও যখন আমরা একটি কবিতা পড়ি তখন, সেই একটি বিশেষ অনুবোধ

একটি বিশেষ আনন্দ কি বেদনাময়তা মনের লোকে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে। এর কারণ কি?

এই হেতুতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই তার বক্তব্যের বিশেষত্ব। তার সমালোচনার অন্যতম উপকরণ। অনুপম আবার একটি শারীরিক অসহিষ্ণু ভঙ্গী করলে।

—এর কারণ দু প্রকার হতে পারে। হয় আমাদের সকলের ভিতর আছে এক কবি চিত্ত গোপন কিংবা কবির মধ্যে আছে সকলের একাত্মবোধ। অথবা, মনস্তত্ত্বে যারা একটু অধিক উৎসাহী তারা বলবেন গভীরতম অনুভূতিতে আমরা সকলেই এক।

বিকাশ শুনছিল না ভাবছিল। অনুপমের হতাশ অঙ্গ সঞ্চালন মনে করে তার হাসি পায়। সেই তাকে নিয়ে এসেছে। লেখক বলে বিকাশের উপর তার একটু পক্ষপাতিত্ব আছে। কবি ও দার্শনিক তারিণীচরণের উপর রচনা লিখে মাঝে মাঝে বিকাশ টাকা পায়। কোনো উপায়ে তার দ্বিতীয় কবিতার বইটি তারিণীচরণের মারফৎ প্রকাশ করতে হবে। কবিতা কেউ টাকা দিয়ে নিতে চায় না। তারিণীচরণ ছাড়া তার উপায় নাই। ইতিমধ্যেই তারিণীচরণের কবিতার উপর একটি নাতিবৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেছে।

—কিন্তু, বিকাশের মন মোড় ফিরল,—কিন্তু মনের ছাঁচটা দেখলেই জানা যাবে একথা সত্য নয়। তারিণীচরণ বলছিলেন,—কারণ কবিতা যদি গভীর অনুভূতির ব্যাপার হয় আর সকলের ভেতর তা যদি থাকে তা'হলে মনের সেই অতলতায় আমরা নিঃসন্দেহে সাম্যবাদী।

অনুপম চনমন করে তাকাল। শ্রোতাদের চোখে সার্থক উজ্জ্বলতা। মুখে নিবিষ্ট একটি শ্রদ্ধাকুল সজলতা। বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্র ছাত্রী। অনুপম নাক ঝাড়লে।

—কিন্তু প্রায়েরই মনের কূপটা অপরিষ্কার। যত বেশী খনন কার্য চলে তত বেশী সে সুস্বাদু জল দেয়। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় গভীরতা বর্দ্ধনশীল। এত জানা কথা—

অনুপম নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছিল তার অবয়বিক কলা-কৌশল ও আবেগের উৎক্ষেপগুলি। বিকাশের চোখেও একটি উজ্জ্বল কৌতুক টলমল করে।

—এত জানা কথা, অতি সরল জিনিষকে বুঝিয়ে দেবার পৌনঃপুনিক বিবক্তিতে টেবিলে একটি চড দিলেন। গলার আওয়াজটা চড়া হওয়াতে চিড খায়।

—এ'ত জানা কথা, যে কত প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় শিক্ষার অভাবে, সুযোগের কৃপণতায়। আর এ'ত আমরা সক'লই জানি যে খনন-দক্ষতা বৃহত্তম সংখ্যার ভিতর অপটু ও অপরিণত। বুঝছ আমার কথাগুলি?

বিকাশের দিকে চেয়ে শেষের বাক্যটি উক্তি করলেন।

—বাস্তবিক। সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে বলল বিকাশ,—আপনি যে এত চিন্তা করতে পারেন যা আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না।

—এই'ত আমাদের কাজ হে, মুখের নধর চামড়ায় অনাবৃত খুসীটি বিস্ফারিত হয়ে উঠে।

—আপন মনের উচ্ছ্বাসে কত কি বলে গেলে তোমরা: আর আমরা ছুটলাম তার পিছু পিছু। কোথায় সত্য, কোথায় ভাব; পরদার পর পরদা উঠিয়ে তাকে এনে দিলুম গর্ভের অন্ধকার থেকে সূর্যের নগ্নতায়।

—বাস্তবিক! আপনার সমালোচনার এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

—বুঝবে কে? বুঝবে কে? সখেদ নিঃশ্বাসে হাত দুটি উপর দিকে ছুঁড়ে দিলেন,—যদি এই বাংলা দেশ এর পরেও পঁচিশ বৎসর বেঁচে থাকে তখন বুঝবে কি বলেছিলাম।

—বাস্তবিক। অনুপ্রাস ঠিক রেখে বিকাশ বললে।

তারিণীচরণ সমালোচক। তিনি ইন্টারমিডিয়েট ইংরাজির নোট লেখেন। X, Y, Z. of Literature ও Angle and View of Criticism নামে দুখানি ইংরাজিতে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তার একখানির ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের আর্শীবাণী সম্বলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও তার পুস্তক পড়ানো হয় না তবু দেশে তার সমালোচনার আদর আছে। এ ছাড়া তিনি ছুটকো দেশাত্মবোধের গল্প বা আলগা প্রবন্ধ ইতস্ততঃ লিখে থাকেন। তার অধীনে দু খানি মাসিক (সচিত্র) পত্রিকা পরিচালিত হয়।

—আমার লেখা বুঝবে কে? কনডেন্‌শড অথচ এ্যানালেটিক্যাল।

তার লেখা কনডেন্‌শড অথচ এ্যনালেটিক্যাল। তিনি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে নতুন ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন।

—আশ্চর্য দেশ এই বাংলা। কান্তে আর হাতুড়ির সঙ্গে শুক্‌নো চাঁদ ও পাত্‌লা বাতাস যোগ করে দিয়ে রাম শ্যাম কবি হয়ে গেল অথচ তিন বছরে এক সংস্করণ কাটল না আমার Angle and View of Criticism. বুঝবে কে। জোলো কবিতা আর মিনমিনে ষ্টাইলে মজে আছে দেশটা। ওরম কন্‌ডেন্‌শড অথচ এ্যনালেটিক্যাল।

—প্রতিভার বিচার করে যুগোত্তর কাল। ভবিষ্যৎ আপনার মর্যাদা দেবে। বিকাশ তৎপর হয়ে বলল।

—হ্যাঁ, কি বলছিলাম? তারিণীচরণ তৎপর হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—অপটু ও অপরিণত। স্মরণশক্তি বিকাশকে বাঁচিয়ে দিলে।

—হ্যাঁ অপটু ও অপরিণত। গলাটাকে পরিষ্কার করে আবার বলতে সুরু করলেন তারিণীচরণ।—অথচ দেখো কবি লোকটাও আসলে মানুষ: সামাজিক কাপড়ে চোপড়ে একটি সাধারণ জীব। আর কবিতা আমাদেরই মনের কোনো অসাধারণ প্রবৃত্তি বা ঘটনাকে দামী ও নিখুঁত পোষাক পরানো। পোষাক হল তার ভাষা, দাম হল তার টেকনিক। সুতরাং কবির মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে বিশ্ব চৈতন্যের সংবেদবান অবস্থিতি খুবই সাধারণ এবং অনস্বীকার্য। অতএব কবির মধ্যে সকলে আছে বললে নতুন বলা বলে মুখ বেঁকানো অন্যায়।

তারিণীচরণ থামলেন। তার মুখের চামড়ায় হাসির বিস্ফারণ দেখে বিকাশ সঙ্কেত পেল।

—বাস্তবিক। বিকাশ নাটকীয় গভীরতার সঙ্গে উচ্চারণ করলে।

চা খেতে খেতে এক সময় বললেন তারিণীচরণ। তোমার নতুন বইটা পড়লাম। তোমার লেখায় সৎবুদ্ধি ও প্রকাশের নিরাবেগ দক্ষতা আছে। কিন্তু কি জানলে, অভিসন্ধিপূর্ণ কিছু বলবার জন্য মুখটিকে কুটিল করে বাড়িয়ে আনলেন। —জোলো চাঁদের আলোয় আর প্যানপেনে ষ্টাইলে স্থায়ী কিছু সৃষ্টি হয়না। আমার লেখা দ্যাখো'তো, কত ঘন কত সতর্কিত। বীরবলী ঢঙই তোমাদের

সর্বনাশ করবে। matter দাও। matter দাও। বাংলা সাহিত্যে এখনো matter এল না। একটা কথা নিশ্চিত জেনো বিকাশ, উপদেশে তাব গলা আন্তরিক হয়ে ওঠে। মধ্যম থেকে রেখাবে গলা নেমে আসে,—শুধু শব্দে সৃষ্টি হয় না। ধ্বনির পিছনে বাণী আনো। নিজে জানো, আরো প্রাণবান কবে তোলো তোমার জানাকে! তোমার লেখার ক্ষমতা আছে, নূতনত্ব আছে কিন্তু ঐ matter

—আপনি নূতনত্ব ভালবাসেন। হঠাৎ আড়াল থেকে অনুপম কথা কয়ে উঠল।

—নূতনত্ব নয় নবীনতা বল। অনুপম মুখ ফিরালে।

—আজকের সাহিত্য ভরে এই যে কদাচার এর নাম নূতনত্ব নয় ব্যভিচাব বল। রুগ্নপেটে কতগুলি বিজাতীয় ও বিধাতীয় জিনিষ খেয়ে ফেলবার দুর্গন্ধময় উদ্গাব।

—কিন্তু খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরাব চেয়ে, অনুপম হঠাৎ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তর্ক করবার জন্য সে যেন মরীয়া হয়ে পড়ে।

—কিন্তু খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরাব চেয়ে, অস্থিব ধীরতাব সঙ্গে বললে,—ভালো জিনিষের বদ-হজমও কি ইভোল্যুশনের পক্ষে উপকারী নয়।

—এখনো তোমরা ছেলেমানুষ। আমবা পড়েছি ঢের, শুনেছি বিস্তব, দেখেছি অজস্র।

তারিণীচরণ পয়সা দিয়ে বই কেনেন। বইয়ের গায়ে ধূলোর ছাঁট কি আলোব আঁচ তিনি লাগতে দেন না। নিজের নাম ও কেনবার তারিখ ছাড়া সমস্ত বই গুলি রেখাশূন্য।

—আরো বড় হলে, প্রজ্ঞা এলে দেখবে ইভোল্যুশনেব পক্ষে ওটা দামী নয় দমনীয়। একটা যুগ অনেক কালের পথ পিছিয়ে থাকে তাব নির্বাচনেব অন্ধতায়।

—কিন্তু তাব প্রাণশক্তি। অনুপম উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—সে'ত একটা পশুবও আছে।

—সে'ত জৈবিক। সেখানে প্রাণশক্তি নৈমিত্তিক। একটা বিশেষ প্রয়োজনে তার চলে আসা। বিদ্রোহ বলে কিছু নাই, নির্বাচন নাই। Life-force মানে তা নয়।

—তর্ক করো না। উপর দিকে হাতটি ছুড়ে দেন তারিণীচরণ। তিনি প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। কণ্ঠে তার বিবক্তি ও উষ্মা যুগপৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

—যা বলছি শোনো। বয়স বাড়ুক, প্রজ্ঞা আসুক, এলে দেখবে তখন পাবে এই তর্কাতীত উপলব্ধিকে। এই উপলব্ধিই আসল। এই উপলব্ধিকে ঘিরে যা থাকে সূর্যকে ঘিরে গ্রহ উপগ্রহ। বয়স যখন তোমার গোঁফের রেখাকে স্পষ্ট করবার, চোখের তারাকে আরো কালো করবার, শরীরে রক্তের দ্রুত সঞ্চারণের তখন মনে হয় আমিই এক ও প্রধান। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। আপন ব্যক্তিত্বে উৎসাবিত আত্মপরায়ণতা। তারপর চরিত্র যখন স্বভাবে এসে দাঁড়ায়, শরীরের রেখায় অচপলতা দীর্ঘ ও স্থির হয়ে ওঠে তখন আমি বান এই পৃথিবী। সংসার, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনময় এই আমি। আরো বিলম্বে, জীবনের আরো সক্রিয় অতিক্রমে যখন প্রজ্ঞা আসবে তখন পাবে বিশ্বজীবনের সঙ্গে এক বলশালী সংযোগ। এক অপরিমেয় ঐক্যচেতনা; আনির্বান এক বিরাট বিকল্প।

তার মুখের চামড়ায় হাসির বিস্ফারতা দেখে বিকাশ প্রস্তুত হয়,—বাস্তবিক। আপনার কাছে বসলে মনের শক্তি বেড়ে যায়। আপনার কবিতা নিয়ে একটা নূতন article লেখবার চেষ্টা করছি। অনুপমের সঙ্গে চোখ পড়ায় দুজনে পরিচিত হাসে। অনুপম আবার সরল হয়ে পড়ে। তার চোখে কৌতুক ঝিলিক দেয়। রুমাল দিয়ে ঘাড় মোছে।

—বাংলা ছন্দ নিয়ে, তারিণীচরণ বলছিলেন,—নতুন একটা গবেষণা করছি। বাংলা ছন্দ নিয়ে দস্তুরমত এক্সপেরিমেন্ট চালানো দরকার। নিছক দুই তিনের ছন্দ: ছড়ার ছন্দ যে কত মজা: একটা অদ্ভুত এ্যানালিসিস বার করেছি। তারিণীচরণ উৎসাহে নড়ে উঠেন,—কনডেন্‌শড অথচ এন্যালেটিক্যাল।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'প্রিয় হিমাংশুবাবু', অনুপম চিঠি লিখছিল। 'কয়েকদিনের জন্য পারিবারিক বিশেষ কারণে', 'পারিবারিক বিশেষ কারণে' কথাটা অনুপমকে হঠাৎ চিন্তিত করল। পারিবারিক বিশেষ কারণে : অর্থ কি ? স্বচ্ছন্দে লিখলেই'ত হয় কয়েক-দিনের জন্য যেতে পারব না আপনি আমার কাজটা চালিয়ে নিলে সুখী হব। আমি যে যেতে পারছি না তা নয়, পারিবারিক বিশেষ কোন কারণ যা আমাকে যেতে দিচ্ছেনা আর 'বিশেষ কারণ' যা বিবৃত হতে পারে না, কিন্তু অনতিক্রম্য। অনুপম মনে মনে হাসল। একটি সরল উক্তিকে বক্রোক্তি করবার মনোবিকলনটি আবিষ্কার করে আগের লাইনটা কেটে দিলে। তার কাছে কোনো আবেদন করছি না, সুতরাং যে কোনো কারণই থাক তা নিষ্প্রয়োজন আর তা যখন প্রকাশ করতে পারি না : ইচ্ছা নাই।

—'প্রিয় হিমাংশু বাবু', অনুপম আঁচড় কাটলে,—'কয়েক দিনের জন্য আমি আসতে পারব না। আমার কাজটা চালিয়ে নিলে সুখী হব'। 'আসতে পারব না'—অনুপম হোঁচট খেলে। আসতে পারব না ; চাইলেও না। যেন আমার ইচ্ছা আছে কিন্তু পারছি না, মাঝখানে কোনো অলঙ্ঘ্য বাধা। আগের লাইনটা কি অপরাধ করলে। বাক্যে হ্রস্ব হলেও ভঙ্গীতে সেই খাজনা দেওয়া সুর। 'আসবনা', 'পারবনা'র বাধা নয়'—আসবনা'র স্বেচ্ছাচারিতা। 'আসবনা'। অনুপম লাইনটা কাটলে। নিষ্ঠুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লিখলে,—প্রিয় হিমাংশু বাবু, কয়েক দিনের জন্য আমি আসব না। সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে সে বাক্যটিকে দেখে। নিরাবেগ, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন উচ্চারণ। 'আসব না', 'আমি আসব-না', ইচ্ছা নাই আমার আসতে। অনুপমের কানে পৌনঃপুনিক বাজতে থাকে। নির্ভিক, নিশ্চিন্ত প্রকাশ। মেয়েদের যৌন আবেগের মত তীক্ষ্ণ। তীক্ষ্ণ ও প্রখর। প্রতিদ্বন্দীতায় শেষ হিংস্র প্রয়োগ। কিন্তু এ'ত একটা সাধারণ নোট—একজন সহকর্মীকে ; হঠাৎ অনুপমের মনে হল কথাগুলি যেন গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মত। যেন আমার আসা-যাওয়া

আমাব ইচ্ছার উপর নির্ভর কবছে। আমার আসা যাওয়া আমার খুসী। অনুপম কলমের মুখটা দাঁতে চেপে হাসল। কিন্তু এ'ত সত্যি নয়। তার মধ্যে যদি বাস্তবিকতা থাকে তা'হলে নোটের কি প্রয়োজন। আসলে আমাব দাম্ভিকতা: তাই আমার এই ব্যক্তিত্ববান হিংস্রতা; আমাব স্বয়ংশীল কতৃত্ববোধ। আসলে তাকে আমি স্বীকার করি। যেমন যাদেরকে আমরা গ্রাহ্য করি না তাদের কাছেই আমাদের সরল প্রকাশ ঘটতে পারে। যেমন স্ত্রী: আমাদেব বিবাহিত পত্নী। তাদের চিন্তা, তাদের মন'কে মনে করি না বলেই তাদের কাছে আমাদের নিশ্চিন্ত প্রকাশ ঘটে। বিনা লজ্জায় তাদের পুত্রেব জনক হই। সেইটাই সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেমেব ক্ষেত্রে নিজের অসামান্যতা প্রকাশ করবার থাকে একটি পশু উত্তেজনা। একেব মনোযোগের প্রতি অপরের মনোযোগ। অপরেব বিশেষ দৃষ্টির প্রতি অন্যের বিশেষ দৃষ্টি। এর কারণ পরস্পবকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই।

অনুপম এত কথা ভেবে বীতিমত অবাক হয়ে গেল। 'প্রিয়, হিমাংশু বাবু', অনুপম ভাবলে কি লেখা যায়, বাবাব বুকেব অসুখের জন্যে কিছুদিন বাইবে যাওয়ার দরকার। কিন্তু এত কথাই'বা কেন? মেয়েলী আত্মপবিচয়। অনুপম ক্রমশঃ ব্যস্ত হয়ে উঠে। কোনো প্রচলিত প্রথাও সে মাথায় আনতে পাবে না ভদ্রতা, তা'হলে সাধাবণ জিনিব নয। অনুপম ভাবলে, সামান্য চিঠি লিখতে যার এই অসামান্য কৌশল। নিজেব সম্মান ও সংস্পৃহতা বজায় রেখে—অনুপম হতাশ হয়ে ভাবলে,—স্বাভাবিক হওয়া কি এতই অস্বাভাবিক।

My dear Himansu babu, অনুপম কাগজে আঁচড় টানলে। অত্যন্ত স্কুল বয়সী: ইংরাজী লিখতে শেখার অতি ব্যস্ততা। Dear Himansu babu, সচেষ্ট, আত্মীয়তা-লোভী ইচ্ছা, অতি-পরিচয়ের প্রাচীনত্ব হতে উদ্ভূত এই সম্বোধনগুলো। 'Himansu babu' সমস্ত কিছু ছেঁটে ফেলে দিলে অনুপম। Dear দিয়ে আহ্লাদ জানাবার চেষ্টা ও'বঙ্গজ ছেলেদের মেস-সুলভ। অনুপম ভাবলে,—এই-যে,—দরজাব অনুভার কাপড়ের পাড় দেখা যায়। অনেকখানি চওড়া লালের তলায় গ্রাম্য পথের মতো আবো সরু দুটি রেখা। সমস্ত শরীরটা অনুপমের চিন্তার মধ্যে প্রবেশ

করে। মুখ তুলে চাইলে অনুপম। অনুভা দাঁড়াল টেবিলের ধার ঘেঁসে। অনুপম সচেতন হয়ে উঠে—কোনো কিছু শোনবার জন্য। কারণ, কোনো কিছু শোনবার এটা হল গৃহস্থালী ভূমিকা। অনুভা এটা-সেটা নাড়তে থাকে; অনুপমের নিস্তব্ধ অপেক্ষা আরো প্রখর হয়ে ওঠে: কিছু সংসারিক অসুবিধা! কিছু অনুপায় করনীয়, অনিবার্য, উপায়হীন,—অপেক্ষা করতে থাকে অনুপম। মেয়েটি সুরু করবে এইবার: অবিচলিত গাম্ভীর্যে, নিস্পৃহ আবশ্যকীয়তায়—আর মাঝে মাঝে ভীরু, পড়া দিতে না পারা স্কুলের মেয়ের মত কাতর চাউনি মুখে-চোখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। অনুভা এটা ওটা নাড়া চাড়া করে, অনুপম স্থির সঙ্কুল অপেক্ষা করে।

—দাদা। লঘু সন্তর্পিত গলায় এক সময় উচ্চারণ করে অনুভা। কণ্ঠে তার দ্বিধার গুঁড়া। অনুপম উত্তর দিলে না। ঠিক বলে যাবে এইবার খেই খুঁজে পাওয়া পরীক্ষার পড়ার মত অনর্গল অকুণ্ঠতায়।

—দাদা। গলাটা ঝাঁকুনি দেয়। দ্বিধার জড়তা তার গলায় গুঁড়িয়ে যায়।

—দাদা। নরম গলায় ডাক্‌লে অনুভা,—একটা কথা ছিল। প্রত্যেকটি কথা তার অপেক্ষামান মনে জলের ফোঁটার মত বিন্দু বিন্দু করে পড়তে থাকে। 'একটা কথা ছিল'—ভূমিকা! সেজে গুজে নাও। একটি সতর্কবাণী· ঠিক করে নাও তোমাকে। কথাকে গুরুত্ব দেবার এ' একটা কায়দা। অনুপম হেসে চোখ তুললো। অনুভা লক্ষ্য করছিল এতক্ষণ। সশঙ্ক ও সংশয়ে অনুধাবন করছিল অনুপমের মুখের রেখা, চোখের উজ্জ্বলতায় ধাঁধার খেলা। আর মনে মনে ভয় পাচ্ছিল। ভয় পাওয়া তার স্বভাব। ভয় পেলে তার চাউনি আরো নির্ভরশীল হয়ে উঠে। প্রত্যেকটি নড়া চড়া সে লক্ষ্য করে, প্রত্যেকটি অঙ্গ-ভঙ্গী, আর তার ভেতর ভয় জমা হয়: প্রবল ভয়ে সে নিস্পন্দিত হয়ে উঠে। চোখে চোখ ঠেকায় ব্যবহারিক সচেতনতায় চোখ নামিয়ে নিলে অনুপম। ঐ মেয়েটির মৌন ও ত্রস্ত চোখ দুটিকে সে সহ্য করতে পারে না। সে অপেক্ষা করতে থাকে কোনো কিছু শোনবার। তীক্ষ্ণ ও সঙ্কুল। খানিকক্ষণ বাদে অনুভা বললে,
—সেই এ্যাপলিকেশনটার উত্তর এসেছে দাদা।

—কোন এ্যাপলিকেশন? নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল অনুপম।

—দিনাজপুর গালর্স স্কুলের। নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে অনুভা।

—কি লিখেছে?

—ওরা নেবে। জয়েন করতে হবে দশ তারিখের মধ্যে।

—দশ তারিখের মধ্যে। অনুপম অজ্ঞাতসারে উচ্চারণ করলো।

যেন কোনো চিন্তামগ্নতার মধ্য দিয়ে সে বলছে। অনুপম কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। অনুভা নিঃশব্দে চেয়ে থাকে আর তার বিস্তারিত নয়নে ভয় জমা হয়।

খানিকক্ষণ বাদে কোনো কিছু ভাবতে না পেরে বললে,—কত দেবে?

—আপাততঃ আশী।

—থাকা খাওয়া বাদ?

—তাই'ত লিখেছে।

অনুপম আবার থামল। এর পর কি বলবার থাকতে পারে তাই ভাবতে চেষ্টা করল।

—এই যে চিঠিটা। দুর্বল হাতে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয় অনুভা। অনুপম পড়ল। অফিসিয়ালি ইংরাজিতে জানান হয়েছে যে তার এ্যাসিটান্ট হেড-মিস্ট্রেস-সিপের আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। আহার ও বাসস্থান বাবদ আশী থাকা বর্তমান মাইনে—অনুপম চিঠি খানি দুবার পড়ল—থেমে থেমে, যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না।

—ওঃ। অনুপম আবার চেষ্টা করল কিছু ভাবতে, কিন্তু পারলে না কোনো কিছু ভাবনা মাথায় আনতে। আবার তার চোখ ঠেকল অনুভার ত্রস্ত, অপেক্ষামান চোখদুটির সঙ্গে।

—কি করবি ঠিক করলি?

—কি করব।

—বাবাকে বলেছিস। ঘাড় নাড়লে অনুভা।

—বাইরে যাবার দরকার ছিল বাবাকে নিয়ে। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ।

—আচ্ছা দাদা, হঠাৎ বলে উঠল অনুভা,—বাবাকে যদি আমি নিয়ে যাই।

—তুই কি যাবিই ঠিক করেছিস।

—কি করব। আবার সমস্ত শরীরে সে স্তিমিত হয়ে আসে। ভয় জমা হয় তার চোখে।

—চান্সটা নেওয়াই দরকার। বাবা নয় নার্সের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকুন। যদি সুবিধা বুঝিস পরে—কথার অসম্পূর্ণতার মধ্যেই স্পষ্ট করে তাকালে অনুপম,—দশ তারিখ'ত পরশু। তোর কি মনে হয়।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ম্লান আলোয় দুজনেই অস্পষ্ট। অনুপম দেখতে চেষ্টা করল অনুভাকে, দৃষ্টি দিয়ে ছুঁতে, ঐ অশরীরী নিঃশব্দতায় দুর্গম মেয়েটিকে। সম্পূর্ণ দেখতে পেলে না অনুপম।

অন্ধকার। গাঢ় বৈকালিক অন্ধকারে অনেকক্ষণ আগে ঘর ভেসে গেছে।

অনেকদূর, এক অপরিচিত দূরত্ব বোধ করতে লাগল সেই ঘনীভূত শীতল অন্ধকারে। আলো না জেলে অনুপম চুপ করে বসে রইলো ইজি চেয়ারে। এক নিরবয়বিক শূন্যতায় বোধ করতে পারে ঐ মেয়েটিকে, যে শব্দহীন পায়ে অনেকক্ষণ আগে ঘর ছেড়ে চলে গেছে, আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সময়ের নিঃসাবিত পরিব্যপ্ততায়। গভীর যাতনায় অনুপমের চোখ মুখ পাংশুটে হয়ে ওঠে। কোনো দুঃসহ খণ্ডতা বোধে সে দীর্ণ হয়ে যায়। স্বতন্ত্র সত্তায় অনুভাকে সে দেখতে পায়। নিরুৎসাবিত অজস্রতায় বিচ্ছিন্ন একটি অস্তিত্ব। তন্ময়, সুদূর ও গভীর প্রতীক্ষায় নিমগ্ন মেয়েটিকে। প্রত্যন্ত নিরবতায় শুভ্র, অগাধ শূন্যতায় উজ্জ্বল। অনুপম ছুঁতে পারলো না তাকে। কেবল আস্বাদে তার সমস্ত মন ভরে যায়। ঐ নিরানন্দ, মৌন মেয়েটিকে মনে করে তার চোখে একসময় ঘন জল নড়ে ওঠে।

অনুভা তার বাবার ঘরে চলে এলো। ত্রৈলোক্যবাবুর অনতিপ্রশস্ত ঘর: পুবদিকে একটি জানালা। সেটি সামনের বাড়ীর দীর্ঘ নিরেট দেওয়ালের মুখোমুখী। অপরাহ্নের অন্ধকার নিশ্ছিদ্র হয়ে এসেছে ঘরে: ঠাণ্ডা ছায়া। ত্রৈলোক্যবাবু বসেছিলেন ইজি চেয়ারে, স্তিমিত চোখ দুটি জানলার বাইরে রেখে—যেখানে ছোট একটুকরো আকাশ দেখা যায়। আকাশে তখনো তারা ওঠেনি। একটি প্রাত্যহিক বিকেলের ছাঁট, ধোঁয়ার গন্ধ আর ধুলোর বাতাস—অবিমিশ্র কলরবে কদাচারী

কোনো ক্লান্ত পশুর মত। অনুভা এসে দাঁড়াল চেয়ারের মাথার দিকে নিঃশব্দ সতর্কতায় দাঁড়িয়ে রইলো অনুভা।

[এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে অনুভা ; নির্বিকার, নিস্তাভ দাঁড়িয়ে থাকবে অনেকক্ষণ। বেলুনের মত এই বাড়ী। হাওয়া দিয়ে ফাঁপানো—শূন্য ; নিগর্ভ ; অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেকটি চলাফেরা, উচ্চারণ। প্রত্যেকটি মুহূর্ত বহন্তে দুরুচার্য : জটিল শান্তিতে গভীর : অনেক রাত্রে বাতাসের অগাধ শূন্যতায় জাহাজের দীর্ঘ, অতিক্রান্ত আওয়াজের মত। ]

এক সময় অনুভা ত্রৈলোক্যবাবুর চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়। পাৎলা চুলের মধ্যে আঙ্গুলগুলি অবান্তর ঘোরাঘুরি করে। আর তার দৃষ্টি হঠাৎ শায়িত হয় ত্রৈলোক্যবাবুর উত্তানিত নাকের ডগাটির উপর।

নিটোল, মৃদু, সবল নাকের প্রান্তটুকু নিগূঢ় একাগ্রতার সঙ্গে সে লক্ষ্য করে। আর এক সময় তার চোখে কৌতূহলের ফেণা উজ্জল হয়ে ওঠে। এক দুরধিগম্য ভয়ের সঙ্গে তার আঙ্গুলের ডগায় সঞ্চার হয় রক্তের স্পন্দন ; চোখের তারায় আন্দোলন ওঠে। এক সময় ত্রৈলোক্যবাবু টেনে নেনে ঐ আঙ্গুল কটির স্পন্দমান ডগা। আঙ্গুল কটির ডগা নিয়ে ত্রৈলোক্যবাবু পরীক্ষা করেন, টিপে টিপে দেখেন, মোচড়ান ; তারপর ঐ শীতল হাতটি রাখেন নিজের ললাটে। ছোট অপ্রশস্ত কপাল অনুভার হাসি পায়। রেখাহীন, নরম, এক টুকরো কপাল। শিশুর মত, ছোটছেলের মত। সেই হাত ত্রৈলোক্যবাবু কপালে মৃদু মৃদু বুলান। অনেকক্ষণ কথা না কয়ে কেটে যায়।

—অনু, মা !—ডাকেন এক সময়। একটু কর্কশ, ক্ষীণ, অবসন্ন আওয়াজ।

—অনু, মা ! অনু !

ছোট কাপালের উপর গালখানি স্থাপন করে অনুভা। ত্রৈলোক্যবাবু চোখের পাতা বুজান।

—ঘুমু ! বাবা। পালিত বেড়ালের মতন অনুভার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়। এক সময় তার চোখে জল ছাপিয়ে আসে।

আলো জেলে দিলে অনুভা। বুকের উপর বোজানো বইটি কুড়িয়ে নিলেন ত্রৈলোক্যবাবু—মনোযোগ দিলেন বইয়ে। 'An absolute would only be given in intuition'…নিরুত্তাপ শব্দের সমুদ্রে তিনি বয়ে চললেন। 'whilst everything else falls within the province of analysis. By intuition'—অনুভা সেলাইটা তুলে নেয়। পাশের চেয়ারটায় বসে।

'By intuition is meant a kind of intellectual sympathy by which one places oneself within an object in order to coincide with what is unique and unexpressable.'—By intuition is meant বাঃ, শোনো। সশব্দ উচ্চারণ করলেন ত্রৈলোক্যবাবু,—a kind of intellectual sympathy—তিনি পড়ে যান। বইটি আঙুলের ফাঁকে মুড়ে সরল তাকান অনুভার দিকে,—আসলে ব্যাপারটাই তাই, যদিও সব নয়। কেন না—

নীচু, আনত ব্যাগ্রতায় স্ঁচ বিঁধে চলেছে অনুভা। একটু-একটু, এগিয়ে এগিয়ে। তার হেলানো গ্রীবায় পড়েছে একটি বৈদ্যুতিক রেখা। মসৃণ-ত্বকে একটা আভা বিচ্ছুরিত হয়।

—এই unexpressable অনির্বচনীয়তা, মানুষের একমাত্র অখণ্ড নিরাপত্তি। কিন্তু উপায় নাই এই পরিধৃত সমগ্রতাকে স্পর্শ করবার আর তাই বিবোধের সমন্বয়েই কেবল বোঝা যেতে পারে সত্তার বিভিন্ন পর্যায়, অস্তিত্ব। কেন না—

অনুভাকে দেখায় একটি ছবির মত। একটি ইমেজ। পে-নি-লো-প। প্রতীক্ষাসঙ্কুল। শরীরের ঋজু রেখায় অনাসাত্তিক একটি আগ্রহ : ব্যাগ্রতায় স্থির। একটি অকাট্য অপেক্ষাকে বিঁধে বিঁধে চলেছে। অনুভা শোনে। প্রত্যেকটি শব্দে তার গভীর মনোযোগ। কিন্তু চোখ তোলে না।

—আসলে, কারণ দেখো—কথার চাঞ্চল্যে দ্রুত হয়ে ওঠেন ত্রৈলোক্যবাবু। মুখের চামড়ায় অনুজ্জ্বল কৃশতা। শীর্ণ মুখটির উপর একটি স্ফীত নাক। আর শিশুর মত নির্বোধ চাউনি কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—intuition বলে যা বলা হয়েছে এ'ও একটা নিরন্তর সমগ্রতা নয়। কারণ স-সম্পূর্ণ আত্মিকতায় জীবসীমা নিরস্ত নয়। বের্গসর মনীষা

এই যে তিনি intellectual sympathy কে দাঁড় করিয়েছেন এই বিবোধ-বিন্দুব মধ্যে। intellectual sympathy : দীপ্যমান হৃদয়বানতা। এর প্রধান অংশ বোধির অন্তর্গত। আমাদেব বিরোধের নিষ্পত্তি যে বোধে সেখানে কোনো খণ্ড নাই, কোনো বিদীর্যমান কণা : কোনো ফেটে বাওয়া অনুভূতির আচমকা টুক্‌রো। আব এই বোধি অনস্তিত্ববান কোন সমীকবণ। unexpressable.

—And we shall find that, there is nothing absolute in me : খানিকক্ষণ থেকে হঠাৎ উচ্চারণ করলেন ত্রৈলোক্যবাবু। সমুদ্রের মধ্যে কোনো নির্ভরশীল দ্বীপ লাভের মত।

—Apocalypseটা দেখি—ডান দিকে—লরেন্সেব।

লঘু পায়ে উঠে দাঁড়ায় অনুভা। টেবিলেব সামনে সাজানো বই-এব ব্যাক। বাব কবলে Apocalypse. উজ্জ্বল, চর্মাবৃত প্রচ্ছদপট। নামটা ঘুবিয়ে দেখে। দুর্বল হাতে বাড়িয়ে দিলে ত্রৈলোক্যবাবুর দিকে। তারপব এসে বসল চেয়ারটিতে। তুলে নিলে সেলাইটা। ঘাড়ের ঈষৎ বাঁকা রেখায় আধফালি চাঁদেব মত শরীরেব বামাঙ্গ। দীর্ঘ, নিঃশব্দ, পুঞ্জীভূত একাগ্রতাকে আবাব বিঁধে বিঁধে চলল।

'There's nothing absolute in me except my mind, and we shall find that, mind has no existence by itself. It's only' —উপলব্ধিব কি উজ্জ্বলতা দেখো। 'It's only the glitter of the sun on the surface of the water' জলেব উপব ছটামান কিবণ। দেখেছো এই উপলব্ধিব কোনো ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই, অথচ বিরোধ আছে। আব সমন্বয়ের তীব্রতায় তা কেবল আমবা বোধ কবতে পারি। তাই উপমা, ইঙ্গিত। আসলে এই উপলব্ধির কোনো মীমাংসা হয় না। unexpressable : glitter of the sun on the surface of the water. আব এই দিক দিয়ে intellect বল, intuition বল, এক একটা পদ্ধতি, বিবেচ্যমান রীতি। আসলে আমরা জীবনকেই জানি না। সমন্বয় মানতে পাবিনা। ব্যাপারটা কি জানলে : জীবনটা জীবনেরই মত। অন্য কিছুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

নিস্পন্দ একাগ্রতায় অনুভা প্রত্যেকটি কথা শুনবে। প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও কথা ; তারপর তাকে নিশ্চিহ্ন ভুলে যাবে। নির্ভুল বিস্মরণের মধ্যে ডুবে যাবে প্রতিটি উচ্চারণ। গভীর ঘুম থেকে সে যেন দাঁড়িয়ে উঠল। টেবিলের উপর থেকে ওষুধ আর গ্রাসটি নিয়ে আসে। দাগটি হাতে নির্দেশ করে শিশিটা নাড়ায়, তারপর গ্লাসের মধ্যে পড়তে দেয় তরল ঝাঁঝালো ওষুধটা। কালো, জমাট রক্তের মত ঘন ও লাল। উগ্র গন্ধ।

—বাবা।

ত্রৈলোক্যবাবু নিঃশব্দে হেসে মুখ বিকৃত করেন।

—ঘম বেরিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—তুই খেয়েছিস ?

—না। তোমার টেম্পারেচারটা নি।

—আজ ভাল আছি মনে হচ্ছে।

—না, মনে হচ্ছে না। গালে হাত দিয়ে দেখল অনুভা,—কোনো কষ্ট হচ্ছে কিছু ব্যথা ? বুকের বাদিকে ?

একটু। কম মনে হচ্ছে অনেকটা আজকে।

—এ'কলকাতা ভাল নয় বাবা। সহর, মানুষ আর ধুলো।

—আর ধোঁয়া। হাসলেন ত্রৈলোক্যবাবু,—আর টুব্যারকুলেশিস, আর অনু'মা। সরু, ঠাণ্ডা, ঘামে ভিজা আঙুলগুলি তিনি টেনে নিলেন হাতের মধ্যে। কপালে রাখেন।

—অনু—মা।

—য়্যা-বাবা।

ত্রৈলোক্যবাবুর মাথায় মুখটা রেখে অনুভার দীর্ঘ মৌন চোখে আবার জল ছম-ছম করে ওঠে।

অনুভা চলে যায়; আর তিনি পড়তে পারবেন না। বইখানি তুলে নেন, চেষ্টা করেন মনোযোগ দিতে।—'And beyond the limit of reasoning we do not know'—মন তার পাশ কাটিয়ে যায়। অনিশ্চিত মন নিয়ে খানিকক্ষণ বাদেই তিনি বই রেখে দেন। বাইরের প্রসারিত অন্ধকারের দিকে চেয়ে ভাবেন। ত্রৈলোক্যবাবু সব সময়ে ভাবেন। তার নিস্তরঙ্গ ভাবনার অন্ধকারে তিনি নিরাপদ। ঐ কাঠের চেয়ারটিতে তিনি নির্বিকার বসে আছেন দশ বৎসর। তার রিটায়ার্ড জীবনের পর ঐ তার কঠিন ও বিস্মরণময় আসন। ত্রৈলোক্যবাবু হৃদরোগাক্রান্ত। ঐ চেয়ারটিতে তিনি নিয়মিত তার ব্যাধিকে বাড়িয়ে তুলেছেন: অন্ধকার, ধোঁয়া আর বাতাসের প্রচুর কৃপণতায়। স্ত্রী মারা গেছে দশ বৎসর আগে। পরিজনহীন। সজ্জন ও শালীন মানুষটি। পুত্র, কন্যা, বই আর অন্ধকারে প্রসারিত ভাবনা। তার জীবনের ধারা অপরিবর্তনীয়। এই ভীরু, ত্রস্ত, আত্ম-অতৎপর ভদ্রলোকটি জীবনে নিয়মিত ও নিম্নলিখিত কয়েকটি কাজ করেছেন। পিতার প্রথম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ: এম-এ পর্যন্ত পাশ—দর্শনে অতি আশ্চর্য নম্বর পেয়ে: পিতৃ নির্বাচিত একটি কন্যা ও কর্ম গ্রহণ এবং যা' তিনি তাদের বিয়োগ পর্যন্ত গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে এসেছেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভা বোর্ডের কাছে এগিয়ে এল। হাত দিয়ে আঁচলটা গুছিয়ে নিলে। ডাষ্টার দিয়ে বোর্ডটি মুছে সরল তাকাল ছাত্রীদের দিকে।

—Let A B C be a triangle. কল্যাণী এদিকে দেখো: থিওরেমটা ইমপর্টাণ্ট।

—এগজামিনে পড়বে। সুমিত্রা বলে একটি কালো মেয়ে বলল। মেয়েটির চোখের ভুরু জোড়া আর ঠোঁট অসামান্য মাংসে পুরু।

—না পড়ুক। ভারী গলায় অনুভা বলে,—দরকারী থিওরেম বলে এটাকে জেনে রাখো: অনেক কিছু এর উপর নির্ভর করবে। এর সাধারণ সূত্রটি তুমি বলো'ত বাসন্তী।

—If one side of a triangle be produced, the third side—

—আচ্ছা, Let A B C be a triangle. অনুভা স্কেলের সাহায্যে বোর্ডে ছবিটি আঁকলে।

—A B produce to D: Now AB = AD.

অনুভা যখন থিওরেমটি বুঝিয়ে দিয়ে চেয়ারে এসে বসল তার চোখে একটি তৃপ্তির ছাপ। এমন কি তার দৃঢ় ও সংবদ্ধ ঠোঁটের ভিতর থেকে দাঁতের শ্রেণী-গুলো ঈষৎ দেখা যায়। অনুভার ভালো লাগে। এই বিদ্যায়তনিক পরিবেশটির মধ্যে একটি সজীব বিস্তার পায়। গলায় তার আবির্ভাব হয় গাম্ভীর্য ও আদেশ।

—শুভা, ইতিহাসে তোমার আশ্চর্য কম নম্বর উঠেছে। আর সব চাইতে বেশী রিপোর্ট তোমার নামে।

অনুভার চোখে একটি সহজ উত্তাপ। প্রত্যেকটি ঘণ্টা আর আর ঘণ্টার মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলির স্পন্দন তার কাছে পাখীর মতন উড্ডীয়মান। অজস্র খুসীর হাওয়ায় তার গলার নীচে উঁচু দুটি হাড় পিঠের সঙ্কীর্ণ ঋজুতা নরম হয়ে ওঠে: কোমল, স্পন্দমান ও বায়বীয়। ভেতর থেকে তার আচমকা

খুসীতে সে কেঁপে ওঠে—হারিয়ে যায়। দায়িত্বে তাকে ক্রত দেখায় : সকর্মক। তার সহযোগীরা তাকে অপছন্দ করে। আব কোনো এক অনির্দেশ্য উপলব্ধনে সে তা' বুঝতে পাবে। সে জানে তাব চোখ, মুখ, কান, এমন কি গলার বিশিষ্ট আওয়াজের প্রতি অনেক বর্ষীয়ান শিক্ষয়িত্রীব যত্নবান অনুজ্ঞা বর্তমান। এই অনুজ্ঞা ও মনোযোগ তাব সম্মানীয় পদেব। অনুভা সম্পূর্ণ অতর্কিত উপায়ে নিজেকে সম্মানিত ভাবতে সুরু করে দেয়। যত সে নিজেকে ভাবে তত সে উৎফুল্ল হয় : আব সেই উৎফুল্লতায় সে কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সকলে তাকে বলে 'কড়া'। এই 'কড়া' কথাটায় অনুভাব একটি গভীব আত্মপ্রসাদ। অনুভা চেষ্টা কবে নিজেকে কড়া করতে। কঠিন ও দায়িত্বনিষ্ঠ। সকলেব চোখেব উপর নিষ্কম্প করে তাকাতে. আব গলাব আওয়াজে ভাবী, দুর্যোগপূর্ণ আডম্বব নির্মাণ কবতে।

সকাল বেলায় তার কাজ অঙ্ক আব ইংরাজি বই থেকে শক্ত ও দুর্বোধ পিস্ খুঁজে বার করা। নিজে কষে নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। অঙ্ক কষতে অনুভাব আধ্যাত্মিক রকমের ভালো লাগে। অঙ্ক কষতে কষতে তার মন নির্মল ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কোনো একটা অঙ্ক পেলেই মনে মনে সে তৈবি হয়ে নেয়, মাথায় চাবিয়ে পড়ে চিন্তা, চোখে আসে মনঃসংযোগ। কিংবা কোনো শক্ত ট্রানস্লেশনেব পিস। নিজে করবে আব কাটবে। যতক্ষণ না সবল, নিঃসঙ্কোচ বাংলাটি গ্রামারেব ধূর্ত জালেব মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে ততক্ষণ সে সুস্থিব হবে না। ডিক্সেনরী উল্টাবে। দুর্গম, দুঃশব্দ ও দুরুচার্য শব্দে সে বিভৎস হয়ে উঠবে। অনুভা তার ইংরাজির জন্ম ছাত্রী মহলে বিস্ময়কর খ্যাতি পায়। যতক্ষণ না সে দুরুচার্য শব্দের শৃঙ্খলে গ্রামাবের এক দুরতিক্রম্য ফাঁদ সৃষ্টি না করে ফেলতে পাবছে তাব স্বস্তি নাই।

স্কুলে সে নির্ভুল পৌঁছবে সাড়ে দশটার দশ মিনিট আগে। তুলে নেবে হাজিরের খাতাটা। সই করবে। চোখ বুলিয়ে নেবে মিস্ট্রেস্ রুমে। তারপর এসে বসবে নিজের ঘরে, ছোট্ট কাঠের চেয়ারটিতে।

—ব্যেরা। চেয়ারে বসে সর্বপ্রথম এবং অনিবার্য ভাবে ডাকবে বেয়ারাকে। আর এই ডাকটি তার সচেতন হয়ে শুনতে রোমাঞ্চ আসে।

—মিসেস সেন এসেছেন।

বেয়ারা মাথাটাকে উল্টোদিকে কাৎ করে।

—এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আর সুচিত্রা দেবীকে ডেকে দাও।

—আউর থ্যাড়া রও।

বেযারা তার অপসৃয়মান শরীরটাকে ঘরের মধ্যভাগে দাঁড় করায়।

—বড় মায়্যী আনেসে, হামকো বোলানা।

কথা যত শেষের দিকে যাবে অনুভার তত ঝোঁক পড়বে হিন্দিতে। হিন্দী বলতে সে এক বিচিত্র কৌতুক পায়। আর কেউ যখন দ্রুত হিন্দী বলে যায় তার মধ্যে অর্থ ঠিক করে নিতে ক্রশ-ওয়ার্ডসের ধাঁধার মত লাগে। তার চোখে চপলতা জলজল করে।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই সারা স্কুলে মেয়েদের শৃঙ্খলিত কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। সেই বিদীর্যমান আবহাওয়ায় ছিটকে ছিটকে যায় হালকা, গতিঞ্চু শরীরগুলি। এই বিস্ফারিত উদ্দামতার মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অনুভা। স্থির, চিত্রার্পিতের মত। তার ভালো লাগে। তারপর হলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি একবার মৃদু, গম্ভীর ও সচেতন পায়চারী করে আসে। যতটুকু তাকে দেখা যায় ততটুকু মেয়েশূন্য হতে দেরী লাগে না। অনুভার চোখের তারায় আত্মপ্রসাদ গভীর ও নিটোল হয়ে ওঠে। তারপর সে আসবে মিস্‌ট্রেস রুমে। যে প্রচণ্ড হাসিটি সবে মাত্র তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল তাকে দেখেই বিরত হয়ে যায়। বিজনবালা দ্রুত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। বিজনবালা স্কুলের কনিষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী। সে সেলাই আর ড্রিল শেখায়। বিজনবালার সম্মানটা যে অতিরিক্ত অনুভা তা' জানে। সে যে তাকে খেয়াল করেনি তা জানাবার জন্যে তাকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। অপূর্ণা কোলের উপর থেকে বইটা ক্ষিপ্র তুলে নেয়। অনেকক্ষণ থেকে পড়বার একাগ্রতা তার মুখে নৈবর্তিক দেখায়।

—কল্পনা দেবী, জিওগ্রাফি ক্লাসের মেয়েরা—অনুভা নিবিষ্ট গলায় বলে,

—আচ্ছা, আপনি ক্লাস নেবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন। অনুভা আর কোনো দিকে চাইবে না। সে জানে ঠিক কি বললে তার বক্তব্য আরো ক্রীয়াশীল হয়ে উঠবে। ঔৎসুক্যে সকলে ছটফট করবে।

কি হয়েছে জিওগ্রাফি ক্লাসে? —কি রিপোর্ট দিয়েছে মেয়েরা। কল্পনা বয়সে কম। সে বিধবা। স্কুলমাষ্টারি তার সম্বল। মুখ তার শুকনো হয়ে উঠবে। অনুভা জানে এর পর একমাত্র তার কথায় সকলে উদগ্র ও চঞ্চল হয়ে উঠবে। সুলেখার খাড়াই নাকের প্রান্তটা বার বার সিট্‌কে উঠবে। অনুভার মনে একটি খুসী গোলাকার ও তৃপ্ত হয়ে উঠে। বিজনবালা এসে তাকে খবর দেয়। বিজনবালা অধ্যবসায়ী। তার একান্ত কামনা পদোন্নতি। অনুভার মুখের চামড়ায় রেখা পড়ে না।

—সেকেণ্ড ট্যাবমিন্যলে আপনার ক্লাসে রেজাল্ট ভারী খারাপ হয়েছে কিন্তু; তারপর কোর্স আপনার আশানুরূপ প্রোগেস্‌ড্‌ নয়। এটেন্‌ডেন্সেও রীতিমত গোলমাল।

বিজনবালা হদিস পায় না।

স্কুলের সেক্রেটারী জীবনপ্রসন্নবাবুর মেয়েকে রোজ পড়াতে যায় অনুভা।

ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রী মেয়েটি। সেক্রেটারীর এই একটি মাত্র কন্যা। এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতাও এই সেক্রেটারী। জীবনপ্রসন্নবাবু পেশায় উকিল। কিছুদিন তিনি সখের ওকালতীও করেছিলেন। সখের কারণ, পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি ওকালতী ব্যতিরেকেও এক পুরুষে ব্যয় করে শেষ করতে পারবেন না। আসলে, তার চরিত্রে পরোপচীকীর্ষার অনেক স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়। ওকালতীও ছিল তার জনহিতসেব্য কোনো সম্ভ্রান্ত সদিচ্ছা। তার একটি দাতব্য হাঁসপাতাল ও গ্রন্থাগার আছে। এমনি বহু জনপ্রতিষ্ঠানের মূলে তার আর্থিক সদাভিলাষ নিযুক্ত। সবার উপরে তিনি বিপত্নীক। তার স্ত্রী বিয়োগ আজ সাত বৎসর। শোনা যায় তিনি নিজের ইচ্ছায় এই মেয়েটিকে বিবাহ করেন। অনুভা সম্পর্কে-ও তার মনোভাব ছিল এই হিতকামনার অন্তর্গত। এই মেয়েটিকে তার ভালো লাগত। নিশ্চিন্ত আগ্রহে এই মেয়েটিকে তিনি লক্ষ্য করতেন। দায়িত্বনিষ্ঠা জীবনপ্রসন্নবাবু আন্তরিক ভালবাসেন। অনুভার লঘু শরীর আর সেই কৃশ শরীর ঘিরে একটি ধূসর অবসন্নতা; সরু নাক, আর ঠোঁটের ম্লান রেখায় একটি সন্তর্পিত সঙ্কোচ লক্ষ্য করতে তার ভালো লাগত। তার দায়িত্ব-পটু

ব্যবহার ও অনুৎসুক কণ্ঠের আওয়াজ প্রায়ই তাকে মেয়েটির প্রতি আগ্রহশীল করে তুলতো।

বেরিয়ে আসবার পথে জীবনপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বৈঠকখানায় বসে তিনি একখানি বাংলা উপন্যাস পড়ছিলেন। মৃদু নমস্কার করে সোজা হয়ে বসেন।

—বসুন।

অনুভা বসে। জীবনপ্রসন্নবাবুর বাড়ীখানি কিন্তু অর্থের মত চেহারায় ফাঁপালো নয়। চতুর্বর্গে আঁটসাট। মাঝারি বাড়ী। সে বাড়ীতে বাস করবার লোকও নিদারুণ অল্প। তার বৈঠকখানার সামনেই একটি অনতিবৃহৎ ফুলের বাগান। এই বাগানটি তার স্বর্গত স্ত্রীর একটি সখের শালীন ও সাংসারিক উৎপাদন। অনেক রকমের ফুলে ঝকমক্ করছে বাগানটি। নরম, একমাপের ঘাসগুলির মাথা। গাঢ় ও সবুজ।

—বাঃ, চমৎকার গন্ধ'ত। হাসনুহানার গন্ধ ভারী মিষ্টি। অনুভা বসে বলল। আর বলে ফেলেই মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। অনুভা অত্যন্ত সচেতন। যখন সে জীবনপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কথা কইত তার সর্ব্বাঙ্গে সজাগ থাকত একটি তীক্ষ্ণ সতর্কতা। একটি বিকৃষ্ট আকর্ষণ বোধ করত ঐ লোকটির প্রতি। ছোট ছোট চোখ: আর সেই চোখে সর্বদাই একটি স্নিগ্ধ উত্তাপ অপেক্ষমান। মোটা বেঁটে হাতের আঙুল। প্রত্যঙ্গগুলি সরল ও নিটোল। অনুভা কথা কইত যেমন উদ্ধতনদের সঙ্গে কওয়া উচিত: সংক্ষিপ্ত ও সারবান।

—আপনি ফুল ভালোবাসেন। জীবনপ্রসন্নবাবুর চোখে হাসির ছিট লাগে।

—ফুল! না, এমনি বলছিলাম। কথাটাকে শেষ করে দিতে চাইলে অনুভা।

—ফুল না ভালবেসে আপনারা নিরুপায়। নড়ে চড়ে বসেন জীবনপ্রসন্নবাবু। —আপনাদের কাজ ফুলেদের নিয়ে। আচ্ছা, আপনি মনে করবেন না, কিশোর বয়সে আমরা সকলেই থাকি ফুলের মত; আসলে সুযোগ অনুযায়ী কেউ ফোটে, কেউ মরে, কেউ বা পচে যায়।

—তাই'ত। অনুভা নড়ে চড়ে বসে। কাঁধ দুটো উঁচুতে নিচুতে দুবার দুলে ওঠে।

—সত্যই'ত তাই। সে চেষ্টা করল কোনো বুদ্ধিমান উত্তর দিতে,—সুযোগই'ত সব। সুযোগমত আমরা বেড়ে উঠি বা মরে যাই।

—কিন্তু, পরিবেশকে কাটিয়ে উঠাই কি ব্যক্তিত্বের নিয়ম নয়। একটা স্বাভাবিক কথাকে অতি সহজেই জীবনপ্রসন্নবাবু আলোচনাতে পালটে দিতে পারেন। জনহিতকর সেবার মত এটিও তার একটি সুদক্ষ স্বভাব।

অনুভা খুসী হয়। এই বুদ্ধিজীবি আলোচনায় সে যে একটি পক্ষ এই বোধটি তার মুখে চোখে জাজ্বল্য দেখায়।

—তা'ও ঠিক। যথেষ্ট গাম্ভীর্য নিয়ে অনুভা বলে,—প্রতিভার মূল্য'ত এইখানেই।

—কিন্তু সুযোগই সব নয়। আর ব্যক্তিত্ব কি পরিবেশ না থাকলেই গড়ে উঠবেনা?

অনুভা দ্বিধায় পড়ে। ঠিক বুঝতে পারে না ঠিক কি বলাটা তার বুদ্ধিমানের মত শোনাবে।

—কথাটা ভাববার বিষয়। কারণ দুটির যে কোনোটাই একমাত্র নয়। জীবনপ্রসন্নবাবুর চোখে সুতৃপ্ত একটু আলো মিট মিট করে।

—আপনাকে চা দিতে বলি।

*

রাত্রিটি অনুভার পরিপূর্ণ ভাবে ফাঁকা। আর এই রাত্রি ঘিরে তার শরীরে নামে একটি পরিচিত রহস্য। শান্ত, নিমগ্ন ও সুদূর স্তব্ধতায় সে আবার বিসর্পিত হয়ে ওঠে। এখানকার বৈদেশিক রাত্রিগুলির সঙ্গে তার হৃদ্য পরিচয় স্থাপন হয়ে যায়। অনুভা জানালা খুলে ঘুমায়। রাত্রির গন্ধে ও হাওয়ার ছাঁটে তার চুলগুলি মুখের উপর বারে বারে আকুল হয়ে পড়ে। তার জানালার বাইরে থেকেই আকাশ সুরু। নীল, নিস্তরঙ্গ আকাশে চাঁদের এই আলো দেখতে তার ভালো লাগে। কখনো কোলের উপর হাত দুখানি জড় করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অনুভার প্রায়ই ঘুমাতে রাত অনেক হয়ে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই অনুভার মনে পড়ল আজ রবিবার। ছুটি। আর ইচ্ছা করেই সে উঠল না। বাইরে তখন পরিষ্কার সকাল হয়েছে। সূর্যোদয়ের ইঙ্গিতে সমস্ত

আকাশটি বর্ণোজ্জ্বল। সে আরো প্রসারিত আলস্যে বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। ও'পাশের দিকটাতে থাকেন হেড মিস্ট্রেস্ সুবিনয়ী সামাদ্দার। তার ঘরের দরজা বন্ধ। অনুভা আর সুবিনয়ী সামাদ্দার দুজনে থাকে এই কোয়ার্টারটিতে। কোয়ার্টারটি স্কুলের সংলগ্ন। অনুভা শুয়ে শুয়ে সূর্যোদয় দেখতে লাগল। সকাল বেলার এই নির্বাধ ও প্রসন্ন আকাশটির দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগল। শূন্য, নিগর্ভ তার মন। বহুবর্ণাসমান দিগ্বলয় রেখা, আর নরম ও রেখাঙ্কিত আকাশের শরীর। আকাশের এমন অপরিমিত বিস্তার সে কখনো দেখেনি। শরীরে আচ্ছাদনটি ভালো করে জড়িয়ে পায়ের তলাকার বালিশটিকে টেনে নেয় কোলের কাছে। চুলগুলিকে বিন্যস্ত করে বালিশে রাখে। আর ইতিমধ্যে সূর্যের উদয় হয় আকাশে। ধীর, জ্যোতিষ্মান, নিটোল সূর্য। খানিক বাদেই আলোর সতেজ বন্যায় তার ঘর ভেসে যায়। চোখে আঁচ লাগে। অনুভা উঠে এসে মুখ ধোয়। ঠাণ্ডাজলে সমস্ত মুখ তার শীতল হয়ে ওঠে। তারপর নিয়মিত একগ্লাস জল খেয়ে আঘাত করে এসে সুবিনয়ীর দরজায়। ধাক্কা খেয়ে দরজাটা খুলে যায়। সুবিনয়ী তখনো বিছানা থেকে ওঠেনি। কিন্তু জেগে যে আছে গলার আওয়াজে তা' বোঝা যায়। আওয়াজটি গোঙানীর মত। মুখটি পাশের দিকে ফেরানো।

—কি হল আপনার। সুবিনয়ীর বয়স তিরিশির শেষ চূড়োর কাছাকাছি। সুবিনয়ী মুখ ফেরালে। চোখের কোলের চামড়ায় রাত্রি জাগরণের গহ্বর। কালি জমেছে। দীর্ঘ ও বিস্তারিত চোখ দুটি। পল্লবগুলি ঘন। একটি শারীরিক ব্যথা ফুটে উঠেছে চোখে। সুবিনয়ী দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী। চামড়া যৌন কৃচ্ছ্রতায় একটু কর্কশ—শ্যামল।

—রাত্রি থেকে জ্বর হয়েছে। ইনফ্লুয়েনজা মনে হচ্ছে।

নাকটা একটু কোঁচকায়। নাকের ডগার দিকটা চাপা। থুত্নির দিকটা একটু চওড়া ও তোলা। সেইজন্য মুখটিকে সংযত ও দৃঢ় দেখায়।

—ভয়ানক ব্যথা সর্বাঙ্গে।

অনুভা কপালে হাত রাখে। উত্তপ্ত শরীর। ভোরের হাওয়ায় একটু ঘাম

দেখা দিয়েছে। গলার নীচে হাত রেখে স্পন্দন অনুভব করে খানিকক্ষণ। নরম মাংস : দ্রুত ও উষ্ণ স্পন্দন।

—এতো রীতিমত জ্বর।

—একটু কম মনে হচ্ছে সকাল বেলা। সারারাত্রি মাথাটা খসে গেছে।

—ডাকেননি কেন আমায়। অনেক রাত অবধি আমি জেগেছিলাম।

—তুমি এক কাজ করো : একটু ঠাণ্ডা জল দাও আর দরোয়ানকে একটা স্লিপ দিয়ে প্রসন্নবাবুর কাছে পাঠিয়ে দাও।

ডাক্তার নিয়ে জীবনপ্রসন্নবাবু নিজেই উপস্থিত হলেন। ডাক্তারটি তার দাতব্য হাঁসপাতালের হলেও উচ্চ বেতনভোগী ও পাশ করা। নাতিদীর্ঘ লোকটি। চওড়া কাঁধ। গোঁফের ডগাটি তীক্ষ্ণ ও ছুঁচালো। নাকের পাশের হাড় একটু বসা। হাসলে চোখের উপর দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে।

—রুগী কোনটি। চঞ্চল চোখ দুটি সকলের মুখের উপর বিবর্তিত হয়ে থামে অনুভার উপর। জীবনপ্রসন্নবাবু নির্দেশ করে দেন ইনি আমাদের স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস আর ইনি এসিস্ট্যাণ্ট।

—প্রধানশিক্ষয়িত্রীর অসুখটি যে বাহিক তা'ত বোঝাই যাচ্ছে। তবে এনারও পরীক্ষিত হওয়া দরকার। আপনারা vaccinated ত।

অনুভা নেতিবাচক ঘাড় নাড়ল।

—এ' রীতিমত অন্যায়। চওড়া কাঁধের উপর দৃঢ় মাথাটি ডাক্তারের বাঁয়ে-ডাইনে নড়ে।—রীতিমত অপরাধ। স্কুলের মেয়েদের উপদেশ দিয়ে নিজেদের বেলা অবহেলা নিশ্চয় খুব বড় উদাহরণ নয়। বিজ্ঞান জিনিষটা বিলিতি কাপড়ের মত অস্পৃশ্য কেমন? অনুভার মুখের উপর ডাক্তার উত্তাল হেসে উঠল।

—ভয়ের কিছু আছে?

—কেমন করে বলা যায়। Season changeএর সময়।

সুবিনয়ীর বসন্ত-ই দেখা দেয়। ডাক্তারের আনাগোনার অধিকতায় ক্রমশঃ একটি অন্তরঙ্গতার সূচনা হয়। সুবিনয়ী কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সুবিনয়ী মনে করতে চেষ্টা করে যে, ডাক্তার যা করছে তা দায়িত্বের অতিরিক্ত কোনো

সদানুরাগ। তার চোখের দৃষ্টি এই জন্ত কথা বলতে বলতে কোমল ও কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। কণ্ঠে আনুসক্তির বীজ উপ্ত হয়। সুবিনয়ী ভাবে। পৃথিবীতে বাস্তবিক-ই তার আপন কেউ নাই—ভাববার কেউ নাই।' আর একটি তৃপ্তিকর হতাশায়তায় সর্বাঙ্গ নিঃঝিম হয়ে আসে। তিন মাস সুবিনয়ী ভুগলে অসুখে। অসহায়তায় সে পশুর মত ক্লান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। কেবলই তার কথা কইতে ভালো লাগে। নিজের কথা. নিজের হতাশার কথা—পান্নালালের সঙ্গে কথা কইতে তার মনের আরাম হয়। নিরলস বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে করতে প্রায়ই চেষ্টা করে যে তার সমস্ত জীবনটা একটি নিষ্ফল শূন্য। আর এই শূন্যের মাঝখানে সে একটি বাষ্পহীন পিণ্ড। তার জীবনটা এক অকর্মণ্য ক্লান্তি। সে মনে করে—জীবনটা তার কাছে হাস্যকর ভাবে ভাঁড়ামী। শুয়ে শুয়ে দীর্ঘ ও উন্মুক্ত চোখে কেবলই জল এসে পড়ে।

—জানেন, নিজের বলতে কেউ নাই আমার। কারুর ভাবনা ভাবতে হয় না আমায়: সেই ডি—নদীর কলওলার মত।

—আপনার আত্মীয় স্বজন?

—কেউ। বাস্তবিক আমি একেলা। আর এই একা থাকতে আমার ভয় করে। নিজেকে ভারী বোধ হয়।

গায়ের উপর চাদরটা টেনে নেয় সুবিনয়ী। খোলা জানালা দিয়ে নির্মল সূর্যালোক বিছানায় এসে পড়ে। একটা ভ্রমর উড়ে এল।

ডাক্তার চেয়ারটিকে কাছে টেনে নেয়।

—এটা reaction. খুব পড়া শোনা করেন!

—এক-সময় ভাবতুম পড়া-শোনাই একমাত্র যা জীবনকে জানিয়ে দেবে; কিন্তু এখন দেখি, চোখে সুবিনয়ীর একটি নৈরাশ্য নির্বিকার হয়ে ওঠে। বালিশটা ভালো করে পিঠের মধ্যভাগে টেনে নেয়।

—এখন দেখি এটাও গতানুগতিক। আমার জীবনটা কি রকম জানলেন, শরীরটাকে একটু সোজা করল সুবিনয়ী। গলার স্বরটি উত্তোলিত হাতের সঙ্গে সঙ্গে সমতল ভূমিতে নেমে আসে।

—যেন একটা একসপ্রেস্ ট্রেণ। প্যাসেঞ্জারদের ওঠা-নামার ভীড় নাই: কোনো খুচরো চেঁচামেচি: কোনো ব্যস্ততা ও হট্টগোল। একটানা, দ্রুত ও নিয়মিত। যতক্ষণ না নির্দিষ্ট ষ্টেশনে আসছে ততক্ষণ সে এমনি: এমনি। অকারণ।

সুবিনয়ীর গলা কান পেতে শুনতে হয় বাতাসে ভাসছে, আবার তার চাউনি ধোঁয়াটে হয়ে আসে।

—আপনার বাবা, মা, ভাই-বোন?

—ছিল। কিন্তু সে একদিন। শ্রোতা পেয়ে সুবিনয়ী আবার ফেনিয়ে ওঠে,—সেই কল্পনার মত একদিন সব ছিল, মা, ভাই, বোন ···

সুবিনয়ী অনর্গল বলে যায়। তার দুঃখ, তার নিঃসীম পরিত্যক্ত একাকীত্ব। আর মনে হয় ডাক্তার কি ভালো, দরদী। কৃতজ্ঞতায় সুবিনয়ী ছলছল করে ওঠে।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

—এই natureকে আমরা কোথাও অস্বীকার করতে পারি না। ডাক্তার পান্নালাল চ্যাটার্জি অনুভার দিকে চেয়ে উক্তিটি করলে।

—Nature তোমরা বল কাকে? জীবনপ্রসন্নবাবু আলোচনার সূত্রপাত করেন,—মানুষের জীবনে নেচারের রূপ কি?

জীবনপ্রসন্নবাবুর বাড়ীতে বৈকালিক চা পানের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা সুরু হয়। পান্নালাল আসে। নিটোল ও কুঞ্চনহীন শরীরটিকে ইজিচেয়ারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে জীবনপ্রসন্নবাবু শোনেন; মাঝে মাঝে উঠে বসে যখন প্রতিবাদ করেন, তখন বাঁ-হাতটা কেবল দ্রুত নামে ও ওঠে। চোখের তারা তরঙ্গিত হয়। অনুভা একটা শক্ত চেয়ারে বসে থাকে: স্থির ও অনমিত মেরুদণ্ডে।

—এক কথায় বলা যেতে পারে,—চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে পান্নালাল।

—এক কথায় বলা যেতে পারে,—sex. মানুষের জীবন-লীলায় প্রকৃতি বলে কিছু থাকে তা' sex.

—তার অকাট্য প্রমাণ কোথায়। জীবনপ্রসন্নবাবু তার শরীরটিকে একটু ঠেলে তোলেন। তার চোখের তারা চঞ্চল হয়।—সেক্‌সকে মেনে নিলে হয়ত জীবনে আমাদের অনেক দুর্বোধ কার্য কলাপের কারণ পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই ব্যবহারিক অস্তিত্বের বাইরে তার কি প্রণালী থাকতে পারে আর তার চেহারা-ই বা কি? তারপর কি একথা মানো না মানুষের প্রকৃতিতে দ্বৈত আছে।

—মানি। তর্কের উত্তেজনায় পান্নালালের গলা ধারালো,—এবং তার কারণ ওই এক। সেই অনেকবারের বলা id আর ego. সেক্‌সের সঙ্গে সব সময়ই জড়িয়ে রয়েছে সুখ আর সন্তোষের কামনা। মানুষের আশা আর আশাভঙ্গ। অপটিমিজিমের জন্মটাও এইখানে আর সভ্যতার অভিব্যক্তিটা ঐ আশাকে কেন্দ্র করে।

—নর্মাল কথাটার মানে কি বলবে ?

—কথাটা ভুয়ো। মানুষ আব মানুষের সভ্যতাকে আলাদা করে না দেখতে পারলে কোনো মানে পাওয়া যাবে না। কারণ একটা অন্যটার প্রতিক্রিয়া : পরিপূরণ। মানুষ, একথা না মেনে উপায় নাই যে, বায়োলজিক্যাল ইভোল্যুশন ও এ্যানথ্রোপলজিব খাল বয়ে আসা একটা রূপান্তরিত অবস্থা : সভ্যতা অন্যদিকে দেখুন আশাভঙ্গেব প্রতিক্রিয়া। আর এইজন্য প্রত্যেক সভ্যতাই এক একটি সোপান ;—গতিটা ডায়েনামিক। কেবল বলা যেতে পারে অবচেতন যেখানে ব্যবহারিক জীবনে ঘটনার মধ্যে আকাব পায়, গতি পায় সেইটাই সভ্যতাব পরিমাপ : নর্মাল।

—কিন্তু মানুষেব সভ্যতাব পিছনে একটি বিশেষ ও সচেতন আত্মস্বীকাব বোধ কবনি। আর repressed libidoকে সুযোগ দিলেই মানুষেব গতি সীমায় ঠেকবে—এ কেমন করে প্রমাণ হয় ? আর যদি বা হয় সেও'ত, কল্পনার যুক্তি আরো দেখো, repressed lebido-ই যদি অদ্বিতীয় হয় তবে একই সভ্যতার চাপে দুটো বিভিন্ন চবিত্র হয় কি কবে।

জীবনপ্রসন্নবাবু তর্কের সূতো ধরে উঠে বসেন। অনুভার চোখ তার মুখের উপর। জীবনপ্রসন্নবাবু চেয়ারে খুসীতে দোল খান।

—দুটো কাবণে। ঠোঁটে ফুঁ দিয়ে তর্কের ঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাক্তাব,—একটা হেবিডিটি অন্যটা ন্যাচারাল সিলেকশন। ন্যাচাবাল সিলেকশন অবশ্য ব্যক্তিগত নয় ওটা ব্যষ্টিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হেরিডিটিই ঠিক। আসলে, যেটা বিভিন্নতা মনে হয় সেটা ডিগ্রি। adaption ও negation যেখানে যত দ্রুত ও সকর্মক চবিত্রগুলো সেখানে পালটায় তাড়াতাড়ি। এইখানেই একেব সঙ্গে অপরের তফাৎ ঘটে।

—কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাকে ব্যাখ্যা করবে কি করে ? জীবনপ্রসন্নবাবু এটেল মাটির মত আটকে থাকেন।

—প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে, শিল্পের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার একটা সহজ গতি আছে যা সুখ নয় বা সুখের ধর্মও নয়। Pleasure seeking বলে যে

ব্যাখ্যাটা সেক্সের মধ্যে প্রচলিত সেটা' একটি নিশ্চল জড়তাব অনুভূতি: পরাভুক বৃত্তি। যা নিজের মধ্যেই শেষ ও সম্পূর্ণ; কিন্তু ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে দেখো এব একটা বিশেষ মুক্তিব ছন্দ আছে যা নিছক জৈবিক নয় অবচৈতনিক নয়—

—সুতবাং নিশ্চয় তা' আধ্যাত্মিক। পান্নালালের দরাজ গলা সন্ধ্যা বেলাব ছোট ঘবখানিকে ভবিয়ে দেয়। কখনো বা তাদের আলাপ চলে মেয়েদের মনস্তত্ব নিয়ে। অনুভা নিস্তব্ধ হয়ে শোনে। কখনো জিজ্ঞাসিত হলে দু'একটা সল্প উত্তব দেয়। তাব উত্তরগুলি সব সময় সন্দিগ্ধ। তাব যে কোনো কথা আলোচনাকে আবো গভীবতার মধ্যে নিয়ে যায়। দু'জনে ঝলসে ওঠে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তিব জন্ম দু'জনে পরস্পবকে ক্ষিপ্র আক্রমণ করে। আব তাদেব সেই হিংস্র উজ্জ্বলতাব মধ্যে অনুভা তার কাঠেব চেয়ারটিতে চিত্রার্পিতের মত বসে থাকে। তাদেব বৈকালিক চা পানটি নৈমিত্তিক হয়ে উঠল। জীবনপ্রসন্নবাবুর উর্বর মস্তিষ্কে তর্কেব বিরতি ঘটেনা। তাবা সেক্স থেকে চলে যায় স্যোসিয়লিজিমে। মার্কসকে এফোঁড় ওফোঁড কবে এসে পৌছায় এপিক উপন্যাসের সংজ্ঞা রচনায়। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তর্ক চালায়। আর্ট ফর আর্টস সেকেব তর্কে তারা তিনটি বিকেল অতিবাহিত কবেছিল। উণ্ডসেট বা পার্লব্যক কেন নোবেল প্রাইজ পেল কিংবা গান্ধীজির পলিটিক্সে অন্তর্নিহিত নেতিবাদ কোথায়! বিষয় বস্তুতে তাবা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না। আর যে কোনো বিষয়ে তারা ঠিক দুটি বিভিন্ন দিক অবলম্বন করবে।

—নাবী স্বাধীনতা সম্বন্ধে তোমার কি মত। জীবনপ্রসন্নবাবু আলোচনার উৎপত্তি করলেন,—এই যে আন্দোলনের ঢেউ উঠছে।

—একটা মস্তিষ্কহীন প্রশ্ন: উনবিংশ শতাব্দীর। পান্নালাল মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ফুঁ দিয়ে উঠল,—আপনার কি মনে হয় মেয়েদের স্বাধীনতা সম্পর্কে মনে করবার কিছু আছে। পান্নালালেব চঞ্চল চোখ অনুভাব মুখের উপর স্থাপিত হয়। অনুভা বুঝতে পারে যে, সে কৌতুক করছে। একটু উপযোগী হাসে। —অবশ্য, অনুভা আজকাল সচেতন বুঝতে পায়ে আলোচনাকে আরো চিন্তা ও

গভীরতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় কেমন করে,—অবশ্য, আপনি কোন দিক দিয়ে বলছেন জানা দরকার।

—কোনো দিক থেকেই নয়। কারণ এর কোনো দিকই নেই। আপনি কি জানেন না স্বাধীনতা বলতে আমাদের মেয়েরা যে জিনিষটিকে বুঝে নিয়েছে সেটি আসলে নারী সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার একমুঠো নির্বোধ ও নির্বিরোধ বাক্যোচ্ছাস।

অনুভা অপ্রস্তুতে পড়ে। ঠিক কোনখানে যে পান্নালালের আপত্তি এবং কোন দিক থেকে আক্রমণ করলে যে তাকে খণ্ডিত করা যাবে সে দ্রুত মাথায় আনতে পারে না। আলোচনা বা তর্ক তার কাছে কেবল কথার সারি। sequence of tense ঠিক রেখে তাকে সাজানো। অনুভাব মনে কথা আসে অল্প। আর সেই কথা জোড়া দিতে বসে সে প্রায়ই কথা হারিয়ে ফেলে। সে হতাশ তাকায় জীবনপ্রসন্নবাবুব দিকে। এ চাউনি জীবনপ্রসন্নবাবু চেনেন। তিনি সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে উঠে বসেন। তার বাঁ হাত উপরে ওঠে। তাব চোখে একটি মিঠে আলো মিটমিট করে।

—তুমি কি মনে করো, অনুভার দৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে তিনি শরীরে সচকিত হয়ে ওঠেন,—মেয়েদের স্বাধীনতা কামনার মধ্যে কোনো অর্থ নাই, নিছক কোনো ফাঁপা ফাঁকা আড়ম্বর।

—ঠিক ফাঁকা কলসীকে জলে উপুড় কবে দেওয়ার মত।

—মেয়েরা ছেলেদের সহযোগীতা করবে, পায়ে পা মিলিয়ে চলবে এই ইচ্ছার মধ্যে কি স্বাভাবিকতা নেই।

—এখনো ইচ্ছে থাকলে কোনো মেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ আনতে পাবে না।

—তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করো ?

—আপত্তিকর। পান্নালাল টেবিল চাপড়ায়,—ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

জীবনপ্রসন্নবাবু হাসেন। দেহটিকে সোজা তোলেন। অনুভার দিকে সস্মিত তাকান।

—তুমি ডাক্তার। তুমি জানো স্নায়ুর দিক থেকে মেয়েবা কত সূক্ষ্ম ও অনুভূতিশীল। অথচ তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে জীবন থেকে, আনন্দ থেকে,

বাঁচবার কেন্দ্র থেকে। কিন্তু তাদের ব্যবহার করছি আমাদের জৈবিক কোনো বিশেষ বৃত্তির মধ্য দিয়ে। এ'র প্রতিক্রিয়া তুমি মানবে না।

—ইবসেনের নাটকে মানা হয়েছে, শরৎচাটুয্যের সাহিত্যে মানা হয়েছে, বাঙলা ছায়াছবিতে মানা হয়েছে—আসলে এটা নারী স্বাধীনতা বলে মানা হয়নি। এবং দেশে যা বর্ত্তমান তা স্বাধীনতা-বোধ নয় সমস্যা।

—বিবাহ-বিচ্ছেদ করলেই সেটা আসবে বলতে চাও।

—আসবার সম্ভাবনা করা যায় যদি স্বাধীনতার প্রশ্ন বড় হয়।

—মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে তুমি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করছো। মেয়েদের স্বাধীনতা-বোধ, স্বাতন্ত্রবাদ, আগাগোড়া আলাদা পরিকল্পনা, পুরুষের ক্ষেত্রে তার নাক গলানোই স্বাধীনতা নয়। অনুভূতির দিকে ওরা আরো ঐশ্বর্যবান। সহজ সাচ্ছন্দ্য ও পরিমাণবোধটা তাদের স্বাভাবিক চরিত্র। আসলে খুঁজতে হবে ঐটাকে আরো সক্রিয় উপায়ে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যাবে কি করে। ঐ বৃত্তিগুলোকে উপযুক্তভাবে বাড়িয়ে তোলার নাম-ই স্বাধীনতা। কারণ দেখো, বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেই যদি স্বাধীনতা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে বিধবা বিবাহের পর আর বিধবার সমস্যাই থাকত না।

—সত্যই থাকত না যদি আসল দৃষ্টিভঙ্গীটা থাকত স্বাধীনতার কেন্দ্রে। কিন্তু ওটাও ছিল সমস্যা এবং সামাজিক। স্বাধীনতা-বোধটাই হল রাষ্ট্রিক। সমাজবোধ পেরিয়ে আসবার পর। আর সেই জন্যেই দেখুন ধর্মের দিক দিয়ে পথ খুঁজতে হয়েছিল, জোর পেলে না—জিনিষটাই ঘোলাটে হয়ে গেল।

—কিন্তু মেয়ে পুরুষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক—এ'ও কি অস্বীকার করবে।

—আলবাৎ। আমি ডিমোনেসট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি নারী পুরুষের পুরোপুরি সম্পর্কটা শারীরিক। সমাজবোধটা প্রক্ষিপ্ত। মেয়েদের যেদিন রাষ্ট্র-কেন্দ্র থেকে সরে যেতে হয়েছে সেইদিন হতেই সে সৃষ্টি করে নিয়েছে নিজের একটা শ্রেণী। এইখানে মেয়ে ও পুরুষ দুটো আলাদা আলাদা প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করে আসছে।

সব চেয়ে ভয়ের কথা এই যে এ'র ফলে তারা সঙ্ঘবদ্ধতা পর্যন্ত হারিয়েছে। এ'র ভেতর মজার জিনিষ হল যতবারই এক একটা সমস্যা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে পুরুষরা এদের হয়ে এসেছে ওকালতী করতে, চাহিদাকে ঠিক জায়গায় পড়তে দেয় নি, আর মেয়েরাও ভাবতে সুরু করেছে যে বিধবা বিবাহ—পণ না নেওয়া—সিনেমাতে নামাই বুঝি আসল কথা; যে সব পুরুষের মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তারা চট্‌ করেই এটায় গলা ভিড়িয়ে দেয়, অনেক সময় নিজেদেব সুখ সুবিধার জন্য এ'গুলো তাদের চাওয়াতে বাধ্য কবে।

পান্নালাল সক্রিয় উৎফুল্লতায় কথা বলে যায়। অনুভা শোনে, আর এক দুর্বার বিরক্তি তাব মেরুদণ্ডে ঋজু ও কঠিন হয়ে ওঠে। দ্রুত, অস্থির শারীরিক ব্যস্ততায় পান্নালাল যখন ছটফট করে সে এক নির্জিব ও অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা নিয়ে লক্ষ্য করে তার থুতুনির সূচালো ডগা আর ঘন কৃষ্ণ চুল—থেমে থেমে গুচ্ছে গুচ্ছে উর্দ্ধায়িত প্রসারতা। মাঝে মাঝে তার ঐ চুলে হাত বুলোবার ইচ্ছা যায়। ঘন চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিতে। বিচিত্র এক ভয়ে অনুভা ত্রস্ত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে ঐ ঝিল্‌কে ওঠা দাঁতেব দিকে চোখ পড়লেই। ঐ দাঁত সে হাসলেই চোখে পড়বে। চক্‌চকে এনামেল: ধারালো। বিন্যস্ত দাঁতের সাবি। অনুভাব অসহ্য লাগে। একটি প্রবল বীতানুরাগ তার শরীরের বেখায় অচপল হয়ে ওঠে। জীবনপ্রসন্নবাবু লক্ষ্য করেন; ইজিচেয়ারে তাঁর অর্দ্ধবৃত্ত দেহটিকে নিমীলিত রেখে তিনি দেখেন কঠিন হয়ে ওঠা অনুভার চোখ: অচঞ্চল। চোখের নাতি-বৃহৎ পাঁশুটে তারাটি কেমন স্থির ও স্পন্দন-শূন্য হয়। নাকেব ডগাটি সরল ও নির্লিপ্ত। তার দেখতে ভালো লাগে। তার নিঃশ্বাসগুলি পড়ে মৃদু ও নিটোল। একটি পরোপজীবি আলো তার চোখে ঝকঝক করে। কোনো কিছু কারণে, অকারণে, অনুভার প্রতি তার করুণার উদ্রেক হয়। পিঠের মসৃণ সরলতায় পথ হারানো আকস্মিক ভগ্নাবতার মত নাকের ভীরু উন্নতায় একটি ক্লেশদায়ক বৃত্তি তার মধ্যে উদয় হয়। নিঃশ্বাস পড়ে মৃদু ও মন্থর।

কথা বলতে বলতে পান্নালাল মাঝে মাঝে থমকে যায়। ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে নেয় অনুভার নিঃশব্দ শরীরের উপর। ঠিক বুঝতে পারেনা পান্নালাল। কথার ধাক্কায় সে

ছিটকে পড়ে, খেই হারিয়ে ফেলে, আর পরমুহূর্তেই আরো দ্রুত ও উচ্চকিত হয়ে ওঠে। পান্নালাল অসাচ্ছন্দ বোধ করে। ঐ মৌনাবলোকন তার কাছে আকর্ষণময়। সে তরঙ্গিত হয়। সেই অনভিজ্ঞ আকর্ষণে সে ফেনিয়ে ওঠে। দীপ্ত, দুঃসাধ্য, হয়ে উঠতে এক অবচৈতনিক প্রেরণা পায়। কথা বলে চলে আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে সেই অনাবিষ্ট, নিরুদ্বেল, থমকানো চাউনি। একটি ক্লিষ্ট বিভ্রান্ততায় সে ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বাক্যের মাঝখানে থমকে যায়। তাকায়। সেই কেবল বলছে: অনর্গল, অবারিত, উৎফুল্ল; কথায় কথায় ছিটকে পড়ছে। অনুভাব কৃশ মুখ চাঁদের আলোয় ফুলের উদগীরণের মত বিবর্ণ বর্ণ—সে উত্তাল হয়ে ওঠে আবার—অজ্ঞাতসারেই পান্নালাল ঝলমল করে।

একই পথে দুজনের বাড়ী।

তারা দুজনে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। জীবনপ্রসন্নবাবু চেয়ার থেকে শরীরটিকে ঠেলে তোলেন।

—নমস্কার।

—কাল আপনাদের ছুটি'ত?

—হ্যাঁ।

—এবার স্বরস্বতী পূজো কেমন হবে?

যদিও অনুভার এই প্রথম বৎসর। তবুও অভিজ্ঞতার সুরে বলে,—অন্যবারের চেয়ে আশা করা যায় ভাল। মেয়েদের উৎসাহ প্রচণ্ড। আপনার বাড়ী চড়াও হবে কিছুদিনের ভিতরই। কালকেই না আসে।

জীবনপ্রসন্নবাবু হাসেন। চোখ দুটিতে তার খুশীর আলো।

—কিছু function করবেন নাকি এবার?

—মেয়েরা প্লে করবে ধরেছে: নটীর পূজা।

পান্নালাল বিরক্ত হয়। নিছক ব্যক্তিগত আলাপ সে অপছন্দ করে: সিগারেট বার করে ধরায়। মাটিতে বুট দিয়ে ঠোকে।

—কালকে আসছেন 'ত। খানিকটা আগিয়ে আসতে আসতে জীবনপ্রসন্নবাবু বলেন।

—বেশ'ত।

তারা যখন চলে যায় জীবনপ্রসন্নবাবু এসে বসলেন তাব বৈঠকখানায়। ইজিচেয়ারে কর্তব্যহীন খানিকক্ষণ শুয়ে রইলেন। তারপর উঠে এলেন বাগানে। ফুলের গন্ধে বাতাস তীক্ষ্ণ। অনেক রঙের ফুল। দুটো হাসনুহানার ডাল ভাঙলেন। নাকের কাছে তুলে ঘ্রাণ নেন। বেশ গন্ধ হাসনুহানার। মোলায়েম, মিষ্টি গন্ধ হাসনুহানার। ফুলটি শুঁকতে শুঁকতে উপরে উঠে আসেন। চমৎকার গন্ধ হাসনুহানার। বেশ ফুল: বেশ মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি। ফুলের মত: হাসনুহানার মত: মোলায়েম, মসৃণ। যে ঘরটিতে এসে দাঁড়ালেন সেটি তার শয়নকক্ষ। প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। দক্ষিণ দিকের জানালা খোলা—তাব তলায় বাগান। জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন জীবনপ্রসন্নবাবু। ফুলেব গুচ্ছটি নাকেব অতি নিকটে নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে তাকালেন বাগানের অন্ধকারের দিকে। সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার তার মুখ ছোঁয়। বেশ ফুল: বেশ মেয়ে। খানিকক্ষণ বাদে তিনি এসে বসলেন ঘরের মাঝখানে—টেবিলে। সামনে একটি ত্রিভুজাকৃতি বৃহদাকার আয়না, তাতে ছায়া পড়ছিল। জীবনপ্রসন্নবাবু একান্ত দৃষ্টিতে নিজেকে লক্ষ্য করেন! হাতে ফুল: সাদা এক মুঠো ফেনা। তিনি নিবিষ্টভাবে নিজেকে লক্ষ্য করেন। আর হঠাৎ অতর্কিত উপায়ে তিনি মনস্থির করে ফেলেন। তিনি বিবাহ করবেন। বেশ ফুল। বেশ মেয়ে! তিনি অনুভাকে অহেতুক করুণা করবেন। তার নিঃশ্বাস আবার মৃদু ও মন্থর হয়ে ওঠে। বিবাহ করবেন। অনুভাকে আদব করতে এক উৎপীড়িত ইচ্ছা হয়: করুণায় সর্বাঙ্গ ভরে দিতে। আঙুলগুলোর দিকে তাকান: স্ফীত, খর্ব আঙুল। আঙুলগুলোর জন্যে দুঃখ হয়। অনুভার কৃশ মুখ, ক্ষীণ ললাট ও পিঠের সরল ঋজুতায় হাত বুলাতে ইচ্ছা হয়: নরম, স্নেহার্দ্র, দয়ালু হাত।

* * *

তারা দুজনে চলতে থাকে। ঘন কুয়াশায় অন্ধকার জমাট। আকাশে চাঁদ নাই। নীল আকাশ। তারাগুলি ঝিকঝিক করছে। চলতে চলতে দুজনের গায়ে কনকনে হাওয়া লাগে।

—অন্ধকারে তারাগুলিকে আশ্চর্য উজ্জ্বল দেখায়। আকাশের দিকে চেয়ে চলতে চলতে পান্নালাল বলল।

—সাপের চোখের মত। বেশ লাগছিল অনুভার। উড়ে-পড়া চুলগুলিকে কপালের উপর থেকে তুলে দেয়।

—শীত করছে না?

—কনকন করছে গলার হাড়টা।

এখানকার শীতগুলি নিষ্ঠুর। হাড়ে গিয়ে বেঁধে। আমার শালটা আপনাকে ধার দিতে পারি। খানিকক্ষণ থেমে পান্নালাল বলে। অনুভা আপত্তি জানায়। আপত্তির উপরেই শালটা তার গায়ে ঠেলে দেয়।

খানিকক্ষণ দুজনে নিস্তব্ধ। নিঃসাড় পথ। তারা রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটছিল। অসম্ভব নীল আকাশ। সপ্তর্ষির দিকে চাইলে পান্নালাল। তার হঠাৎ ভয় করছিল। উজ্জ্বল জিজ্ঞাসা কাঁপছে আকাশে। চুলের উপর হাত বুলায় পান্নালাল। স্তবকে স্তবকে উদ্ভাসিত চুল। নরম, ঘন ও কৃষ্ণ। পান্নালাল তাকাল অনুভার দিকে। নিঃশরীরি দূরত্বে সে পথ চলেছে। দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ সে ধরতে পারল না। চোখের পাতায় তার দ্রুত ওঠা-পড়া চলছিল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

—আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। অনুভা নিঃশব্দে তার দিকে তাকাল। কি বলতে চায় পান্নালাল।

—একটা প্রার্থনা জানাতে পারি। 'প্রার্থনা' কথাটা পান্নালালের হঠাৎ মনে এল। অনুভা উত্তর দেয় না। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। ঐ ঈষদ্রুপ্ত গলার আওয়াজ: থেমে থেমে: একটু কাঁপা। ক্বচিৎ কোনো যান-বাহনের যাতায়াত চলে; কখনো কোনো পথচারীর পায়ের আওয়াজ তাদের অতিক্রম করে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। একটা মোটর আওয়াজ করে তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল; খানিকটা ধুলো উড়লো; তারা হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা ভেজানো, ভেতর থেকে দরোয়ানের রামায়ণ পাঠ কানে আসে। হঠাৎ পান্নালাল তার একখানি হাত তুলে নেয়। অনুভা কেবল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে: আর তার বিস্ফারিত

চোখে বিন্দু বিন্দু করে জমা হয় ভয়। পান্নালালেব চোখে একাগ্রতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে : ধাঁধার জ্যোতি। অনুভাব কপালেব চামড়া কুঁচকে যায়। চোখের তারায় প্রবল ভয় নিঃস্পন্দিত হয়ে ওঠে।

—তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না। যন্ত্রণাব মত বিকৃত পান্নালালের কণ্ঠস্বর।

—পার না ' আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই। পান্নালালের আবেগ আরো সন্নিকট হয়। তার শরীর তাকে ছোঁয়। তার নিঃশ্বাস এসে লাগে তার চোখের পাতার উপর। সর্বাঙ্গে অনুভা কেঁপে ওঠে। দ্রুত হাতখানি টেনে নেয়; তাব চোখে জল এসে পড়েছিল। সে ক্ষিপ্র কড়া নাড়ে।

—কেন আমাকে বিয়ে কবতে পার না! পান্নালালের গলা আশ্চর্য রকমের স্থিব ও নির্বেগ।

ভিতর থেকে দবজা খুলে দিলে দরোয়ান। অনুভা ত্রস্ত বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় : মুহূর্ত মধ্যেই সিঁড়ির উপব তার লঘু স্পন্দমান শবীবের রেখা হারিয়ে যায়।

* *

সেইদিন অনেক বাত্রি পর্যন্ত পান্নালাল জেগে থাকে। তার মস্তিস্ক ক্রিয়াশূন্য বোধ হয়। অবসাদে সে বিস্তাবিত শুয়ে পড়ে। চারিদিকে সন্তর্পিত নিস্তব্ধতা। ঘবের এক কোনে টাইমপিসটি টিক্‌টিক করছিল। সময়কে বোঝা যায় না। সেই সময়হীন অবসাদের মধ্যে পান্নালাল ভাবছিল—কেন সে হঠাৎ বিবাহেব প্রস্তাব কণ্ল · কারণ এক মুহূর্ত আগেও সে জানত না যে, এই কথা সে বলতে পারে। পান্নালাল আশ্চর্য না হয়ে পারলে না। ঠিক যে মুহূর্তে সে তাকে বলতে পারল সে তাকে ভালবাসতে চায় ঠিক সেই মুহূর্ত হতেই সে বুঝলে এক দুঃসীম, যন্ত্রণাকর ভালবাসায় সে নিঃসৃত হচ্ছে। ঐ মেয়েটিকে সে বহুদিন হতে ভালবেসে আসছে। পান্নালাল অনুভাকে মনে করবার চেষ্টা করল। তার ভিতব সুরু হয় এক কণ্টকিত পীড়া : একটি স্বপ্নালু ভয়ের মত অনুভা তার কাছে আকর্ষণময় হয়ে ওঠে। ড্রয়ার টেনে একটা খাতা বাব করল পান্নালাল। চামড়ায় বাঁধানো একটি চতুষ্কোন খাতা। পান্নালাল ডায়েরী রাখে। এটি তাব আত্মকাহিনীর

ডায়েরী নয়। মন-বিকলনের স্ব-ইতিহাস। এইটিতে সে লেখে যখন তার ইচ্ছা হয়। আর এই ইচ্ছাটা তার ঘটে মানস প্রকৃতির বৈলক্ষণ্যে। পান্নালাল পাতা

২৭-এ মার্চ। দিনাজপুর।

চিন্তা জিনিষটা নির্বিকার ভাবে চেতনার ব্যাপার। শারীরিক বা মানসিক যে কোন রকমেই আমরা চেতনশীল হতে পারি। কিন্তু চিন্তা সম্পূর্ণভাবে মানসিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত, শরীরগত যে কোনো চেতনার মধ্যে চিন্তা অবর্তমান : যেমন যৌন মিলন ; শরীর এখানে সক্রিয় হলেও মন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত ও নিরাকার। কোনো চিন্তার ভেতর·········

পাতা উল্‌টিয়ে গেল পান্নালাল।

১০ই নভেম্বর। দিনাজপুর।

পান্নালাল পড়লো :

আসলে কিছুই আমরা আবিষ্কার করতে পারি না · আর উদ্ভাবন কথাটা আমাদের মস্তিষ্কবৃত্তির উদ্ভাবন। যা নিয়ে এই পৃথিবী তৈরী—ধারণা ও স্মৃত কিংবা আরো আধুনিক—stuff বা সম্ভার, তাদের বিশ্লেষণ করে পরদার পর পরদা উঠিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদিম যুগ হতে আপাতঃ যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সেই গতিপথই নিরূপিত রয়ে গেছে। কেবল বস্তুর মাধ্যমিক কেন্দ্র পরিবর্তনই ঘটনা। সুতরাং বিবর্তন এই মতে চোখের ভুল। যেমন আমাদের যৌন অনুবোধের মধ্যে যে একটি প্রাগৈতিহাসিক সৃজন শক্তিকে বহন করে আছি—যার অনুপাত ও পরিপাত অবস্থাই আমাদের মানসিক কৃষ্টি ও সংযোগীতা সূচিত করে। আমাদের ভালবাসার মধ্যে রয়েছে এই উলঙ্গ উজ্জীবনেচ্ছা : গতি থেকে মুক্তি : সময় থেকে মুক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অন্তঃশীল আঘাতে কামনার এই নিরন্তর প্রজনন-বৃত্তি ········

পাতা উল্‌টিয়ে গেল পান্নালাল। অনেকগুলো পাতায় আর কোনো কালির দাগ নাই। ফাউণ্টেনটা দাঁতে চেপে খানিকটা ভাবলে, তারপর লিখলে :

১৫ই ডিসেম্বর। দিনাজপুর।

আমরা অনেক সময় জানি না যে আমাদের প্রত্যেকটি উচ্চারণ, শরীরের কতগুলি অনাবশ্যক নড়া চড়া এমন কি যে কোনো আচরণের পিছনে থাকে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির বিদ্যুৎ। অপরিমেয় ক্ষমতায় স্ফীত এই ইচ্ছা, এই অবচৈতনিক বিদ্যুৎ; আমরা বুঝিনা অথচ মেনে নি—আমাদের সমস্ত জীবনে এই খণ্ড খণ্ড ইচ্ছার বিভক্তি : ইচ্ছার প্রণালী!

· কলম থেকে সবেগে কালি ঝেড়ে নেয় :

আমরা জানি না কখন আসবে এর আক্রমণ আর উদ্বেল হয়ে উঠব তার প্রতিক্রিয়ায়। অতর্কিত এই বিস্ফোরণ। এই আকস্মিক অবিমৃষ্যকারিতায় আমি ফেটে পড়লুম—অথচ আমি জানতুম না!

ঐ মেয়েটির নিস্পৃহ একাকীত্বে একটি সুদূর আকর্ষণ আছে। আমার মনের অবচেতনায় সেই আকর্ষণ দুর্বার, দুর্লঙ্ঘ : চাঁদের টানে সাগরের ফেনিয়ে ওঠার মত। ঠিক বুঝি না কি সেই কামনা; সেই অভিপ্সার বিদ্যুৎ। ঐ কৃশ মুখ, নির্লিপ্ত গ্রীবা, অস্পষ্ট চাউনি আর কণ্ঠের নৈবর্তিক স্বর, সব মিলিয়ে একটি বিভ্রমের জাল সৃষ্টি করে মনে। মনে হয়, ভুল করে মনে হয়, ঐ সেই জন,—সেই আকস্মিক দৈব্যুৎ তার ঐ নিঃশরীরি দূরত্বে, নিষ্কাম মানসিকতায় আমাকে চিনে নেবে : নিরবয়বিক সহানুভূতির হাতটি বাড়িয়ে করবে পীড়ন। বোধ হয়, খুব সম্ভব, সব যৌবনের মত কারুর মধ্যে দেখতে চাই আমার কামনার অখণ্ড প্রতিচ্ছবি : মনের অন্ধকার সমুদ্রে একটি অনাবৃত শারীরিক উত্থান : আফ্রোদিতের মত : নির্লজ্জ, নিষ্কুণ্ঠ ও আকাঙ্ক্ষাময়। কিন্তু ভয় হয় : দ্বিধায় দুলি—ঐ নিশ্চল শূন্যতার মধ্যে কোনো বাষ্প আছে কি? কোনো স্পন্দন; প্রাণের কোনো সবুজ পানীয় : তৃণাঙ্কুর।

· পান্নালাল থামলো। তার মধ্যে অলসতা ঘন ও মাদকময় হয়ে ওঠে, চোখের উজ্জ্বলতা স্তিমিত হয়ে আসে। সময়ের স্রোত আবার সে বুঝতে পারে নিজের মধ্যে : প্রাণের মধ্যে আবার সে প্রবাহিত হয়। এক গ্লাস জল গড়িয়ে নেয় ঘরের কোনে বসানো কুঁজো থেকে। মুখে চোখে ও ঘাড়ে ছিটিয়ে জল দেয়। শান্ত হয়। চোখ আর জ্বালা করে না—ভিজে মুখের উপর হাওয়া লাগে, লেখাটা

অমনি পড়ে রইল। প্রচণ্ড ঘুমে তার শরীর ভরে গেছে, চোখ ভারী হয়ে উঠেছে। হাই ওঠে। এক সময় আলোটা নিভিয়ে দিলে।

—আসতে পারি। সুবিনয়ীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল পান্নালাল।

—আসুন। সাদর অভ্যর্থনায় ঝিলমিল করে ওঠে সুবিনয়ী,—কাল এলেন না। আমি কাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম।

—কেমন আছেন আজ। চেয়ারে বসতে বসতে বলল পান্নালাল,—পেটের কোনো গোলোযোগ ; দেখি হাতটা।

সুবিনয়ী সবিনয়ে শরীরটা সরিয়ে আনে,—শরীর নয় আসলে ভেঙেছে মনটা। আর এই মন নিয়ে আমি পরিশ্রান্ত। সুবিনয়ী জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অমাবস্যার অন্ধকারে তারাগুলি জ্বলছে।

—জীবনটার কোনো মানে নাই। ডাক্তারের হাতে হাত খানি রেখে সুবিনয়ী মর্মান্তিক গলায় বলে। মুখটা ঈষৎ অন্য দিকে ফেরায়। সুবিনয়ীর স্বাস্থ্য ভাল নয়। যকৃতের যৎসামান্য গোলমাল প্রায় তাকে অসুস্থ করে তোলে। কানের পাশে বসন্তের কয়েকটি মরে যাওয়ার দাগ।

—বিশেষ মেয়েদের জীবন।

—জীবনটার মানে তৈরী করে নিতে হয়। পান্নালালের গলা অস্বাভাবিক মৃদু ও সংযত।

—কোনো একটা অবলম্বন ছাড়া মেয়েরা বাঁচতে পারে না। ধূসর কণ্ঠে সুবিনয়ী বলে,—এই বাইরের জীবন রুক্ষ, তিক্ত ও হৃদয়-হীনতা দিয়ে ঠাসা ; এই আবহাওয়ায় মেয়েদের স্থান নাই। প্রাণ ধারণের যথেষ্ট উপাদান এখানে অবর্তমান। মেয়েদের প্রয়োজন সংসারে, স্নেহ ও সেবায়, দাক্ষিণ্যের মধ্যে তাদের প্রাণের বিকাশ।

পান্নালালের পাৎলা ঠোঁটে একটু হাসি ঝিকঝিক করে। কিছু উত্তর দেয় না। সুবিনয়ীর দিকে স্পষ্ট তাকায় পান্নালাল।

····মনে তখন উৎসাহ ছিল অটুট। সুবিনয়ী বলছিল। কণ্ঠস্বর মৃদু, চোখের চাউনি ভারী।

—ভাবতুম, মেয়েদের জীবনে দাবী আছে: দায়ীত্ব আছে। সেই দাবীতে আমরা প্রচুর, জ্বলন্ত, ব্রাউনিঙের কবিতার মত ছিটকে পড়তে পারি; আশ্রয়কে মনে করতুম কারাগার; আশ্রয় বাধা; স্নেহ বিপত্তি।

জানালার পর্দাটা হেমন্তের হাওয়ায় কেঁপে ওঠে। কমলালেবু রঙের পর্দা। সুবিনয়ী চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। হিমের হাত থেকে সব সময় শরীরকে বাঁচিয়ে চলা ডাক্তারের উপদেশ। এক ফাঁকে সে পান্নালালের দিকে তাকাল। পান্নালালের চোখে চোখ ঠেকায় দ্রুত তার চোখ নেমে পড়ে। অকস্মাৎ মর্মরিত হয়ে উঠল সুবিনয়ী।

—প্রাণের কোথাও যোগ থাকা দরকার, যেখান হতে আমরা নিঃসারিত হই। সুবিনয়ী ঈষৎ নম্র গলায় বলছিল।

—এই যুগের মেয়েরা কেন্দ্রভ্রষ্ট। জীবনে কোনো লক্ষ্যের সদাভিলাষ নাই। সুবিনয়ী তার যুক্ত হাত দুটি একত্রে অর্দ্ধশায়িত মাথার নীচে ঠেল দেয়। শরীরের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়। গ্রীবা-ত্বকে আলোর নীল ছায়া পড়ছিল।

—মেয়েরা যে আশ্রয় মানেন না একথা আপনি ?

—মানি। অস্ফুট উচ্চারণ করল পান্নালাল। গভীর চোখে সে লক্ষ্য করছিল সুবিনয়ীর টান করা শরীরের ইঙ্গিত্মক বৃত্তটিকে। ঈষোন্নত স্তন দুটি। গলার নীচে দুটি ভাঁজ পড়েছে: শাঁখের রেখার মত। চোখের ঘন পাতার উপর কয়েকটি চূর্ণ চুল দুলছিল। সুবিনয়ী পান্নালালের কথায় খুশী হল না। পান্নালালের চোখের অনিরুদ্ধ ব্যাকুলতা, বিস্তৃত কাঁধের ক্ষিপ্র ও অসহিষ্ণু ভঙ্গী দেখতে ভালো লাগে সুবিনয়ীর। সুবিনয়ী ভাবে পান্নালাল কিছু বলবে—সে অপেক্ষা করে। যদি সে কিছু বলে। কিছু বলা উচিত পান্নালালের। ঘরের মধ্যে নৈঃশব্দ প্রখর হয়ে ওঠে।

—সেদিন আপনি যা বলছিলেন, সুবিনয়ী বলে,—থিয়োরীর দিক দিয়ে সেটা নিঃসন্দেহে ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল। এক সময় আমিও ভাবতুম তাই—কিন্তু—

সুবিনয়ীর গলা আবার পাংশু ও দৃষ্টি ধূমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

—থিওরিই বোধ হয় সব নয়। ইন্‌টেলেক্‌টের পরও বোধ হয় কিছু আছে। ছেলে ও মেয়ে পরস্পর বেড়ে উঠবে একই চেতনায়, একই অধিবেষ্টনে—তাদের মিলন হবে বন্ধন নয়—সেতু। কিন্তু মনে হয় মেয়েরা হয়ত বন্ধনই চায়। মেয়েরা যা চায়—দিতে। দেওয়ায় নিঃশেষ হয়ে যেতে: নিঃশেষ ও সর্বাতুর।

সুবিনয়ী থামলো খানিকক্ষণ। তার গলা ক্রমশঃই অস্পষ্ট শোনা যায়। এক ঝলক চাইলে পান্নালালের দিকে।

—মেয়েরা ছায়া। স্নেহের পল্লবে পল্লবে প্রসারিত একটি ঐকান্তিক নিবেদন। দীর্ঘ, স্নিগ্ধ ও সহৃদয় একটি অপেক্ষা। আপনি মানেন না যে, মেয়েরা ছায়া: আশ্রয়।

—নিশ্চয়। নিষ্কম্প উচ্চারণ করলে পান্নালাল। সে নিরাবলম্ব বসে রইল। সুবিনয়ী অধীর হয়ে ওঠে। কেন বলছেনা পান্নালাল! বলুক পান্নালাল! কিছু বলুক সে। এই সময় আর তা বয়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ ঘরে তাদের নিঃশ্বাস পতন শোনা যায়। সুবিনয়ী প্রতীক্ষায় অদম্য হয়ে ওঠে। পান্নালাল স্থির, সংবদ্ধ তাকিয়ে থাকে; ম্লান, ধূসর দেহের রেখায় রেখায় সর্পিল ও সন্তর্পন আভাস। নিম্নাভিমুখী স্তনের ঘন ভার, রেখাহীন অনুত্তাল কপাল। পান্নালালের লোভ হয়। চোখের ঘন পল্লবগুলির উপর চূর্ণিত চুলগুলিতে সরিয়ে দিতে।

* *

ললাটে হাতের স্পর্শ পেয়ে শিথিলতায় চোখ বুজায় সুবিনয়ী। তার বুক দোলে। শান্ত টোকা গুলি পড়ে তার ললাটের উপর। চুলগুলির মধ্যে পান্নালালের হাত খানি খসখস করে। নিস্তল অপেক্ষায় সুবিনয়ীর সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণতা উদ্রিক্ত হয়। চোখ খুলতেই আভাস পায় পান্নালালের আনত দেহের উত্তাপ। নিঃশ্বাস এসে বাজে ঠোঁটের উপর। স্থির, উজ্জ্বল চোখ পান্নালালের। হাসলো একটু পান্নালাল। সুবিনয়ী নিশ্চিন্তে চোখ বুজায়।

* * *

পান্নালাল একা পথ চলতে বিরক্ত হয়ে ওঠে; সমস্ত শরীরে তার তীব্র বিক্ষুব্ধি।

চুলের উপর হাত বুলিয়ে নেয়। খানিকক্ষণ দাঁড়াল। রুমাল বার করে মুখটা মোছে। মুখে চোখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। পান্নালাল তাকাল আকাশের দিকে। নক্ষত্রীক্ষ আকাশ। সে নিজের ভেতর একটি অকাট্য শূন্য বোধ করে। অনুভাকে মনে পড়ে। আর সেই মুহূর্তেই এক পীড়াকর দুঃসহায়তায় বুঝতে পারে যে, সে অনুভাকে পেতে পারে না। তার নিষ্ঠুর, অপবিমেয় দূরত্বকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। তার মৌন ও শুখাভ্র একাকীত্বে সে নিশ্চল ও প্রাণ-হীন। পাশ দিয়ে তার একটা গাড়ী চলে যায় নম্বরটা চোখে পড়ল পান্নালালের। ছোট্ট, লাল আলোটা জ্বলছে পিছনে। ক্রুব, ধূর্ত, লাল।

* *

সমস্ত রাত্রি সুবিনয়ীর চোখে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য জমে ওঠে। তার দেহে ও মনে এক পরিপূর্ণ মাদকতা মধুর হয়ে ওঠে। এই রাত্রিটিকে অনুভব করতে ভালো লাগে। জীবনকে নূতন মনে হয়। নীল আলোকটি ঘরের মসৃণ মেঝেতে একটি বৃত্তকায় দাগ বিছিয়েছে : মায়াময়—তারই একটি ফালি পড়েছে তার অনাবৃত বাহুর ডৌলতায়। মুখে তার ছায়ার শীতলতা। যেন তার সারা শরীর ভরে ঘুম নেমেছে। চোখের পাতা অল্প বুজিয়ে—একটু খুলে সে ভাবছিল। পান্নালালের অনকম্প চোখে একটু দ্বিধার মৃদুতা : মিনতিতে আর্দ্র ও অনুরক্ত। পান্নালালের নিঃশ্বাস বাজছে তার ঠোঁটের উপর : চোখের কম্পমান পল্লবের উপর। সুবিনয়ী চোখ বুজিয়ে পাশ বালিশটিকে কোলের কাছে টেনে নেয়। শরীরে তার প্রসারিত আলস্য, একটু ম্লান একটু অগোছাল দেখায় তাকে। তারা দুজনে সুখী হয়ে উঠবে—রাত্রির নির্জনতাকে ফেনিয়ে তুলবে কথায় : স্পর্শের সঞ্চালনে। অর্দ্ধ নিমীলিত চোখে কল্পনাটি উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। প্রেমে তারা পূর্ণ : সার্থক। তার শরীরের অসহায় ভাঁজে ভাঁজে পান্নালালের আদরগুলি বাজে যেন! ......এক সময় তার ঘুম আসে। নরম, লঘু, স্পন্দমান ঘুম। চাঁদের ঝরন্ত আলো বিছানায় আরো ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘরে একটি স্নিগ্ধস্রাবী লাবণ্য ঝিম্‌ঝিম্ করে। ঘুমিয়ে পড়ে সুবিনয়ী।

* * *

—আমার বাড়ীটি কেমন লাগে আপনার। জীবনপ্রসন্নবাবু জিজ্ঞাসা করলেন অনুভাকে।

—চমৎকার, সুন্দর বাড়ী আপনার। আমার এমনি বাড়ীই ভালো লাগে : সামনে ঘাসে ঢাকা বাগান।

জীবনপ্রসন্নবাবু হাসলেন। একটি মেয়ে-হোষ্টেল খোলবার অনেকদিন থেকে তার ইচ্ছা ছিল। মেয়েদের দ্রুত সংখ্যোন্নতী দেখে তিনি তৎপর হয়ে অনুভাকে খবর পাঠালেন। অনুভাকেই তিনি চার্জ দেবেন ঠিক করছিলেন।

—হোষ্টেল হলে আপনাকেই তার ভার নিতে হবে।

—বেশ'ত। মৃদু গলায় বললে অনুভা।

—আপনার কর্ম-দক্ষতায় স্কুল কর্তৃপক্ষ খুব সন্তোষ পেয়েছেন।

—এ'ত আমার সৌভাগ্য। অনুভার উচ্চারণ খুব সন্তর্পিত।

—দায়িত্বনিষ্ঠা আমি পছন্দ করি। মেয়েদের ঐ জিনিষটাই সবচাইতে আনন্দ দেয় আমাকে। সংসারকে সুচারু করা, সৌষ্টব ও শালীনতায় উজ্জল করা। এই স্নিগ্ধতাই যে নারী চরিত্রে সবচাইতে আবশ্যক আপনি মনে করেন না?

—নিশ্চয়, শালীনতাই'ত সব। গাম্ভীর্যের আড়াল থেকে তর্কের জন্য প্রস্তুত হয় অনুভা। পান্নালাল এল না কেন আজকে। পান্নালালের অভাব বোধ হয় হঠাৎ।

—সৌষ্টব ও দায়িত্ব ছাড়া কি আছে মেয়েদের। অনুভাকে চিন্তাশীল দেখায়।

—কিন্তু পুরুষের জীবনে হয়ত এর বেশী দাম নাই। সে জীবনটাকে নিয়ম দিয়ে বা নিষ্ঠাদিয়ে একান্ত করে নিতে পারে না। বহু-বিবাহ প্রকৃতির দিক দিয়ে এইজন্যে পুরুষের কাছে সহজ। মেয়েদের দায়িত্বের কাছেই সে নম্র ও মুগ্ধ। মেয়েদের সম্ভ্রম-বোধের আশ্রয়েই কি পুরুষের সভ্যতার সৃষ্টি নয়?

—অবশ্য। আবার বললে অনুভা,—সম্ভ্রম ও শালীনতা ছাড়া' ত সভ্যতা নিরর্থক। আর এইখানেই মেয়েদের কাছে পুরুষরা ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

—আর এইখানেই সংসার।

—এইখানেই।

জীবনপ্রসন্নবাবু স্বাভাবিক হাসলেন। তার মুখে নধর খুসীর ছাপ! তিনি জানতেন; এ'না হয়ে যায় না। মানব চরিত্রে তাব অভিজ্ঞতা অসামান্ত। তাব, পিতা স্ত্রীর যৌতুকের সামান্ত অর্থ হতে লাখোপতি হন। মানব চরিত্রের বিপুল অভিজ্ঞতা তার বংশানুক্রমে আয়ত্তগত।

—আমরা সকলেই চাই সুখী হয়ে উঠতে: শালীন, সভ্য ও শৃঙ্খলাবান। এঁ ছাড়া কি বৃহত্তম কামনা মানুষেব থাকতে পাবে।

তাই'ত! এই'ত আমাদেব কামনা: দাবী। অনুভা ক্রমশঃ নির্জিবতা বোধ-কবে। পান্নালাল কেন এল না। ঠিক সে বুঝতে পাবে না উত্তবগুলিতে যথেষ্ট বুদ্ধি প্রকাশ পাচ্ছে কি না।

—আপনি চান না জীবনকে দেখতে—বাঁচতে।

জীবনপ্রসন্নবাবুর চোখে আলো মিটমিট করে। তিনি জানতেন। অনুভাব সর্বাঙ্গে তিনি পবিতৃপ্ত দৃষ্টির অনুলেপন কবেন।

—চলুন, আমার বাড়ী দেখাই।

প্রথমে তারা এল বাগানে। ভাঙলো একটা হাসনুহানার ডাল। কাঁঠালি চাঁপার উগ্র গন্ধ বাতাসে আরক্ত। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় অনুভাব।

—চমৎকার গন্ধ হাসনুহানার।

—এ'ত মিষ্টি যে সাপও গন্ধে ঘুমিয়ে থাকে। হাসনুহানাব বনে সাপ থাকে জানেন?

—সাপ! অনুভা বিস্মিত হয়ে চাইলে,—শুনেছি।

তারা উপবে এল। এটা ড্রেসিং রুম। ওটা ললিতা ঘুমায়। ললিতার মায়ের ঘর বাঁদিকেব কোনে। তা'তে তালা চাবি দেওয়া। তার মৃত্যুর পর থেকে ও'ঘর আর খোলা হয় না। মাঝখানে একটা লম্বা শ্বেত-পাথরের দালান। তার ও'দিকের ঘরটি লাইব্রেরি। মন্ত্রমুগ্ধেব মত এক ঘর থেকে অন্য ঘরে অনুভা অনুসরণ করে।

—এই ঘর আমার। একটি বিস্তৃত ঘরের মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে জীবনপ্রসন্নবাবু বলেন,—এই ঘরে থাকি আমি।

অনুভা চারদিক তাকায়। তার মাথার মধ্যে কোনো ক্রিয়া নাই। হলের মতন প্রকাণ্ড ঘর: দীর্ঘ। মোজাইক মেঝে। মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা আলোর ঝাড়। হঠাৎ বাঁদিকের দেওয়ালের ছবিটির দিকে নজর পড়ল অনুভার— At the temple door: গগনেন্দ্র ঠাকুরের। তার চোখে স্পন্দন ওঠে। এ ছবি তার ঘরে আছে। গগনেন্দ্রনাথের ছবি তার ভালো লাগে। রঙের গভীর আভাস। গোধূলির আলো নিঝঝুম হয়ে এসেছে। রুদ্ধ দুয়ার মন্দিরের সামনে নৈবদ্যনিবেদিতা কয়েকটি রমণী। সমস্তটা একটা স্বপ্নের মত: ছায়ায় জড়ানো। একটি পরিপূর্ণ ইমেজ। ছবি দেখে সে খুসী হয়ে ওঠে। চনমন করে তাকায়। ডানদিকের দেওয়ালে ও'ছবিটিও সে চেনে: ও'ত মাতিসের ছবি। চমৎকার ফ্রেম। কতদিন সে ছবি দেখেনি। তার ঘরের ব্লু-বয় ছবিটার অমনি ফ্রেম দিতে হবে। মেঘলা আকাশের ছায়ার মত। সার্জেন্টের একটা পুরানো ছবিও রয়েছে। অনুভা সামনে তাকাল। দীর্ঘ, ত্রিভুজাকৃতি আয়না, তাতে অনুভার শরীরের দাগ পড়েছে; তার পাশে দাঁড়িয়ে জীবনপ্রসন্নবাবু। তার চোখে উজ্জ্বল আলো: হাতে ফুটন্ত হাসনু-হানার স্তবক তিনি অনুভাকে লক্ষ্য করছিলেন।

—এ ঘর ভালো লাগে না তোমার। হঠাৎ প্রশ্ন করেন জীবনপ্রসন্নবাবু। অনুভা ঠিক বুঝতে পারছিল না। আবার সে বিহ্বল চোখে তাকায়—তার মস্তিষ্ক শূন্য ও নির্বিকার হয়ে ওঠে।

—থাকতে পারবে না এই ঘরে। জীবনপ্রসন্ন ঘন হয়ে এলেন। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে আদর করতে পারেন।

—এই ঘর তোমার। এখানকার সমস্ত কিছু। দায়িত্বনিষ্ঠা আমি ভালবাসি। আর তাই আমাকে আর আমার সমস্ত কিছু দিতে চাই তোমার হাতে।

জীবনপ্রসন্নবাবুর নিঃশ্বাস পড়ে দ্রুত। অনুভা নির্বাক, ফাঁপা চেয়ে রইল। তার মধ্যে চেতনা নাই—সে যেন নাই: মরে গেছে।

—এই আংটি তুমি নাও: আমার প্রীত্যুপোহার।

অনুভার একখানি হাত তিনি তুলে নেন। অনুভা ক্ষিপ্র সরে এল। হঠাৎ সে বুঝতে পারলে। তার পায়ের গোড়ালী অসংযত ভাবে কাঁপতে থাকে।

—না। অনুভার উচ্চারণ দুলছে। ভয়ে, বেদনায় তার চোখে জল এসে পড়ে। তার সর্বাঙ্গে অদম্য উত্তেজনা। তলাকার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটিকে শক্ত করে চেপে নিজেকে স্থির করতে চেষ্টা করে।

—না। অনুভা দ্রুত সরে এল ঘরের এক কোনে। হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে জীবনপ্রসন্নবাবু। তার ভ্রূ কুঁচ্‌কে ওঠে। তিনি হঠাৎ কর্তব্য ভুলে গেলেন।

—আচ্ছা, তুমি মনস্থির করে উত্তর দিও।

—না। আমি আঙটি নেবো না। অনুভা কেবল এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে পাবলে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল অনুপম। ঘরের ধূসরতা তখনও সূর্যালোকে স্পষ্ট হয় নি। অনুপম শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। সমস্ত ঘটনাটা সে স্মরণে আনতে পারছে না। অতীন্দ্রিয় আভাসের মত কেবল ছুঁতে পারে সেই উজ্জ্বল রহস্যময়তা; পারছে না তাকে অবয়বে নিটোল করে তুলতে। নীল ধোঁয়ার শিখা সর্পিল রেখায় জানালা দিয়ে উড়ে চলে: ক্ষীণ, বঙ্কিম, হালকা রেখা। আর সমস্ত ঘরে স্বপ্নের সেই শীতল স্পন্দন। অনুপম চেষ্টা করে মনে মনে স্বপ্নের সূতাটি জোড়া দিতে। কঠিন, নিরন্ধ্র রাত্রির মধ্যে দিয়ে অনুপম আর তার সঙ্গী চলেছে। সেই অন্ধকারে দু'জনে ছায়ার মত। যে পথ দিয়ে তারা চলেছে খানিক আগেই সে পথে এক বীভৎস যুদ্ধ থেমে গেছে। এক দুঃসীম ভয়াবহতায় বাতাস কণ্টকিত। সেই পথ মাটির পথ। ভিজে মাটির গন্ধ অনুভব করতে পারে অনুপম। হঠাৎ তাদের নিঃশব্দ অতিক্রমে তার সঙ্গীর পা কোনো কিছুতেই আহত হয়। এক অমানুষিক চীৎকার করে বসে পড়ল তার সঙ্গী। আর সেই হঠাৎ চীৎকারের ধাক্কায় দেখতে পেলে অনুপম এক ভিক্ষুক রমণী প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে ছটফট করছে। তার বাবার হাতে একটা ধারালো ছুরি; বাবার পাশে দাঁড়িয়ে এক নার্স। মাথায় উগ্র সাদা টুপী। নার্সের মুখ অনুপমের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শীতল মুখ; ঠিক মিশনারী মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর মত—ঠিক সাড়ে ন'টার সময় তাদের বাড়ীর তলা দিয়ে প্রাত্যহিক গমানারত মহিলাটির মত। একটু বাঁকা নাক, চোখের তারায় নীলের ছিট। কিন্তু আশ্চর্য ভিক্ষুক রমণীটিকে সে আর ভালো মনে করতে পারে না। তারপর এক অভাবনীয়ভাবে দেখতে পায় বিকাশ হাসছে, তার বাবা হাসছে, আর অনুভা তেরছা শরীরে বুনে চলেছে একটা

সেলাই। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে ঘর। আর অনর্গল উত্তেজনায় অনুপম কি বলে চলেছে। কি বলছে!—ভাবতে চেষ্টা করল অনুপম। কি বলছে সে! বলতে বলতে মুখের রেখায় নৃশংসতা কঠিন হয়ে উঠেছে। কিছু সে বলছে। তার বাবা হাসছে; ব্যঙ্গে টলমল করছে বিকাশের চতুর চোখ; আর অনুভা সেলাই বুনে চলেছে। নিঃশব্দ অনুভার শরীর; মসৃণ গ্রীবা একপাশে হেলানো। যে সেলাইটা অনুভা বুনছে তা' কিন্তু স্মরণ করতে পারে অনুপম। হেমন্তকালের মাঠে একমুঠো উর্দ্ধায়িত ধান: সরু, তীক্ষ্ণ ডগাগুলি। তারপর খানিকটা একবারেই অদৃশ্য—কিছুতেই সে মনে আনতে পারে না। কিন্তু যেন নিঃশ্বাস নিতে পারে সেই আবহাওয়ার। হঠাৎ অতর্কিত চীৎকার করে উঠল অনুভা। শুঁচটা বিঁধে গেছে তার হাতে: রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়; ধানগুলির মাথা ভিজে গেছে রক্তে। সবার উপরে ভাসছে তার শীতল, নিরানন্দ, বিষন্ন চোখ। দ্রুত সে অনুভাকে চেপে ধরে। দৃঢ়, কঠিন নিষ্পেষণে বিন্দুর মত অনুভা মিলিয়ে এল। তার বাবার হাতে ছুরি—বিকাশের কাঁধে হাত রেখে হাসছে। বিকাশ যেন কবিতা আবৃত্তি করছিল। কোনো ক্লাসিক কবিতা · বোধ হয় দান্তে থেকে: দুলতে দুলতে কবিতা বলছে বিকাশ—আনমনে অনুপমের দিকে না চেয়ে।

ঘরের ধূসরতা ভেঙে গেছে। আকাশে যে সূর্য উঠেছে তা জানা যায় না বোঝা যায়। অনুপম বিহ্বল চোখে বাইরে তাকায়। মাথাটা তখনও তার ঝিমঝিম করছে। ভোরের হাওয়া চোখে মুখে আর্দ্রতা দিয়ে যায়। সিগারেটটি বিস্বাদ লাগে। ফেলে দেয় জানালার বাইরে।

অনুপমের হঠাৎ নজরে পড়ে তারই ঘরের সমান্তরালবর্তী একটি বড়লোকদের বাড়ীর ঘরের একাংশ। শুয়ে শুয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ে একটি মেয়ের মুখের উপর একটি ছেলের মুখের ক্রমাগত ও ক্ষিপ্র উত্থান ও পতন। মাথার চুল মেয়েটির ভেঙে পড়েছে বুকের উপর। হাত দুটি ছেলেটির কণ্ঠাশ্রিত। নব দম্পতি। অনুপম চোখ ফেরায়। প্রণয়ালাপ। প্রণয় কাহিনীর অপ্রাচুর্য মানুষের পৃথিবীতে কোনো দিন ঘটে নি। সভ্যতার অতীত কোন অরণ্যে মানুষের রক্ত যেখানে সূর্যের উত্তাপে লাল—ছেড়ে দাও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—সময়ের অজস্রতায় নির্বন্ধ মুক্তি: তৈরি হয়ে

যাবে একটি লীলায়িত কাহিনী। মনোহর গীতিকবিতা। পৃথিবীর এই সৃজন লীলার মূলেও মানুষের আত্মজীবন। রূপ ও রস। গন্ধ ও বর্ণ। একদা এক বাঞ্ছিত চুম্বনে পৃথিবীর চেহারাও পরিবর্তিত হয়। বর্দ্ধমান কৌতূহলের সঙ্গে অনুপম লক্ষ্য করে নব দম্পতিকে; আর অজ্ঞাতসারেই স্বপ্নের দুর্গমতা থেকে টেনে নিয়ে আসে নিজের বিহ্বল মন। সে আবাব সচেতন হয়ে ওঠে। সজাগ ও কর্মঠ। [আমবা যতক্ষণ আমাদের করনীয়তায় বিশ্বসিত আসলে ততক্ষণই আমরা সক্রিয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানে দীর্ণ করতে পারি যে কোনো অনৈসর্গিক অস্তিত্বকে। আসলে, আমাদের মন বস্তুটি অতি চতুব ও সুবিধাবাদী। সুযোগ ও সুবিধামত সে সক্রিয় ও নিক্রিয় হয়ে ওঠে। যে জীবন ও ব্যবহারের মধ্যে পালিত এই মন ও মানসাবৃত্তি সেগুলিই আমাদের যুক্তি ও নির্ভর। আমরা কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারি না যা আমাদের ইন্দ্রিয়গত অনাস্বাদিত। মানুষ এইজন্য হাস্যকর ভাবে যুক্তিবাদী। চতুর মন নিজেব অক্ষমতায় দৃঢ ও সজ্ঞান। তাব স্ব-সীমায় সতর্ক। অথচ দেখতে গেলে এই যৌক্তিকতা, প্রত্যয়বোধ একটি অতি অপ্রাচীন, অপটু, সামাজিক সংগ্রহণ। আমাদেব প্রতিদিনকার জীবন ও আচরণের মধ্যে পালিত একটি সসীমতা বোধ।]

অনুপমের মন পাশ কাটিয়ে এল তার রহস্যাচ্ছন্নতা থেকে; এসে নিশ্চিন্ত হল। [আরো, এবং সেইজন্য, কোনো এক অতীন্দ্রিয় সত্তায় একাত্মীভূত মানুষ আসলে পলাতক জীব। এই পলায়ন প্রবৃত্তি তার সভ্যতায় চিহ্নিত, ইতিহাসে কীর্তিমান, ব্যবহাবিক যুক্তিবাদ ও জৈবিক দর্শনের মধ্যে নিশ্চল।]

মেয়েটি খানিকক্ষণ পরে বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসে। মুখের নধর মাংসে একটি মসৃণ সন্তোষ। কি চমৎকার ঝগডা করে মেয়েটি—হঠাৎ অনুপমের বিপরীত দিক থেকে মনে হয়—কি অসামান্য নিপুণতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে দুটি ঠোঁট। সুন্দর, সরস তির্যক ঠোঁট দুটি। আলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অনুপম বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। আঙুলে আঙুলে ফাঁস তৈরী করে টান করে ধরল শরীরকে। মুখের বিস্তারিত গর্ভ থেকে একটি ভারী বায়ু নির্গত হয়। সমস্ত শরীরে এক পক্ষঘাতিক জড়তা। উঠে এসে উঁকি দেয় ত্রৈলোক্যবাবুর ঘরে। ত্রৈলোক্যবাবু একটু বিলম্বে শয্যাত্যাগ

করেন। এটি'ও তার নিয়মিত স্বভাবের অন্তর্গত। মুখের শীর্ণ চামড়ায় একটি লঘু ঘুম ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুলগুলি এলোমেলো মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। নার্স'ত ভয়ানক অসাবধানী। জানালাটা খুলে রেখেছে। কার্তিকের হিম। আটটা বাজতে গেল; এখনো দেখা নাই। অনুপম ব্যস্ত হয়ে উঠল। জানালাটা দিলে ভেজিয়ে। ললাটে হাত দিয়ে অনুভব করল শীতলতা। নিঃশ্বাস পড়ছে মৃদু, শান্তিময়—হাতে এসে লাগে অনুপমের। বিছানার পাশেই কয়েক খানা জড়ো করা বই। একখানা টেনে নিলে অনুপম। Locke-র লজিক। আর একখানা টানলো Rudolph Euckin-এর জীবন-দর্শন। কি হয়! বইগুলি ক্ষিপ্র নামিয়ে রাখলে অনুপম। কি হয়। অনর্থক; অবান্তর পড়া! পড়া! পডা! নিরলস, স্থানুর মত; নিববচ্ছিন্ন ধৈর্যে ঐ বইগুলি একটির পর একটি—জ্ঞান। প্রজ্ঞা! কি অবিশ্বাস্য সম্পদ থাকতে পাবে ঐ কাঠের অনড় চেয়ারে, নির্জিব বইয়ের পাতায়, আর ঘরের এই পরিমিত শূন্যতায়। অনুপম ছটফট করে ওঠে। হৃদয়াবেগে সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। বারাণ্ডায় উঠে এসে দাঁড়াল অনুপম। উঠানে ঝিয়ের কড়া ঘষার শব্দটি বিরক্তিকর। পাশের বাড়ীটা এক ধনী বাঙালীর। অগণিত শরীর ও স্বরে ঠাসা। তাদের বাড়ীতে জীবন-চাঞ্চল্য সুরু হয়েছে।

—ওগো, কড়াটা যে মাজলি তার দাগ তো এখনো উঠলো না। গৃহিণী তার প্রভাতটিকে সম্ভাষণ করলেন।

—ঠাকুরপো, একবার রমলাকে ডেকে দাও না ভাই।

—ভোর হল, দোর খোলো, খুকুমণি ওঠরে।

—হুমায়ুনের পিতা বাবর দ্বিতীয়বার পাণিপথের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

—সাড়ে তিন মণ চালের দাম—বৃদ্ধ শিক্ষকের কণ্ঠস্বর।

Ho! boat man ho!—

—সাড়ে তিন মণ চালের দাম একুশ টাকা ছ'-আনা সাড়ে তিন পাই হলে—

—Ho! boat man ho! ছোট্ট মেয়েটি দুলে দুলে পড়ে—Ho, boat man ho! We want to go To dream land over the sea.

অনুপমের মনের সঙ্গে এই উৎক্ষিপ্ত চীৎকারের টুকরোগুলি বেশ মিশে

যায়। চোখের আলো কোমল হয়ে আসে। সিঁড়িতে নার্সের জুতোর আওয়াজ শোনা যায়। একটি বর্ষীয়সী মহিলা উঠে আসেন। পরিচিত নমস্কার বিনিময় করে দু'জনে। সরু নাকে রোল্ড-গোল্ডের একটি চশমা। সর্বাঙ্গে একটি পরিচ্ছন্ন মার্জনা।

—কালকে রাত্রে আর জেগে উঠেছিলেন? লাবণ্যে রিনরিন করে কণ্ঠস্বর। —কি—বুকের কোনো ব্যথা?

—না। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল।

—না, তবে স্লিপ পাঠিয়েছেন একটি।

—স্লিপ! আসবেন কি?

—আসা'ত উচিত। তা'ছাড়া দরকার। ইনজেকশনগুলো অত্যন্ত আবশ্যক।

—আপনি এখন কেমন বুঝছেন? আপনি বরং এইবার থেকে সমস্ত দরকার এইখানে সেরে নেবার বন্দোবস্ত করুন: ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এ সম্পর্কে আমি কথা বলে নেবো। আর কালকে রাত্রে ঘরে হিম ঢুকেছিল।

—হিম! কেন হিম ঢুকল কেন। হঠাৎ তিনি হিম কথাটার মানে যেন বুঝতে পারেননি।

—পায়ের দিকে জানালা দিয়ে: কার্তিকের হিম। কণ্ঠস্বরে বক্রতা আনে অনুপম। ভুল নির্দেশ করতে এক হিংস্র আনন্দ আসে তার।

—না, মহিলাটি হাসিতে স্বচ্ছ হয়ে উঠলেন,—আমি-ই ওটা খুলে রেখেছিলাম। হাওয়াতে এত ভালো আছে হিমে তত খারাপ নাই। খোলা হাওয়া এখন ওনার উপকার করবে।

কথা কইতে কইতে এক সময় নার্স ঘরে প্রবেশ করল। অনুপমও আসে পিছন পিছন।

—কেমন আছেন? অসহ্য লাবণ্যে নার্সের গলার আওয়াজ আবার অনুপমের মাথায় বেজে ওঠে। ত্রৈলোক্যবাবুর ঘুম ভেঙে গেছল। হাত দুটি কপালে ঠেকায়। ঘাড় নেড়ে ভাল আছি জানায়। নার্স টুকিটাকী কাজ সুরু করে দেয়। টেবিলটাকে পরিচ্ছন্ন করে ফেলে। ব্যবহার্য ওষুধ ও অনুষঙ্গগুলি রাখে একপাশে,

ক্ষিপ্র হাতে বিছানার ভাঁজগুলিকে নিটোল ও নিস্তরঙ্গ করে তোলে। তারপর ষ্টোভে চাপিয়ে দেয় মুখ পরিষ্কার করবার জল। দরজায় হেলান দিয়ে নির্বেগ দৃষ্টিতে অনুপম লক্ষ্য করে। ক্ষিপ্র, সাবলীল হাত একটি থেকে অন্য একটি কাজে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে; স্বচ্ছন্দ, শালীন ও পারিপাট্যে উজ্জ্বল আঙুলগুলি মোহগ্রস্থ লাগে তার চোখে।

—চা খাবেন। নার্সের দৃষ্টি চশমার মধ্য দিয়ে তার মুখের উপর তরঙ্গিত হয়।

—চা, না—চা খাবো না। বাজে পরিশ্রম আপনাকে করতে হবে না। তীক্ষ্ণ, সচেতনতায় বললে অনুপম।

—পরিশ্রম কি।

—মোড়েই দোকান আছে। অনুপমের উচ্চারণ স্থির ও নির্বেগ।—আপনার রোগীর দিকে নজর দিন।

—পম। ত্রৈলোক্যবাবু এক সময় ডাকেন; তার বিস্তারিত হাতখানি ছুঁয়ে অনুপম তার পাশে এসে বসে।

—পম। ক্ষীণ, কর্কশ গলায় বলেন ত্রৈলোক্যবাবু,—তোমার'ত আজকে ছুটি।

—হ্যাঁ।

—কেমন চলছে কাজ।

—কেমন আর ভালো। অনুপম ঠিক কথা খুঁজে পায় না। আর ক্রমশঃ দু'জনেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। চোখে চোখ পড়ায় দু'জনেই তির্যক গতিতে চোখ নামিয়ে নেয়। ভয়ে,—অনুপমের প্রতি ভয়ে আরো পাংশু দেখায় ত্রৈলোক্যবাবুকে। কঠিন ভয়ে অনুপমের সংলগ্ন হাতখানি ভিজে ওঠে। ঐ ছেলেটির প্রতি এক অনুচ্চারণীয় ভয়ে ত্রৈলোক্যবাবু তাকালেন তার মুখের দিকে।

অনুপম সইতে পারছিলনা। এই যন্ত্রণাময় নিশ্চুপতা এই বাড়ীর ব্যাধিগ্রস্ত চারিদিক; শূন্য, ফাঁপা—কূপের গর্ভে শীতল ও ভারী হাওয়ার মত নিঃসীমতায় তার নিঃশ্বাস আটকে আসে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে দ্বিধা, দেওয়ালের নিঃশব্দ উত্থানে এক অদ্ভুত রহস্য, এক বিবর্ণ ভয়; আর এই রহস্যের দেওয়াল দিয়ে ঠাসা অনুপমের

মৃত্যুকামী আত্মা সম্মোহিত। ত্রৈলোক্যবাবু বোঝেন এই পরিপোষিত বিক্ষুব্ধি ; এই ভ্রংশীল জীবনায়ন। আব ভয় পান। নির্বোধ ভয়ের ব্যাকুলতায় তাব দৃষ্টি অসহায় হয়ে ওঠে।

—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। দ্বিধার মধ্য দিয়ে বললেন ত্রৈলোক্যবাবু। অনর্থক, হেতুহীন কথা। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। অনুপমের যন্ত্রণা বোধ হয়। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—তুমি সেরে ওঠ বাবা! ডাক্তারবাবু আবো চারটে ইনজেকশনের কথা বলছিলেন। চেঞ্জটা দবকাব।

—বাইরে যেতেই হবে। নার্সের কণ্ঠস্বর অনুপমের মাথায় ঝিনঝিন করে ওঠে আবার।

—বাইরেই যেতে হবে। একটু হিলি চেঞ্জ।

—বাইরে।—ত্রৈলোক্যবাবু শূন্য চোখে তাকান।

—হ্যাঁ, তার কাবণ, কলকাতায় আমবা যে বাতাসটা পাই—

অনুপম উঠে পড়ে। বাতাস, ধুলো আব নার্সের উদগ্র পরিচ্ছন্নতা ; কণ্ঠস্ববের যন্ত্রণাকব লাবণ্য। পথে বেবিয়ে এল সে। গলিটা মিশেছে বড় রাস্তায়। হকাররা 'কাগজ' চীৎকার করছে। এক রাত্রে যে পৃথিবী যে কত গতিমান তার পরিচয় দেয় ঐ কাগজ। চারপয়সায় কেনা কয়েকটি নিঃশব্দ কালিময় পৃষ্ঠা। কোন রাষ্ট্রিক ক্ষুধার ব্যাদান কোন জাতির অসহায় বিপর্যয়। কোনো দেশের নবীন আত্মমোচন ; বিজ্ঞানীর নব আবিষ্কার ; মঙ্গলের লাল সঙ্কেত। কালকের বাত্রির স্বাপ্নালু মুহূর্তে হয়ত জন্ম নিয়েছে পৃথিবীব শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য। মানুষেব অনিবার্য অগ্রগমন ; অপরাজিত প্রাণাবেগ! প্রত্যেক সকালে কাগজ না পড়লে অনুপমের সমস্ত দিনটায় একটা খুঁত থেকে যায়। পাঁচশ হাজাব মাইল পৃথিবী বন্দী দুটী ক্ষুদ্র চোখের নিস্পৃহ কৌতূহলের সামনে। অনুপম একটা কাগজ নিলে। মোড়েই একটা রেস্তোঁরা। খুব চালু দোকান। শরীর ও স্বরে নিরেট। অনুপম কোনেব একটা টেবিলে বসল।

—ব্যাপারটা কি বল'ত হিটলারের! লোকটা After all একটা personality

আফ্রিকায় মার খাচ্ছে দেখেছো ইটালী।

—দেখে নিও জাপান ফ্রণ্ট খুলল বলে এবং সেটা আমেরিকার বিরুদ্ধে।

—তোমার কি মনে হয় আমেরিকা নামবে লড়াইয়ে।

—নিশ্চয়। দিনের মত স্পষ্ট। বৃটেনের প্রদীপের শেষ সলতে হল ঐটে।

—কিন্তু রাশিয়া চুক্তি করলে কি বলে জার্মানীর সঙ্গে।

—আসলে জার্মানী একটা ব্লক তৈরি করতে চায়। জাপানকে ওর বিশ্বাস নাই।

—জাপানের এশিয়া আর জার্মানীব ইয়োরোপ বলছো।

—এক বকম। যদি রাশিয়া শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকে আব বৃটেনকে যদি বাগে আনতে পারে।

অপব কোনো টেবিলে :

—একমাত্র ভরসা গান্ধিজি। ভারতবর্ষই আবার জাগাবে পৃথিবীর আত্মাকে।

—রাষ্ট্র মানে ধর্ম নয়।

কিন্তু ধর্মকে বাষ্ট্র হতে আপত্তি কি ?

—দেখছো না লোকটা প্রকৃতিগত ইনটুইশনবাদী। মেরোছো কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দেবো না।

—এমন একটা সুযোগ অথচ সময় চলে যাচ্ছে।

চার কাপ চা সামনে রেখে অন্য একটিতে :

—পড়লুম তোমার **Lady Chatterlay's Lover** লোকটি যে আধুনিকতাকে ববদাস্ত করতে পারে না তার বেশ শক্তিশালী প্রমাণ দিয়েছে।

—ওর সব বই-ই ঐ রকম। Greedy mechanism : Mechanised greedy কথাটা প্রায়ই ব্যবহার করেছে না। থিওরিতে লোকটা ধাঁহাবাজ।

—আলডুসেব ঢং দেখো নি। কি বেলেল্লাগিরি করেছে প্যাসিফিসিমের এনসাইক্লোপিডিয়ায়। প্যাসিফিসিম সম্বন্ধে বুদ্ধিমানদের সংশয়ে এই ইংরেজটি আরো গভীর করে দিয়েছে।

—আসলে লোকটা পেসিমিষ্ট।

—অথচ দেখো ওয়েলস’কে ! একজন বিজ্ঞানে বিভোর আর একজন বিজ্ঞানে কাতর।

অন্য একটিতে :

—যাই বল, বাংলা সাহিত্য এবার রবীন্দ্র-যুগকে অতিক্রম করবার শক্তি পেয়েছে।

—কিন্তু শরৎ চাটুয্যেকে নিয়ে আজ’ও সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখতে হয়।

—ভুলে যাচ্ছ, বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হল কেরাণীর বউ আব লেখক হল অধ্যাপকের পাল সমালোচক হল আইনজীবি আর সাহিত্য সভাপতি হয় আই, সি, এস্ নয় জমিদার নন্দন।

—ন্যাকা না হলে সতী হওয়া যায় না।

কিংবা :

—ভার্জিনিয়া উলফের নৌকাডুবি পড়েছো। অদ্ভুত। দ্বিতীয় শেলী। সমুদ্র-মৃত্যু। কলম ধরতে জানত মেয়েটি।

—ভিভানলি’র প্লে তোমার ভালো লাগে না। তুমি অষ্টম আশ্চর্য। মেয়ে নয়ত চাবুক।

কোথাও :

—মুস্তাকের ব্যাটিং দেখলে এবার।

—বেঙ্গলের হেরে যাওয়া অনুচিত।

—কাননবালাও শেষে বিয়ে করলে।

অনেকক্ষণ ধরে এক কাপ চা খেলে অনুপম। তারপর নির্ভাঁজ কাগজখানি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সূর্য আকাশে সাদা হয়ে গেছে। জলন্ত সূর্য আর আকাশ উগ্র নীল। ট্রাম ও বাসে অফিসযাত্রীদের কলরবময় ভীড়। স্কুল ও কলেজের ছেলে মেয়েদের পায়ে সতর্ক উত্তেজনা। অনুপম নিশ্চিন্ত মনে পথ হাঁটে। নিরুদ্বিগ্ন মন। তার সামনেই একটি ছেলে ও মেয়ে পাশাপাশি চলছিল। হাতে বইয়ের নির্বাহুল্যে অনুমান করা যায় কলেজের পড়ুয়া। পা ফেলার ভঙ্গীতে

ছান্দিকতা: প্রণয়ী। [কারণ, আমরা যখন প্রেমে পড়ি তখন অচেতনেই খানিকটা লঘু ও ছান্দিক হয়ে উঠি। আসলে দেখলে দেখা যায় আমরা প্রেমে পড়ি যখন আমাদের সতর্ক সচেতনতা ঝিমিয়ে আসে। নিজেদের ভিতরে উৎপীড়িত জিজ্ঞাসু ও অনির্দেশ্যতায় মন নিঃসাড় হয়ে ওঠে তখন আমরা কোমল হয়ে উঠি: লঘু ও ছান্দিক। অব্যবহারিক লাবণ্যে পিচ্ছিল, অগোচর দুর্নিরীক্ষ্যতায় দুর্গম। আসলে প্রেমটা হল প্রতিক্রিয়া। প্রেমিক হলেই লঘু হয় এবং লঘু হলেই প্রেমিক হয়। কারণ প্রেমের মধ্যে থাকে এক প্রবল আত্ম-অস্বীকার। আর এই আত্ম অসম্মানটা ফুটে উঠে পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ধারায়। আমি ভালবাসি কোনো একটি মেয়েকে—যে মেয়েটি আমাতীত কোনো একটি শারীরিক অস্তিত্ব। কিন্তু তাকে যে ভালবাসি এই বাসাটা আমারই যা আমার মধ্যেই শব্দিত, চিত্রিত ও অতিরঞ্জনতায় বর্ণায়মান। তা'হলে ভালবাসা জিনিষটা দাঁড়ায় এই যে মোহবান কোনো নির্মোহ। আর সেই জন্য প্রেমে শুধু আমরা পড়ি; কোনো গভীরতায় একাগ্র হই না।]

অনুপম চেষ্টা করেও শুনতে পেলে না তাদের মৃদু ও ঈষৎ কথোপকথন। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে তাদের কথা কইতে সুযোগ দিলে।

—কাল থেকে আমি আর কলেজে আসব না। মেয়েটির দ্রুত দৃষ্টি ছেলেটির মুখে বুলিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

—কেন? গলায় ভয় আর জিজ্ঞাসা পীড়িত হয়ে ওঠে ছেলেটির॥

—কি হবে মেয়েদের লেখাপড়া শিখে। নির্বিচল মেয়েটির চোখ ও গলার আওয়াজ।

—জ্ঞান বাড়বে। বুদ্ধিতে ধার লাগবে। সন্তান পালনে বিজ্ঞান ব্যবহার করবে।

মধ্যবর্তী দূরত্ব নিস্তব্ধ।

—কি হয়েছে।

—এর বেশী কোনো মেয়ে বলতে পারে না। কমলা লেবুর মত দু'কোন চাপা মেয়েটির কণ্ঠস্বর।

—সত্যি। ব্যাগ্রতায় থরথর করে ছেলেটি। একখানা হাত চেপে ধরে, —কিন্তু আমি যে আশা করতে পারছিনা।

—কেন : ভয় ? দ্রুত-চাউনি ছেলেটির মুখেব উপব দিয়ে ঘুরে আসে,—হাত ছাড়ো। আমার ক্লাশ আজ অফ্।

—আমারো। উল্লাসে চনমন করে ওঠে ছেলেটি।

দূর। একখানা সুখ-পাঠ্য উপন্যাস। গোলাকার একটি গল্প। তাবপর একদিন নাগরদোলা, রবিঠাকুরের গান, স্তন্য-দান-রত সুকীর্তিত মাতৃত্ব। পৃথিবীতে আর মহাকাব্যের সূচনা হবে না। অন্তর্বেগের গভীরতায়, জীবনের কিবণোজ্জ্বল মহিমায়। আমাদের আকাশচারী আদিম অভিলাষে! সামনে একটা পার্ক। অনুপম ঢুকল। প্রণয়ীরা অনেকদূর চলে গেছে। যন্ত্রযানেব চাকায় বেলা ধারালো হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি শব্দ মনে দাগ কেটে কেটে বসে। শাখার নিভৃত গর্ভে পাখীদের জটলা। একটা বেঞ্চিতে বসল অনুপম। পাখীর বিষ্ঠায় একপাশ অপরিষ্কার। কাগজটা বিছিয়ে নিলে। শরীবে তার ক্লান্তি বোধ হয়। অবসাদেব স্বেদ। লঘু ও নির্ভরশীল বিরামে জুতা থেকে পা দুটি মুক্ত করে বেঞ্চিতে তুলে নেয়। হাওয়াতে উত্তাপ লেগেছে ; ঘাসেব ডগাগুলি জ্বলছে ; শিশুব চোখেব মত উজ্জ্বল ; গাঢ় সবুজ। আর অনেকক্ষণ অনুপমের মন নিশ্চিন্ত থাকে। নির্বাক, শব্দহীন। চোখের তারায় ঘনায়মান বিশ্রান্তি। একটি নধরকান্তি সাহেবী পোষাকেব সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সুদর্শন বঙ্গযুবক সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। হাতে এডগার ওয়ালেসের সদ্যজাত কোনো গ্রন্থ : প্রচ্ছদপটের লোমহর্ষক ছবিটা চোখেব উপর অনুপমের জ্বলজ্বল করে। Struggle! আর অদ্ভুত, এক বিচিত্র উপায়ে তাব মন গুনগুন করে ওঠে। Struggle for existence! তার মন সজাগ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, সচেতনায় উগ্র,—'Life is a struggle' 'A struggle for existence.' 'Survival of the fittest' 'Life will assert itself' অজস্র টুকরো টুকরো কথায় বেগবান হয়ে ওঠে তার মস্তিষ্কবৃত্তি। চোখে তার ব্যবহারিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে : বুদ্ধিশীল, জীবন্ত দৃষ্টি। কোথায় অস্তিত্ব আমাদের। কিন্তু ঐ মেদবহুল বাঙালিটির নধর মুখে মারুক সজোরে একটা ঘুসি অনেকের

বিস্ফারিত চোখের সামনে প্রমাণিত হবে তার স্বীকার্যমান অস্তিত্ব। fittest : যোগ্যতা। আসলে, আমরা বেঁচে থাকব না আমাদের প্রামাণিক যৌক্তিকতা ছাড়া। এই মুহূর্তে যদি কিছু না করি, নিছক কিছু করতে না চাই আমার জানবার কোনো উপায় নাই আমার ক্রিয়াশীল জীবনাবেগ। আসলে, আমরা যে প্রাণবান, কোনো জীবনের অধিকারী এই অবচৈতনিক সত্যটির প্রেরণায় আমরা করি। অনুপম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার চোখে কৌতূহলের ফেনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—ঠিক কথা। আমরা যে বেঁচে আছি এই জ্ঞানটাই প্রধান ও প্রাথমিক। আর এই অনিবার্য জ্ঞান লাভের জন্য আমরা করি : কাজ করি : যে কোনো কিছু করি। কারণ, বাস্তবিকই একমাত্র জীবন ধারণ ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। কারণ এক সময় আমাদের মৃত্যু আবশ্যক। যখন আমরা কিছুই করি না তখন আসে মৃত্যু। একটি নিষ্ক্রিয় সমাপ্তি। এই দুঃখ, এই ক্ষোভ, এই মনস্তাপ এ'একটি উপলভ্যমান সংজ্ঞা; পরীক্ষাধীন কোনো জ্যামিতিক চিত্রের মত। I think so I am—তা' কেমন করে। অনুপমের চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ে। তার চোখের পাতা দোলে। চিন্তার মধ্যে'ত আমরা সকর্মক নই, সংযুক্ত নই; তারা বাবার মত। নিসম্পর্ক, পরিত্যক্ত। জীবন থেকে, ঘটনা থেকে। কারণ জীবন ঘটনা। আমি বেঁচে আছি এর সব চাইতে বড় প্রমাণ আমি একদিন বেঁচে থাকব না। একদিন আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো : মিলিয়ে যাব। আর আমাদের এই অস্তিত্বের নিদর্শন আমাদের জৈবিক সংগ্রামের মধ্যে ঘটনার ফলবানতায়। সংগ্রাম। শব্দটার উপর মনে মনে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে অনুপম। সংগ্রাম! যুদ্ধ! যুদ্ধ ভালো জিনিষ। রক্তে রক্তে উৎসাহ আছে। প্রাণাবেগের অদম্য ব্যাকুলতা। স্বপ্নের মধ্যেও তার যুদ্ধের বিধুনন। ঝড়ের হাওয়া। মনের ইচ্ছা সেখানে আদিম, উলঙ্গ, নিবাধৃত। আর যুদ্ধ না থাকলে আমাদের সভ্যতা পরিবর্তন-হীন : মেয়েদের সন্তান প্রসবের মত গতানুগতিক। যুদ্ধের ক্ষেত্র যেখানে সংসার সেখানে বোধ কই—চেতনা! একটি নির্লিপ্ত লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার নিরুত্তেজ নিরুৎসাহ। প্রাণধারণ এখানে বিকৃত : কুৎসিত ও পঙ্গু! সৈন্যের চোখে রসদহীন মৃত্যু। আসলে, আমরা কেবল বাঁচতে পারি আমাদের পৌনঃপুনিক পরিবর্তনের মধ্যে। মন

বলে যদি কোন পদার্থ থাকে তাহলে সে একটি নিরন্তর প্রতিবিম্বিত কামনা। সেই কামনায় অহর্নিশি তরঙ্গিত আমাদের মন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-চাঞ্চল্য। অনুপম মনে মনে একটা সন্তোষ পায়। সে ভেবে খুসী হয় যে, আমাদের ভাববার কিছু নাই। কারণ প্রত্যেক ভাবনাটাই একটা পরিবর্তনমুখী প্রাত্যহিকতা। আর অনুপম হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল যে আমাদেব জীবনেব ভিতব একটি মন আছে এবং সে মনের কোনো শরীরী নিশ্চয়তা নাই। কারণ, যে কোনো রকমেই হোক শরীরকে নিয়ে আমরা সুখী : স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত। মানুষের যে কোনো অনুপপত্তির উদ্ভব এইখান থেকে। এই আশরীরি কোনো বাস্তবতা থেকে। এই আমাদের চিন্তা ; অকর্মণ্য অসহায়তা ; আমরা যদি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম। কোনো উপায়ে ঘটাতে পারতুম মনের নির্বিকল্পতা। সুখী হবার, সহজ হবার, স্থূল হবার গতানুগতিকতা পেতাম। কোনো নিস্তরঙ্গ একবর্তানুবোধ।

অনুপম উঠে পড়ল। কাগজখানা পড়ে রইল। শরীরে প্রফুল্লতা ; লোমকূপের ডগায় একটি স্ফূর্তিবান চাঞ্চল্য ; চকচক করছে তার চোখ। অনুপম চলতে সুরু করে দেয়। না কোনো যুক্তি নাই, কোনো হেতু নাই এই গর্তের মধ্যে বাস : ভয় ও রহস্যের সেই প্রেত-কূপের মধ্যে। অনুপম অবচেতনে শিউরে ওঠে ; চারিদিকে তাকায়।—যা নিশ্চয় তার মধ্যে মহৎ কোথায়—ব্যঞ্জনা ; আত্মার অভীপ্সাময় উন্মোচন। এই জীবন নিয়ে আমরা নিরুপায়। ঈশ্বর আমাদের অনেক কিছু দেওয়ার সঙ্গে দিয়ে দিলেন এক অবশ্য নিত্য। জীবনকে নিত্য বইতে হবে। প্রতিদিন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমরা বেঁচে থাকতে বাধ্য হব। অনুপম চলতে থাকে। পায়ের গতি স্তিমিত। চোখে ছায়া। নির্জিবতায় খিন্ন পশুর মত তাকে ক্লেদকর দেখায়। জীবন যদি হত কয়েকটি মুহূর্তের যোগফল : সাঙ্কেতিক। ধানের ডগায় সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল : উজ্জ্বল ও তৃপ্ত। তৃপ্ত ! সুন্দর ! সার্থক !

# নবম পরিচ্ছেদ

অরুণা পর পর তিনখানি ফ্লিমে নায়িকা হয়ে দর্শন দিলে। বাংলা সাপ্তাহিকে তার ছবি বেরুল। ছেলেদের মুখে মুখে তার গল্প মেয়েদের ঈর্ষাতুর করে তুলল। ছেলেরা তাকে অভিনন্দন জানালে, কাগজওলারা তাব নামে সম্পাদকীয় লিখলে। কিন্তু নিজেকে গল্পের নায়িকা হিসাবে দেখেও সন্তুষ্ট হল না অরুণা। প্রথম ছবিতে সে অভিনয় করেছিল এক পরিত্যক্তা পল্লী বধূর। গা এলিয়ে পুকুরে স্নান করবার সময় দেখা হয়ে যায় গ্রামের জমিদারের অবিবাহিত পুত্রেব সঙ্গে! আলাপ হয়। ছোকরাটি সুদর্শন। ভাসা চোখ, টানা নাক। গাছের ছায়ায় গোপন সাক্ষাৎ বধূটিকে সন্তানবতী করে তুলল। জমিদাব তনয় পিতার আদেশে তারই নির্বাচিত একটি কন্যাকে মাল্যার্পণ করতে বাধ্য হল। একদিন অন্ধকার রাত্রে সাহসে ভর করে বধূ ঘর ছাড়লে। এই সময় কেবল তাব স্বামীকে স্মবণে পড়ছিল। পরে, বধূটিকে দেখা গেল এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে, নর্তকীর অভিনয়ে। বধূটির স্বামী ছিল একজন প্রতিপত্তিশীল নাগরিক। তিনি এমন একটি রমণীর প্রতি আসক্ত ছিলেন যার কটাক্ষে যুব-জন-মহল নিত্য উচ্চকিত হয়ে উঠত, এবং সেই রমণীটিব প্রণয়পাত্র ছিল একজন সখের সাহিত্যিক। বধূটির স্বামীর দুর্বাব আসঙ্গলিপ্সা একদিন সখের ছোকবা সাহিত্যিকটির জীবন নিতে অনুপ্রাণিত করে তুলল। ছোকরা সাহিত্যিক সুবিধাবাদী। গল্পের নারী সমাজে তার প্রণয় দক্ষতার অক্ষত সুনাম ছিল। সে আশ্রয় নিলে পূর্বোল্লিখিত নর্তকীর কাছে। সাহিত্যিক সুচতুব, নর্তকী মায়াবিনী। এবং সাহিত্যিক এইখানেই প্রথম বোধ করল প্রণয়ের পবিত্র আকর্ষণ। ইতিমধ্যে যুব-জন-বন্দিত মেয়েটি তার প্রণয়াপমানে প্রতিহিংসা শানিত করে তুললো। নর্তকীর স্বামীকে উজ্জীবিত করে তুলল সাহিত্যিকের

সৎজীবনের প্রতি। সখের সাহিত্যিক খুন হল এবং সে ধরা পড়ল। নর্তকী তাকে চিনতে পারলে। খুনের অপবাধ সে নিজে নিলে, স্বামীর চরণে মাথা বেখে কাঁদলে ও ক্ষমা চাইলে। নর্তকীর জীবনটি অধ্যবসায় ও সংবমের ইতিহাস। স্বামীব পাপাচারিত জীবনের অনুতাপ, যুব-জন-বন্দিত মেয়েটিব প্রিয়-বিরহেব অনুশোচনা ও নর্তকীর ত্যাগের মধ্য দিয়ে গল্প গড়ে উঠেছিল।

পরিচালক চরিত্র বিশ্লেষণে তৎপর হয়ে কয়েকটি প্রধান জিনিষ তার লক্ষ্যে এনে দেয়। ডিরেক্টর তাকে বুঝিয়ে দেয় যে আমাদেব সমাজব্যবস্থায় মেয়েদেরকে চিরকাল অধঃপতিত কবে রাখা হয়েছে। কিন্তু এ' দেশ ত্যাগেব দেশ, সীতা-সাবিত্রীর দেশ। মেয়েটির চবিত্রে যে পদস্খলনটি দেখানো হয়েছে তাব কারণ নাকি, আমাদের সমাজে ধনজীবিদের আওতায় নারী-জীবনের একটি সূক্ষ্ম ইশারা। কিন্তু বাংলার মেয়ের বক্তের মধ্যে পতিব্রতার বীজ—দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্যেও এই মহীয়সী-বৃত্তি তার অভীষ্টে সিদ্ধি আনে। এর সঙ্গে আবো সামাজিক চিত্র বর্ণিত ছিল। যেমন, বাংলা দেশে সাহিত্যিকদের ব্যভিচারবৃত্তি, আধুনিক নব-নারীর উচ্ছৃঙ্খল যৌনাভিযান। অরুণা প্রথমে আপত্তি করেছিল পুকুর ঘাটে গা এলো করে বাসন মাজতে। দ্বিতীয়, অশ্রুসিক্ত চোখে সন্তানবতী অবস্থায় অনুনয়টি আবৃত্তি করতে। তৃতীয়, নর্তকী হয়ে সংযম পালন ও লম্পট স্বামীর পায়ের তলায় মাথা রেখে চোখের জল ফেলতে।

দ্বিতীয় বইখানি হল একটি শ্রমিক কাহিনী। একটি মিলের পাশে বস্তি। সেই বস্তিতে সর্দারেব মেয়ে পরমাসুন্দরী। সেই সুন্দবী মেয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল অরুণা। সেই সুন্দবী মেয়ের গ্রীবার ভঙ্গীতে সকলে চমকে যেত, কথার ঝাপটে মুগ্ধ হত। মিল ডিরেক্টর তার দিকে নজর ফেললে। মেয়েটি শ্রমিকদেব দুর্দশা নিয়ে ক্রমাগত গ্রীবা আন্দোলন করতে থাকে। অতঃপর ডিরেক্টর তাকে একদিন বোঝা-পড়ার জন্য ডাকলে এবং তার চোখের আয়নাতে তাকিয়ে দেখতে বললে, যে সে কত সুন্দর। সুন্দরী মেয়েটি নিঃশব্দে তার এগিয়ে-আনা মুখে একটি চপেটাঘাত করলে। ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হয়। ইতিমধ্যে জানালা ভেঙে যে ছেলেটি ঘরে ঢোকে সে একটি শ্রমিক তরুণ। মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এল

চন্দ্র-কিরণ-চিহ্নিত-বনতলে। (ফ্যাক্টরীর নিকটবর্তী বন; সেই বনে ঝরণার ধারা আছে, হরিণের ইতস্ততঃ আসা-যাওয়া ও ভাটিয়ারী গানের নেপথ্য বিহার বর্তমান). এই যুবকটি বহুদিন হতে একটী পবিত্র ভালবাসা মনে মনে লালন করে আসছে। নির্বাক সে দাঁড়িয়ে রইল। সুন্দরী মেয়েটির দ্বারা একদিন সে নির্যাতিত হয়েছিল। আজ সে হাত ধরে ক্ষমা চাইলে, তার বুকে মাথা রেখে গান গেয়ে উঠল। ছেলেটির এমন কিছু ছিল না যা' নাকি অদেয়। ডিরেক্টর শ্রমিক পীড়ন করলে; ধর্মঘট সুরু হল; মেয়েটি বক্তৃতা করলে ও জেলে গেল। জেল থেকে যখন সে মুক্তি পেল বাংলা দেশের খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে। সে তখন দেশনেত্রী। পুষ্পাভরণ-আক্রান্তা মেয়েটির সে দিন স্মরণে পড়ল না যে ক্লিষ্ট যুবকটি তার মোটরের পাশে পাশে পতাকা বয়ে চলছিল। এদিকে ডিরেক্টরের পত্নী ছিলেন একটি নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা। স্বামীর মঙ্গল কামনায় প্রায়ই তিনি ব্রত করতেন। হঠাৎ একদিন কাগজে, (যে কাগজটি তার স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে ফেলে গেছল) মেয়েটির ছবি দেখতে পেয়ে সন্দেহে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তার একটি বোন ছিল যে ছোট বেলায় হারিয়ে যায়। তিনি গোপনে সাক্ষাৎ করলেন নায়িকাটির সঙ্গে। তার চিবুক দেখলেন; বাঁ কানের ডান কোনে তিলটি পরীক্ষা করলেন তারপর গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন। শ্রমিক নেত্রী তার বোন। ডিরেক্টর সুন্দরী নায়িকার ভগ্নীপতি। এদিকে সেই অবহেলিত প্রণয়ী, শ্রমিক তরুণ, আনন্দনিনাদিত-মিলন-দিবসটিতে সেই তরুণীটির বহুকাল আগে দেওয়া স্বহস্ত নির্মিত চটীজুতা ও বাগানের রজনী গন্ধা (যে ফুল সে তার হাত থেকে খোঁপায় পরতে ভালবাসত) নিয়ে অলক্ষ্যে রাখলে তাদের দুয়ারে। সেই চটী নায়িকাকে আঘাত করল। তার স্মরণ উগ্র ও পীড়াকর হয়ে ওঠে। সব ফেলে দিয়ে ছুটে গেল ছেলেটির কাছে। তার অজস্র ক্ষমা, অগাধ স্নেহ, অভয় বাহু, সেইখানে সে চিরদিনের আশ্রয় চাইলে। ডিরেক্টর ঠাট্টা করে বললে—এবার হাত ধরলে চড় খেতে হবে না চুমু দিতে হবে।

অরুণা তর্ক তুললে শ্রমিক জীবন নিয়ে। বললে—এ শ্রমিক রূপকথা। শ্রমিক জীবন যে নিয়মানুবর্তিতায় পথ চলে তা' থেকে গল্প তৈরি করতে হলে এসব বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তারপর এখানে ধনিক ও শ্রমিকদের অর্থনীতিক দ্বন্দ্ব দেখানোর

বদলে দেখানো হয়েছে বোকা ছেলে ও চালাক মেয়ের মনেব খেলা। এই জায়গাতেই ছিল অরুণার আপত্তি। কিন্তু তৃতীয় বইখানায় অরুণা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। বইখানি বাৎসল্য-প্রধান। অরুণা কতকগুলি বই সাজেষ্ট করলে ডিরেক্টরকে। বাৎসল্য কথাটার তাৎপর্য বায়লজি ও সোসিয়লজিব দিক দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাৎসল্য,—সে বললে আসলে একটা কমপ্লেক্স। ডিবেক্টব জবাব দিয়েছিল যে সিনেমা একটা থিওরিব কারখানা নয়; সিনেমা আর্ট। অরুণা চাকরী ছেড়ে দিলে। সিনেমাকে আর্ট ভাবাব চেয়ে মাতৃত্বেব ভূমিকায় অভিনয় করা বরং সহজ। সিনেমাকে যে বাংলা দেশে আর্ট বলে চালানো হয় এ সম্বন্ধে অরুণাব কোনো ধারণা ছিল না। তার কাছে এটা ছিল একটা ব্যবসা। বেশ লাভজনক। স্থূল সময় বিনোদনের একটা রসালো উপকরণ। সে ভাবতে সিটিয়ে উঠল যে একটা অপরিসর ঘরে, নিঃশ্বাসের জমাট বাতাসে ছাগলের পালের মত একপাল অপাপবিদ্ধ নর-নারী লিবিডোর তাড়নায় ছটফট করতে করতে বিশুদ্ধ আর্ট উপভোগ করছে। অতএব সোজা সে বেবিয়ে এল ষ্টুডিও থেকে। মিউজিক ডিরেক্টর এল তার পিছনে পিছনে। তার একখানি ক্যাডিলক আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে ও ঘরে একটি মাংসল স্ত্রী আছে। এ' সবার উপর আছে মেয়েদের প্রতি দুর্বল আত্মস্বীকার। মিউজিক ডিরেক্টর তার ক্যাডিলক নিয়ে সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এল। অরুণা ইচ্ছা করলে তার গাড়ীতে চড়ে যেখানে খুসী যেতে পারে। অরুণা তার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে উঠে পড়ল। সে কেন অত উঁচু টাকার চাকরী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মিউজিক ডিরেক্টর তা' জানত। প্রডিউসার তার স্ত্রী-সম্পর্কের আত্মীয়। তার মত মেয়ে সে দেখেনি। তেজী, দৃপ্ত, ইচ্ছায় অনমনীয়। তবে সে চাকরী ছেড়ে ভালই করেছে। সিনেমার আভ্যন্তরিক আবহাওয়ায় অনেক দূষিত বীজের বিচরণ আছে, তার মতন মেয়ের পক্ষে তা-ক্ষতিকর। কারণ তার প্রতিভা আছে। নারী চরিত্র তার দেখা আছে অপর্যাপ্ত। কুড়ি বৎসর ধরে সে সুর দিয়ে এসেছে বাংলা গানে। পূরবীর অস্তায়মান বেদনা থেকে সাঁওতালী নাচের। যে কোনো স্কিমে অরুণা ইচ্ছা করলে সে নিয়ে যেতে পারে। তাকে পেলে তারা হাতে চাঁদ পায়। পতিব্রতা নারীর ভূমিকায়

তার অভিনয় নাকি অনবদ্য হয়েছিল। এক বেটি ডেভিসের একখানি বইয়ের সঙ্গে মাত্র তুলিত হতে পাবে। সে ভাল করেছে সিনেমা ছেড়ে চলে এসেছে ফাঁকা মাঠে—আকাশ যেখানে নীল আর বাতাস অবাধ ছুটোছুটি করে বেড়ায়। মিউজিক ডিরেক্টর খুসীতে ঝিকঝিক করে উঠল। অরুণার কোনো গন্তব্যস্থান ছিল না। রেডরোডের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলছিল। তৃণে-তৃণে সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে সে খানিক শুনছিল খানিক শুনছিলনা। সে এলোমেলো ভাবছিল। বাড়ী সে ছেড়েছে। তার জন্য সে দুঃখিত নয়। আশ্রয়ের জন্যও লালায়িত হয়ে ওঠেনি অরুণা। বাড়ী তার অসহ্য। বাড়ীতে থাকতে হলে সে মারা যেত। মায়ের নিঃশব্দ সর্বসহ পাগলামী আর বাবার নীতিশীল জীবন-চরিত। জীবনকে এরা কেউ জানে না। তার আনাচে-কানাচে যত মানুষকে সে দেখছে সবাইকে সে হিসেব করে বলতে পাবে, যে এরা সকলে ভ্রান্ত, অধঃপতিত। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ফাঁকি দিয়ে কিছুকাল তারা পৃথিবীকে ভোগ করে নিচ্ছে। কোনো এক ফাঁকে আকাশ এদের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে না। তার বাবাকে মনে পড়ল। নিষ্ঠায় নির্বিচল; গম্ভীর ভাবযোগ। মায়ের নিরাসক্ত বসে থাকা আর মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মুখের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া চুলগুলিকে বিরক্ত তুলে দেওয়া। তারপর, হয়ত একসময় আগুনের উদ্গারের মত সেই নির্বিচলতা ফেটে পড়ে উদ্দামতায়। ঘরের জিনিষ পত্র মুহুর্মুহুঃ চূর্ণিত হয়, শব্দিত হয়। মায়েব সেই সময়কার চেহারাটি মনে পড়ল অরুণায়। খর্ব, স্থূল মানুষটি। তরল মুখখানির উপর একটি সরল নাক। সবার উপরে নিশ্ছিদ্র কালো চোখ দুটিতে অমানুষিক জ্যোতি ঠিকরে ওঠে। কোঁকড়া চুলগুলি কেশরের মত ওঠে ফুলে। অবিন্যস্ত বসন। ঐ সময় তার মধ্যে প্রাণ আসে: প্রাণের ঘূর্ণাবেগ জোয়ার। অরুণা বাধা দিত না। নিজেকে গোপন করে সে দেখত। ঐ উদ্দাম বিস্ফোরণ তার মধ্যে হত সংক্রমিত। সে আবেগে কাঁপত। কিন্তু যেই তার বাবার শরীরের সামান্য রেখাটুকু দৃষ্টিগোচর হত অমনি সুরু হত তার শরীরকে বেষ্টন করে মায়ের এক অসহায়, অনিবার্য কান্না। শিশুর মত, পশুর মত; কাঁদতে কাঁদতে তার মা এক সময় শীতল হয়ে উঠত: স্পন্দনহীন। আবার সেই জানালার ধারে বসে থাকা একটি চমৎকার জাপানী পুতুল। এই মস্তিষ্কব্যাধি তার প্রকাশ

পায় অরুণার জন্মের পর হতে। শরৎ কি হেমন্ত কাল, হাওয়াতে যখন প্রফুল্লতা আকাশের ঘন নীল রং, সাদা সাদা মেঘগুলি আকাশে সঞ্চরণশীল তখন তাব মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত একটা সুস্থ, লাজুক, নিরাবরণ মানুষটিকে। আত্মীয়তায় তৎপর, স্নেহে উচ্ছল, সাংসারিকতায় ব্যস্ত। আর যেই বাইবের আবহাওয়ায় দেখা দিত উত্তাপ, বাতাস ভ্যাপসা হয়ে উঠত, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড সূর্য যখন জ্বলত মাথার উপর তার ভেতর ঘটত গোলমাল। তার মাকে ঘনঘন মনে পড়ছিল অরুণার। হঠাৎ তাব মনে পড়ল উৎপলকে। আহা! ছেলেটা বৃথাই আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ল। অরুণার ভাবতে রীতিমত বিস্ময় লাগে যে নিছক একটি মেয়েকে তার সন্তানের জননী করতে না পেরে কেউ নিজের জীবনকে দায়ী করতে পারে। এইখানে অরুণা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আশ্চর্য। উৎপল বলত প্রেম। বলত বেশ। গলায় লাজুক আত্মপ্রকাশ, চোখের তারায় বিহ্বল মূঢ়তা। গলার আওয়াজটি ছিল শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টি পতনেব মত একটানা, অবিশ্রান্ত ও তন্দ্রালু। —অরু, অরুণা, রুণা, আজকে আমি জানতে পেরেছি তোমার প্রতি আমার সেই ভীরু সঙ্কোচ, অস্ফুট আগ্রহ ও মৃদু অভিলাষী বিস্তার কেন? কিসের আশা? ভালবাসি। আমি ভালবাসি। ভালবাসি আমি। প্রতি নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে চাই এই কথা। ভালবাসি। ভালবাসি! আমি ভালবাসি। এই কথাটিতে আমার নির্বাণ। আমার সমাহৃতি। সমস্ত সমুদ্র মন্থনে যেমন পাওয়া গেছল এক পাত্র সুধা আমার সমস্ত জীবন মন্থন কবে লাভ করেছি চারটি শব্দ; একটি কথা; একটি নির্ভিক উচ্চারণ। কথাগুলিব মানে কি। দাঁতের মধ্যে শব্দ করে হেসে উঠল অরুণা। চকিত হয়ে মুখের দিকে তাকায় মিউজিক ডিরেক্টর। সে যেন না ভয় পায়,—মিউকিক ডিরেক্টর বলছিল। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে গেলে চাই অধ্যবসায়। সে তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবে। তার প্রতিভা বিকশিত হবে। সে উন্মোচিত হবে লাবণ্যের পাপড়ি মেলে মেলে। অরুণা খানিকটা শুনল। সে জানিয়ে দিলে যে সিনেমা করা তার জীবনের অভিপ্রায় নয়। জীবনকে সে খেলার মত নিতে চায়। সমুদ্রের চূড়ায় চূড়ায় জীবনকে ছুঁড়ে দিতে। হঠাৎ কথা বলতে পেয়ে অরুণা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তার জীবনের থিওরি কি। জীবনের সেই কল্পনায়

সে কেমন উচ্চারিত ও উজ্জ্বল। ব্যক্তিক জীবনের যথার্থ স্বরূপ কি। মানুষের সত্যিকারের সুখ-দুঃখের বিধান মানুষ তার বহির্জগতের উৎকর্ষতায় মীমাংসা করে না, করে নিজের মোহবান আসক্তিতে—ধারণায়। এই কল্পনাশীল ধারণা একটি প্রাগৈতিহাসিক স্নায়বিকতা যেখানে মানুষ আজও স্থিতিশীল। সে এই দুই জীবনে সমন্বয় ঘটাতে চায়। ইনটুইশন সে মানে না। অরুণা কেবল বাঁ-হাতের তালুটা মোচড়ায়, আর গ্রীক প্যাটার্ণের নাকটি উত্তেজনায় ফুলে ফুলে ওঠে। মুখে তাব একরাশ উত্তপ্ত আভা। সাদা দাঁতগুলি স্বল্প বিস্তৃত ঠোঁটের ফাঁকে ঝিকমিক করে মাঝে মাঝে। সূর্য তখন অস্তায়মান। লাল আভা পড়েছে সবুজ ঘাসে। তার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। আপাততঃ একটা ফ্লাট বেছে নিতে হবে। তারপরেই জোগাড় করে নিতে হবে একটি কাজ। সে অত্যন্ত দ্রুত টাকা-আনা-পাইয়ের যোগ দিতে পারে। ডিরেক্টর বললে, যদি তার আপত্তি না থাকে কিছুদিন তার সঙ্গী হিসাবে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য যতদিন না সে চাকরী পাচ্ছে। অরুণা রাজী হয়ে গেল। চৌরঙ্গীর হোটেলে খানা খেতে খেতে মিউজিক ডিরেক্টর নিজেকে সজীব বোধ করে, তার বৃদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চঞ্চলতায় চনমন করে। একটু পানীয়—অরুণার আপত্তি না থাকলে গ্রহণ করতে চাইল। অরুণা বিস্তৃত হেসে উঠল। নিশ্চয়, তার আপত্তি থাকতে পারে না ও নাই। তবে liquid has neither charm nor effect on her. সে যা' চায় তা'হল স্পর্শসহ, ধৃতিবান কোনো নিরেট অস্তিত্ব। তারা একটা ফ্লাট নিলে। হাওয়া আর আলো অনর্গল আসবে যাবে। বাঁদিকের ঘরটি অরুণা পছন্দ করলে। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝকমক করে উঠল ঘর। A nice set-up! অরুণাকে হাসতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিউজিক ডিরেক্টর। রেডিও সেট বসাবার জন্য বললে। অরুণা আপত্তি জানাল। Nasty staff! কতকগুলি মেয়ে কেবল নির্বোধ গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইবে আর সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবে সাপ্তাহিকের সম্পাদক ও কলেজের প্রফেসর। ওরচেয়ে ওডহাউস পড়া ভাল কিংবা এ্যালেন পোঁ।

অরুণা নবোদ্যমে চাকরী খুঁজতে লাগল। স্কুলমাষ্টারীতে তার ঘোরতর আপত্তি। যে পারে না সে পড়ায়। বার্ণড শ'য়ের মন্তব্যকে সে মনে মনে ভয় করে।

যুদ্ধের জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে এমন কি মেয়েলোকও নেওয়া হচ্ছে সিভিল সাপ্লাইএ। অরুণা ভাবলে, এখানে যাওয়া উচিত কি না। দেখলে, এখানে গেলে কেমন হয়। ভাবলে, যুদ্ধ এসেছে বলেই বাইরে আসবার সুবিধা পেয়েছে মেয়েরা। যুদ্ধ ফুরিয়ে গেলেই আবার গিয়ে ঢুকবে হেঁসেলে, বছর বছব ষষ্ঠী পুজো করবে। এসব সুবিধাবাদীব লক্ষণ। কিন্তু সে'ত তা' নয় সে ক্রমবিকাশ। দেখলে, ঝুরঝুরে মেয়েগুলো ফুরফুর করে আসে, ঘুরঘুব করে ঘুরে বেড়ায়। ট্রামে এমন কায়দায় ব্যাগ্ হাতে করে নৈবর্তিক তাকায় যেন তারাই এ লড়াই ফতে করবে। আবহাওয়াটা যাচ্ছেতাই রকমের মেয়েলী। দেমাক আব আহ্লাদের রসে চটচটে। অতএব সে ও'দিক মাড়াল না। সওদাগরী অফিসে ঘুরে ঘুরে সে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে যে এ' পর্যন্ত মেয়েবা সেখানে যতটুকু কাজ করতে পারে তাব চৌহিদ্দি অত্যন্ত অল্প। সেখানকার পরিমণ্ডলও সেই নারীত্বের সুগন্ধে ভরালো। পৃথক, স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত জগৎ। এ' কেন? এইখানেই অরুণার বাধে। এ' সেই একই অপমান। পুরুষ শ্রেণীর নাবী শ্রেণীর উপর সহানুভূতি, দয়া। সে রূপ দেখিয়ে মাইনে চায় না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে তৈরি। এদের ভেতর ইনসিওরেন্সের দালালিটা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। দুটো কোম্পানী তাকে ভজাতে চেষ্টা করল। তার মতন মেয়ে এ লাইনে এলে .....

অরুণা সোজা উঠলো তার ভগ্নীপতির অফিসে। তার ভগ্নীপতির প্রচুর প্রতিপত্তি আছে অফিসে। সে চাকরী দাবী কবল। তিনি প্রথমে আপত্তি করলেন। অরুণাকে নিজের বাড়ীতে আসবার জন্য অনুরোধ জানাল। কারণ তার শ্যালিকা পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কাজ করছে এটা প্রত্যক্ষভাবে চক্ষুপীড়াদায়ক। তার সম্মানকে বিপন্ন করতে পারে। বাঙলা দেশ এখনো পুরোপুরি এরকম নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। অরুণা ফুঁশে উঠল। সে তোয়াক্কা করেনা বাংলা দেশের রীতিনীতির। মেয়েরা যদি মাথায় মোট বইতে পারে, মাঠে বীজ বুনতে আর পশুচারণ করতে পারে—এসম্ব্লিতে বক্তৃতা দিতে পারে, একসঙ্গে লেখাপড়ায় পাল্লা দিতে পারে, কেন বিশেষ একটা ক্ষেত্রে তারা অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে। পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে হলে যে গায়ের জোরের দরকার

তা' তার আছে। সে স্বাধীন। সে ইচ্ছায় স্বতন্ত্র। পৃথক জীবনলীলায় উৎসারিত। ভগ্নীপতি বলে বাহাদুরি নেবার যোগ্যতা তার নাই। সামাজিক আত্মীয়তা সে স্বীকার করে না। তিনি তার সম্মানীয় পদ নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তার অফিসে না হলেও সে একটা চাকরী চায় এবং তিনি যখন তা' দিতে পারেন তখন নিছক তাকে একজন candidate ভেবে দেবে না কেন? তুলনামূলকভাবে বিচারিত হতে সে প্রস্তুত। তার ভগ্নীপতির তত্ত্বাবধানে অবশেষে সে একটি চাকরী পেলে।

অরুণা খুসীতে কেঁপে উঠল। চাকরী করতে তার রীতিমত ভালো লাগল। কয়েক মাসেই তার স্বাস্থ্য উছলে ওঠে। গ্রীবায় প্রস্ফুট রেখা ও কটিতটে ঋজুতা দেখা দেয়। চোখের চাউনি আরো সজীব ও নিকষ হয়ে ওঠে। নির্দোষ নিঃশ্বাস পড়ে উন্নত নাসিকায়। একাউনটেণ্ট তাকে ঘনঘন ডেকে পাঠায়। ইঙ্গ-বঙ্গ নারীগুলোর ঠোঁটের চামড়া লিপিষ্টিক ও গাল রুজের সিমেণ্টে পুরু হয়ে ওঠে। ছুটির পর একাউনটেণ্টের হিলম্যানে চেপে তারা প্রায়ই যায় রেস্তোঁরায়। সেখান থেকে বৈকালিক ভোজ সেরে ঘুরে বেড়ায় মাঠে কিংবা গঙ্গার তীরে; কখনো অপেরার ঠাণ্ডা আবছায়ার মধ্যে। একাউনটেণ্ট তার লোমশ হাতটি অরুণার কাঁধে রাখে, গমগম করে তার গলার আওয়াজ, প্রচুর হাসে দুজনে। অরুণা যখন হাসে মাথাটা সম্পূর্ণ ছড়িয়ে পড়ে পিছনে আর দাঁতগুলি উলঙ্গ প্রকাশ পায়। একাউনটেণ্ট অধ্যবসায়ী। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটি তার টই-টুম্বুর হলেই পাড়ি জমাবে সমুদ্রে। ফোলাফোলা ঢেউয়ের মাথায় জাহাজ আর তার উপরে মানুষ। তারা দুজনে কল্পনা করতে রোমাঞ্চ বোধ করত। অরুণাও যাবার ইচ্ছাতে যোগ দিত। এক মুহূর্তেই দেখতে পেত Barkley squareএর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। প্রশ্ন করছে হাক্সলিকে। বার্ণডশ'য়ের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। ওয়েলসকে ধমকাচ্ছে। হাত মেলাচ্ছে ল্যাস্কির সঙ্গে। শীতের কুয়াশা ঝিমঝিম করছে লণ্ডনের রাজপথে। আকাশ চোখে পড়ে না। মাথা ঢাকা দোতলা বাসের মাথায় বসে সে গল্প জমিয়েছে লেবারপার্টির ভোট নিয়ে। না, অমনি রাশিয়াটা একবার ঢুঁ মেরে যাবে। ওদের দেশের educational theoryটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অথচ একটা নতুন হাওয়া লেগেছে জাতটার গায়ে এটা ঠিক।

তাদের স্বাস্থ্যবান হাসি খোলা মাঠের উপর ছিটিয়ে পড়ে, প্রতিধ্বনিত হয়। অরুণা তাকে একদিন চা-য়ে ডাকল। তারা প্ল্যান ঠিক করবে; রুট আঁকবে খেতে খেতে। অরুণা জানালে, মিউজিক ডিরেক্টর ইচ্ছা করলে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। মিউজিক ডিরেক্টরের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। তার বাড়ীতে স্ত্রী বর্তমান এবং দুটি শিশু সন্তান। তাদের প্রায়ই ইদানীন্তন মনে পড়ত অরুণার আচরণে। বাড়ীতে জানত সে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। কেবল প্রডিউসার ছুটি নেবার সময় বলেছিল—সুবিধা করতে পারলে, ছুঁড়িটা নেড়ী কুকুরের মত ছটফটে। মিউজিক ডিরেক্টর তাকে সাবধানে কথা কইতে উপদেশ দিয়েছিল। He loves the girl. অরুণা যখন হাসে সেই হাসিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় মিউজিক ডিরেক্টর। আর ঐ ছোকরা একাউনটেণ্ট সে স্বচ্ছন্দে ওর কোমরে হাত রেখে, হাতে হাত ছুঁয়ে মাঠে এলোমেলো পায়চারী করে বেড়ায়। আচমকা ফেণিয়ে-ওঠা হাসিতে পথচারী লোকগুলিকে জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ করিয়ে দেয়। খেতে খেতে তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। আড়চোখে তাকায় অরুণার দিকে। সেই সজীব চোখ, ধারালো গ্রীবা। পলিটিক্সের উপর একাউনটেণ্ট কি একটা মন্তব্য করায় অরুণা মাথাটা পিছনদিকে ছড়িয়ে সশব্দে হেসে উঠল। পাশের ফ্ল্যাটে কতগুলি কাঁচের জিনিষ ভেঙে পড়বার শব্দ হয়। কি ভাঙল যেন ওপাশের ফ্ল্যাটে।

সেই চশমা চোখে ছোকরাটি যে কেবল সোসিয়লিজম নিয়ে বন্ধু-বান্ধব এলেই তর্ক করে। আশ্চর্য ছেলে। সাপের মত সরু গলার আওয়াজ। খালি সিগারেট ফুঁকছে আর চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ তাদের দরজা গোড়ায় সেই ছেলেটি আবির্ভূত হয়ে স্পষ্ট গলায় বলল যে তাদের আলোচনায় অনধিকার প্রবেশের জন্য সে দুঃখিত, কিন্তু অরুণা যেন কালকেই লেডল থেকে তার এই প্যাট্যার্ণের টি-সেট কিনে এনে দেয়। সেটটির দাম নিট ৩০৲ টাকা। তার চাকর পিছনথেকে এসে ভাঙা সেটটি তাদের সামনে রেখে গেল। সকলে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ছোকরাটির মুখ গম্ভীর, চুল সোজা উপর দিকে তোলা। গেঞ্জির ভিতর থেকে চওড়া বুকের ছাতি উঁকি মারে। কারণ, এই ক্ষুদে চাকরটি কলকাতার একটি মাত্র চাকর

যে মনিবের পকেট থেকে মণিব্যাগের ভার কমাতে জানে না এবং অনেক তল্লাস করে তাকে খুঁজে বার করতে হয়েছে। আজকে যখন চায়ের সেটটি পরিষ্কার করতে নিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ অরুণার অমানুষিক হাসি তাকে চমকে দেয় এবং সেটটি ভূ-চুম্বন করে বিধ্বস্ত হয়। এবার অরুণা সবেগে হেসে উঠল। মাত্র ত্রিশ টাকা। অরুণার সপক্ষেও বক্তব্য ছিল। তার তিনটি রাত্রির ঘুম ছোকরাটির তীক্ষ্ণ গলার মেটিরিয়ালিষ্টিক ব্যাখ্যা নষ্ট করেছে। তারপর তার ব্যাখ্যার ভিতর এখন কতগুলি যুক্তির গলদ ছিল যার ফাঁক ভরাতে গিয়ে অফিসের একটা গুরুতর কাজ নষ্ট করেছে। সেটা তার মাহিনা থেকে বরবাদ হবার সম্ভাবনা প্রচুর। রাত্রে ঘুমের জন্য একটা পেটেণ্ট কিনতে এবং অফিসের ক্ষতিপূরণ করতে বোধ হয় তিরিশ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। মাস কাবারের শেষে সে ব্যালেন্স-সিটটা তার কাছে দাখিল করবে'খন। টি-সেটটি এখন সবিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল কিংবা সে যদি ইচ্ছা করে তাদের সঙ্গে চায়ে বসতে পারে। চশমা-চোখে ছোকরা বসে গেল। তার যুক্তির ভিতর গলদ। ছোকরাটি দৃঢকণ্ঠে দাবী জানালে। তুমুল তর্ক সুরু হয়। ছোকরাটি হাসতে হাসতে বললে যে অরুণা আসলে মার্ক্সের পন্থাই জানে না। কাউটস্কি যে ভুল করেছিল সেও নাকি ঠিক সেই ভুল করছে। সোসিয়লিজম মার্ক্সের একটা ব্রাঞ্চ বটে তবে মার্ক্সিজিম সম্পূর্ণ আলাদা। আর সেটা তাদের প্রয়োগ-নৈপুণ্য। মার্ক্সিষ্টরা বস্তুতন্ত্রের আওতায় ঘটনায় বিশ্বাসী। সোসিয়লিষ্টরা বস্তুতন্ত্রের দৌলতে ইতিহাসের নিরাসক্ত চক্রে অবস্থান করে। ইতিহাসের passive forceটা তাদের থিওরির খুঁটি। দু-দলের তফাৎ হচ্ছে ডায়লেকটিকে। মার্ক্সকে রেস্‌পেক্টটেবল করবার চেষ্টা করছে সোসিয়লিষ্টরা। তারা অপেক্ষা করতে ভালবাসে। তারা ইতিহাসের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক। একাউনটেণ্ট জিজ্ঞাসা করলে সে মার্ক্সিষ্ট কি না। ছোকরাটি চশমার মধ্য দিয়ে ভ্রূ কোঁচকায়, তীক্ষ্ণ গলায় বলে যে, **he thinks that Marx is allright.**

মিউজিক ডিরেক্টর এতক্ষণ নিজেকে অপাংক্তেয় ভাবছিল। নিছক রেখাবের আওয়াজ থেকে যে কত রাগের পার্থক্য বোঝা যায় সাকরেদকে বুঝিয়ে দেওয়া ঢের সহজ। কিংবা নট-নারায়ণের ঘরের খবর। ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে

সে। মনে মনে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে মিউজিক ডিরেক্টর। সে যেন অপাংক্তেয়; নির্বাসিত জীব। অথচ তার মাসিক মুনফা এই সব কটার চেয়ে বেশী। তার সুরের প্রশংসা দু-পয়সার দৈনিক হতে চার পয়সার সাপ্তাহিক পর্যন্ত। অরুণার উপর এক প্রবল ঘৃণায় মাঝে মাঝে সে ছটফট করে। গানে তার সুর না থাকলে ফিল্ম মার খায়। রেডিও মুখরিত তার গানের সুরে। ছেলেরা প্রেম জানায় তার জনপ্রিয় গান গেয়ে, মেয়েরা বিরহ প্রকাশ করে তার hit-songএর মারফৎ। থেকে থেকে তাকায় অরুণার দিকে। অনেক টাকা খরচ হল। কি আছে মেয়েটার। বিশ্লেষণী প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চল হয়ে অরুণার দিকে তাকায়। গাইতে জানে না। প্রচুর ও পুষ্ট নিতম্বের ধারালো রেখায় কোনো আকর্ষণ জমিয়ে তুলতে জানেনা। এক পরিত্যক্ত পরাজয়ের মধ্যে থেকে তার ভারী নিঃশ্বাস পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য সুন্দর। একটি গাছে সদ্য-স্ফুটিত সবুজ পাতার মত জ্বলছে যেন। মাথাটা পিছন দিকে ছড়িয়ে যখন অনর্গল হেসে ওঠে। অধরের মৃদু পরিমিতি আর কাঁধের সুডৌল নমনীয়তায় কি উচ্ছল মেয়েটি ওর সকল হৃদয়হীনতার উপর। মিউজিক ডিরেক্টরের মধ্যে ক্ষোভ দুঃসহ ও উৎপীড়িত হয়ে ওঠে। শারীরিক কামনা তার মধ্যে বলবতী হয়। আর অনর্গল সে বকছে। মার্ক্স, ইনডিভিডুয়েলিজম, রাসেলের সঙ্গে কি নিয়ে আলোচনা করবে তার খসড়া। সব সময় সে কথায় অস্থির। সেই অকথ্য কথায় মরীয়া হয়ে উঠল মিউজিক ডিরেক্টর।

শুতে যাবার আগে অরুণার পরিচ্ছদ পরিবর্তনের আওয়াজ পেলে মিউজিক ডিরেক্টর। তার নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘড়ির তালে তালে। কান পেতে সে শোনে। অরুণা শোবে এবার। শুভ্র শয্যায় সে কল্পনা করলে তার উন্মুক্ত, বিস্তৃত শরীরটি। একটা সাদা রেখার ঢেউ। ধীরে ধীরে এগোয় মিউজিক ডিরেক্টর। চুলগুলো এলোমেলো। হুইস্কি না পড়লে তার মধ্যে উত্তেজনা আসে না। দরজায় key দেবার সময় অরুণা দেখল নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছে মিউজিক ডিরেক্টর। সে হেসে উঠল। ঘুম আসছে না—না কলিক? তার চোখ অত লাল কেন? হুইস্কি তার মতন বিগত স্বাস্থ্যে খুব উপকারী নয়। অরুণা তাকে ঘরে ডাকল। সে ছোকরা মার্ক্সিষ্টের সঙ্গে কাল ফের তর্কে নামবে। কতগুলো

নতুন data পেয়েছে। আসলে মার্ক্সের ব্যাখ্যায় যতটুকু এ্যাপ্লিকেবল ততটা নিয়েছে সোসিয়লিষ্টরা। বাকীটা থিওরী। থিওরীতে যে মার্ক্স খুব নির্ভুল নয় সে সম্বন্ধে নতুন কতকগুলো angle থেকে ছোকরা মার্ক্সিষ্টকে আক্রমণ করবে। সে যেন কালকেই তার লিষ্ট অনুযায়ী কতকগুলি বই এনে দেয়। মার্ক্সের গোটা চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে একটা অনুস্বর আছে। সেটি খাঁটি মার্ক্সিষ্ট বলে যারা পরিচয় দেয় তারা ধরতে পারে না। capitalism বা bureaucracyর আওতায় সব জিনিষের বিকাশ এক রকম হয় না। তার government, exploitation, race-culture, mass-psychology ইত্যাদির উপর বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণী সংগ্রামগুলো নির্ভর করে। সুতরাং এ্যাপ্লিকেবিলিটিতে তফাৎ ঘটতে বাধ্য। সোসিয়লিজম ঠিক পথ। ইতিহাসের ক্রমানুবর্তন ও স্থান কাল মানে।

মিউজিক ডিরেক্টরের মাথায় গণ্ডোগোল পাকিয়ে যায়। নিজেকে যথাসাধ্য চেষ্টায় তরল হয়ে যেতে দেয় না। উত্তেজনার বিন্দুতে দৃঢ় করে রাখে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। স্থির চোখে অরুণাকে দেখে। এক সময় সে বলল যে, সে কিছু বলতে চায়। অরুণা আনমনে তাকাল। সে তাকে ভালবাসে। এই ভালবাসার আবেগে সে মরে যাচ্ছে। অরুণার কি চোখ নাই, সুন্দর বুকের তলায় কি প্রাণের কোনো স্পন্দনই নাই। সে কি বোঝেনা কিছু। সে তাকে চায়। অরুণার জন্য সে সর্বস্ব দিতে পারে। তার প্রাণকে তুচ্ছ করতে পারে। সে কি কিছুই বুঝতে পারে না। তার শরীরে উত্তেজনা ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ওঠে, স্বর দুলতে থাকে উদ্বেগে। কিন্তু চোখ এক মুহূর্তও সরিয়ে নেয়না অরুণার মুখ হতে। আর এক সময় সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আর্তনাদের মত নিজেকে ছুঁড়ে ফেললে অরুণার কোলে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বিহ্বল অরুণা তার মাথাটা কোলে নিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকে। বুঝতে পারে না সে কি করবে। একটা সবল, সুস্থ লোক মায়ের কাছে শুতে না পাওয়া শিশুর মত মেয়েমানুষের কাছে শুতে না পেয়ে কাঁদতে পারে সে এই সর্বপ্রথম দেখল। দেখে হতচকিত হয়ে গেল। হঠাৎ অরুণা অনুভব করল মিউজিক ডিরেক্টরের একটা হাত তার শরীরে অসহায়ের মত কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর সমস্ত শরীরটা তার কোলের মধ্যে বেগবান করে তোলবার চেষ্টা করছে।

সবেগে লাফিয়ে উঠল অরুণা। ধাক্কা খাওয়া বলের মতন মিউজিক ডিরেক্টরের দেহটি ছিটকে পড়ল। দাঁতের মধ্য দিয়ে অরুণার ইংরিজি গালাগাল সাপের মত হিসহিস করে ওঠে। দ্রুত জামার কলার চেপে ধরল। হঠাৎ দরজা গোড়ায় ছোকরা মার্ক্সিষ্টকে দেখা যায়। পাশের ঘরের শারীরিক কলরব ও অরুণার ইংরিজি গালাগাল তার কানে গেছল।

—যুযুৎসু প্র্যাকটিস করছেন। দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে মার্ক্সিষ্ট বলল,—বাঁ কাঁধটা ভদ্রলোকের বুকের সঙ্গে আটকে নীচু হয়ে একটা হেঁচকা টান দিন, ওকে বলে সাইড্‌থ্রো। অরুণা তার জামা ছেড়ে দিয়ে সোজা দাঁড়াল। তার ধারালো মুখে রক্ত উঠে এসেছে। ওপরকার দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁটটি চাপা। ছোকরা মার্ক্সিষ্ট আরো একটু এগিয়ে এল। কৌতুকে তার চোখ চকচক করছিল। —কিংবা, বাঁ-হাতটা সামনে রেখে ডান হাত দিয়ে উল্টে মারুণ দাড়ির তলায় একটা ঘুসি। নক্‌আউট করবার এ একটা চমৎকার কায়দা। দাঁত থেকে ঠোঁটটা ছেড়ে দিয়ে রক্তাভ একটু হাসল অরুণা।

বাইরে বেরিয়ে এসে মিউজিক ডিরেক্টর একবার থমকে দাঁড়ায়। এতক্ষণের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসটি এইবার বেরিয়ে আসে। ভয়ানক শূন্য মনে হয়। তার মধ্যে কিছু নাই। রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে তার শরীরে। আশ্চর্যরকমের বিবর্ণ তার মুখ। ফ্যাকাসে। রক্তশূন্য চোখে অনেকক্ষণ সেই রাত্রির অন্ধকার পথে তাকিয়ে থাকে। একটা ফিটন যাচ্ছিল। উঠে বসল। পদ্মপুকুর। সেইখানে তার বাড়ী। মাঠের শীতল হাওয়ায় অনেকটা সুস্থবোধ হয়। অনেকক্ষণ বাদে আবার নিজেকে সে বুঝতে পারে। একমুহূর্ত চোখটা চকচক করে ওঠে, জ্বালা করে ঝাপসা হয়ে আসে। নিঃসহায় বেদনায় তার সমস্ত চেতনা নিঃঝিম হয়ে পড়ে। বাড়ীতে এসে কড়া নাড়ায় স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। তার স্ত্রী কড়া নাড়ার আওয়াজ চেনে। তার স্ত্রী চোখে আঁচল চাপা দেয়। মাংসের স্তূপে ভারী ও মজবুত হাত দুটি নির্বাক ও উপবিষ্ট মিউজিক ডিরেক্টরের গলায় চাপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। কেন সে চলে গেছল। কি সে করেছে। তার শরীরে কি মমতা নাই। তাকে কি ভাল লাগে না। কিন্তু বুলু ধুলু—সন্তানের ওপর যার স্নেহ নাই সে

কি মানুষ। সে জানে বায়স্কোপের কোন মেয়েকে নিয়ে এতদিন সে ছিল। মিউজিক ডিরেক্টর শুনল। রাত তখন অনেক গভীর। সেদিন রাত্রে স্ত্রীকে এত আদর করে যে স্তূপীকৃত মাংসের মধ্যে তার নিঃশ্বাসের আগম-নির্গম ব্যাহত হয়। বিবাহ রাত্রিটিকে বারবার মনে পড়েছিল তাদের। সেই রূপোর মত রাত। আর নরম, ঘন, মৃদু একটি মেয়ে। দলিত ফুলের গন্ধ কোথা থেকে ভেসে আসছিল।

—কি হয়েছে তোমার। বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে।

কিছু হয়নি তার। সে ভালবাসে। তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে কোন ক্ষোভ রইল না। সেই প্রশান্ত, পরিপূর্ণ, গভীর রাত্রিতে একটি স্বপ্নহীন ঘুমে শরীর তার অচেতন হয়ে রইল।

* * *

ছোকরা মার্ক্সিষ্ট খানিকক্ষণ অরুণার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ অরুণার লজ্জা এল। সে লজ্জায় হাসল। মনে মনে ছবিটা আঁকবার চেষ্টা করলে। মার্ক্সিষ্ট জিজ্ঞাসা করলে তার ঘুম পেয়েছে কি না। অরুণা ঘাড় নেড়ে জানালে না, তার ঘুম পায়নি। ছোকরাটি গল্প করবার অভিপ্রায় জানাল। এরপর ঘুমোতে চাইলে স্বপ্ন দেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। অরুণা খানিকটা তার অবস্থাকে কাটিয়ে উঠেছিল। সে জানালে যে জীবনে সে স্বপ্ন দেখেনি। সুতরাং মার্ক্সিষ্ট জানালে তাকে সে দলে পেতে চায়। রাত্রিটা তারা জানালার কাছে গল্পে কাটিয়ে দিলে।

# দশম পরিচ্ছেদ

একটি বইঠাসা ঘরের মধ্যে যদি বাইরের নীল আকাশ থেকে কোনো অলস মধ্যাহ্নে একটি ভ্রমর ঢুকে গুনগুণ করে যায় সেই অবরুদ্ধ লাবণ্য বাষ্পের মত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সুজাতাব মনেও তেমনি চিন্তার একটি অশবীরী রঙ ধরল। তিরিশের উজ্জ্বল সংখ্যাটি পেরিয়ে সব মেয়েই একবার তাকায় পিছনে। সুজাতাও তাকাল। তার বয়স ঠিক তিরিশের চূড়ায় অপেক্ষামান। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটএর উপর একটি বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে পর্দাটি তুলে সে দাঁড়িয়েছিল। তার মন গুনগুণ করছিল। মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ রোদ রাস্তায় ছড়ানো। সে গরাদ ধরে বাইরে তাকিয়েছিল। তার জীবনের ধারাবাহিকতায় কোনো বিরোধ কখনো আসেনি ও ছিল না। যা' পেত তার বাইরে যা' না পেত তা' নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা তার স্বভাব ছিল না। কলকাতায় কিছুদিন হল সে এসেছে। চোখ দুটিতে তার আরামেব স্নিগ্ধ আলো। অনটনের শিরাগুলি স্ফীত নয়। সে পরিপূর্ণ ঠাসা ও নিরেট। জীবনে তার সঙ্গতি ছিল অভাব ছিলনা। নিজেকে তার ভয়ানক ভালো লাগত। এখনো লাগছিল। জানালার গরাদ ধরে তাকিয়েছিল আকাশের উত্তরকোনের দিকে। মেঘের গায়ে আঘাত লেগে বাদামী আলো সেইখানটায় ফেটে পড়েছে। নানা আকৃতির মেঘগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চরমান। সেই দিকে তাব সুন্দর চোখ দুটি তুলে দাঁড়িয়েছিল। কোনোটা সিংহের মুণ্ডের মত, কোনোটা পাহাড়ের চূড়ায় হরিণশিশুর মত, কোনোটা বা চুল কাঁপানো মেয়ের মত। ঝিরঝির করে হাওয়া আসছিল। শিথিল হাতে সে চুলগুলিকে তুলে দেয়। জীবন তাকে কোনোদিন ঠকায়নি। প্রত্যেকটি মুহূর্তে, প্রত্যেকটি

উচ্চারণে তার সজীব মমত্ববোধ: প্রাণবানতা। প্রাণেতে উষ্ণ সে। অথচ সে বুঝত। তাব সহজে বোঝবার একটি প্রবৃত্তি ছিল আর আশৈশব এই বৃত্তিটিকে সে তার চবিত্রে পালন কবে এসেছে। তার চরিত্রে একটি সমন্বয় ছিল। সাধারণ ছাড়া তার জীবনে কখনো কিছু ঘটেনি। সংসারের আয়তন ছিল অল্প। সুখী, নিটোল, মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে সে। কোনো বাধ্যকতায় কিংবা অবিমৃষ্যকারিতায় সে জীবনে একটি মুহূর্তও চঞ্চল হয়নি। পুরানো দিনগুলি তার মনে পড়ছিল। হাসি দিয়ে ঘেরা, আলস্যে বিস্তৃত, স্বচ্ছন্দতায় উন্মুক্ত। তার উন্মুক্ত মন নিয়ে সে সামনে তাকাল। কদাচিৎ দু' একটা স্কুল কলেজেব ছেলেদের দল চলে যায়। আর হঠাৎ-হাসির-ঝাপটায় দুপুরটা রিনবিন করে বেজে ওঠে। বিন্দু বিন্দু করে তাব জীবনে এমনি একটি স্পর্শশূন্য গভীরতা জমে উঠেছিল। তার সত্তায়, তার মাধুর্যে তার আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ চোখে সেই গভীরতা ছিল স্ফুবমান। এই গভীরতায় সে অখণ্ড ছিল। সুজাতা বুঝত। তার অবাধ অনুভূতিতে বোধ কবতে পারে সবাইয়েব মতন সে নয় আর তার মত সবাই নয়। আব এই প্রকৃতিগত স্বচ্ছন্দশীলতায় নিজেকে সে অতি সহজে পৃথক করে নিতে পারত। তার মধ্যে কোনো অসূয়া ছিল না। সে কেমন করে যেন বুঝত যে এই স্বাভাবিক। পায়ের তলাকার মাটি তার সমতল। মাথার উপর আকাশ সূর্য-সিঞ্চিত। চোখের সামনে যে পৃথিবী সে দেখতে পেত তা' আনন্দময়। এই ভালো। অর্থাৎ তার জীবনে সুখ ছিল, সন্তোষ ছিল, বিপত্তির অবকাশ ছিল না। বিয়ে না করেও তার অসুখ ছিল না, বিয়ে করেও সে ডগমগ করে উঠল না। কারণ গ্রহণ করবার শক্তি ছিল তার অপরিসীম। মানুষকে সে চিরদিন আনন্দ দেয়। যে কোনো দুঃখ ও অভাববোধ তার ছোঁয়ায় ছন্দবান হয়ে ওঠে। তার মনটা বাষ্পের মত। আমের মত তার মুখ। থুতনির দিকটা একটু চাপা। দীর্ঘ ও গৌর কপালের উপর তার সজীব চোখ আশ্চর্য শান্তিদায়ক। বিবাহকে সহজেই স্বীকার করে নিলে স্নেহে ও সহানুভূতিতে। সবার মধ্যে সে একটা জায়গা পেল; সবার সম্মতিতে অথচ সকলের থেকে পৃথক। সবাই তাকে জানত। সে বিচ্ছিন্ন, সে পৃথক,

সে চিহ্নবান। মমতা ও মাধুর্যে আবিষ্ট মেয়েটির প্রতি এক অনন্নুভূতনীয় অপরিচয়তা; কিন্তু স্বীকার্যমান। তার স্বামীও তা' জানত। বিকাশও তা' জানে। বিকাশের জন্য সে অপেক্ষা করছিল। কলকাতায় আসবার কথা তাকে জানিয়েছিল চিঠিতে। কেবল তাকে যে জানে না সে প্রসূন। তার জীবনে প্রসূন একটা অনুভূতি, প্রসূন একটা জগৎ, প্রসূন একটা উন্মোচন। এই জগতকে সে নিজেও জানত না। জীবনের বাইরে জীবনের কোনো স্পন্দন সে কোনোদিন পায় নি কেবল প্রসূন তাব দেহেব মধ্যে যেদিন দুলে উঠল সেদিন ছাড়া। বুদ্ধিতে পৌছবার আগেই অনুভূতিতে সে স্বীকার করে নিত। অনুভূতির শূন্যতায় বুদ্ধির হ'ত উপস্থাপন। কিন্তু একদিন সে উপলব্ধি করল। তার কাছে জীবনের সুরু সেই দিন। বিস্ময় আর ভাবনা আর উদ্বেগ। আব সবার উপরে তার সর্বব্যাপী যন্ত্রণাকর শিহরণ। তার জীবনে সেই প্রথম উন্মাদনা। বিকাশের পথ চেয়ে চেয়ে প্রসূনের কথাই ভাবছিল এতক্ষণ। তার শরীরের মধ্যে যে শরীর তা-কত নরম, উষ্ণ। প্রসূন ঘুমাচ্ছিল। সুজাতা চোখ ফিরিয়ে তাকাল সেই দিকে। ঠোঁট দুটি ঈষৎ আলগা। সাজানো দাঁতের সারি। মুক্তোর মালা। একবার ইচ্ছা হল তাকে ছুঁতে, জাগাতে, তাকে নিয়ে খেলা করতে। হঠাৎ একটা শব্দে সে চোখ ফেরাল পথের দিকে। রাস্তায় ছায়া দীর্ঘতর হয়ে এসেছে। স্কুল ও কলেজের ছেলেদের ভীড়ই বেশী। টুকরো টুকরো কথাব আওয়াজ হাসির শব্দ তাব কানে আসছিল। হাসি তার এত ভাল লাগে। সরল, উন্মুক্ত, ধ্বনিময় হাসি। প্রসূন যখন হাসে! প্রসূনের হাসি মনে পড়ে তার ঠোঁটে একটি লঘু ও তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। সরল নাক আর চোখের তারা দুলে দুলে ওঠে। চোখের ঘন পাতাগুলি দপদপ করে। সুন্দর! স্পন্দমান! সে চোখ ফেরায় আকাশের বাদামী কোণায়। মেঘগুলি অপসৃত। নিষ্ঠুর নীল সমস্ত আকাশে ঝিলিক মারছে। তার স্বামীর কাছে সে কৃতজ্ঞ। আর তাই যখন তিনি আসামের কোনো জঙ্গলে বন-জরীপের কাজে হঠাৎ কয়েকদিনের বন্য-জ্বরে মারা গেলেন হতচকিত হয়ে পড়েছিল সে। স্বামীকে তার ভাল লাগত। কারণ স্বামীর কাছে তার কোনো দাবী ছিল না। তার স্বামী নিজের সংসার থেকে পৃথক ছিলেন।

কারণ বিস্তাবস্থায় তিনি এমন একটি মেয়েকে বিবাহিতা পত্নীর সম্মান দিতে চান যে সেই দুঃসাহসিকতাকে স্বীকার করতে গেলে তাদের বহুকালের পারিবারিক সম্মান বিপন্ন হয়ে উঠত। তিনি সমাজ ও সংসারের মুখের উপর মেয়েটিকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প করে সংবাদপত্রে সমাজ সংস্কার নিয়ে যখন প্রবন্ধ লিখবেন ভাবছিলেন সেই সময় কোনো অনিবার্য কারণে মেয়েটি তাকে পরিত্যাগ করে। নিছক প্রতিশোধের জন্য তিনি অর্থনীতিক অবস্থায় অনেক হীন সুজাতাকে বিবাহ করেন এবং ঘরে ফিরে যাননা। যখন তিনি দেহপাত করলেন তখন দেখা গেল জীবদ্দশায় অর্থনীতিক স্বচ্ছলতা ভবিষ্যতের চিন্তার কারণ। তিনি জীবনকে সুখে কাটাতে চেয়েছিলেন। সুখ মানে তিনি বুঝতেন খুসী। এবং তিনি এত সুখী হয়ে উঠেছিলেন যে তার জীবনের বাইরে অন্য কোনো কিছু ভাববার অবকাশ পাননি। Life insurence এবং provident fundএর টাকাটা সুজাতা পায় এবং পুনরায় তার দেবর যখন তাদের সঙ্গে থাকবার অনুরোধ জানালে সে রাজী হয়ে গেল। তার দেবর রেলকর্মচারী। ইতস্ততঃ তাকে চাকরী নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় এবং সেই সঙ্গে সংসারটিও। প্রথমে একটু বিচলিত হয়ে গেছল এই নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে। কিন্তু ক্রমশঃ তার ভালো লাগতে থাকে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। অনেক সূর্যের স্বাদ, অনেক সাগরের বায়ু আর পাহাড়ের ধূসর সংলেপ তার সন্তানটির সঙ্গে তার পরিচয় বৃদ্ধি করেছে। বড়মা বলে তাকে ডাকে সবাই। ঐ ডাকটির মধ্যেই সে পরিচিত। তার বাবা তাকে ডাকত বড়মা বলে। তিন বোনের মধ্যে সেই বড়। শ্বশুর বাড়ীর সূত্রেও বড়বধূ। নামটা কাজে কাজেই বহাল ছিল। সেই নামেই সে চলে এসেছে। বিকাশও তাকে ডাকত বড়মা বলে। সুজাতা ( আমরা এখন থেকে কখনো সুজাতা, কখনো বড়মা অভিব্যক্তির সুবিধা হিসাবে ব্যবহার করবো ) একদিন আপত্তি করেছিল। বিকাশ বলেছিল যে তার চোখের ছায়ায় এমন একটি সম্পূর্ণ শান্তি আছে যা' আমাদের বিভক্ত চরিত্র-গুলিকে ঢেকে দেয়। তার কাছে সকল ঢাকা পড়ে। কোনো বিশেষ শব্দ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আবেগের উত্তাপে তার সান্নিধ্য অর্থময়।

*　　　　*　　　　*

বিকাশ যত কথা মনে মনে তৈরি করতে করতে আসছিল এক মুহূর্তে সুজাতার সামনাসামনি হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের পাতা দুটো নুয়ে পড়ে। আজকে সকালে সে একখানা চিঠি পেয়েছিল। সুজাতা কলকাতায় আসছে। কারণ তার দেবরের কর্মস্থল কলকাতায় পরিবর্তিত হয়েছে। কিছুদিন থাকবে এইখানে। বড়মা আসছে। সুজাতা। ভাবতে বিকাশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশ্চর্য! কতদিন সে তাকে দেখেনি। আর না দেখে সে ছিল কেমন করে। সুজাতাকে তার মনে পড়ল। দীর্ঘাঙ্গী। শক্ত করে বাঁধা চুল। চওড়া কপাল। চিন্তাবিষ্ট হলে দুটি রেখা পরপর ওঠে ও পড়ে। সুন্দর দেখায় তাকে সেই সময়। উজ্জ্বল, মসৃণ, নিরায়ত চোখ দুটি। অনর্থক লাবণ্যে পীড়িত নয়। দাড়ির দিকটা একটু চাপা। কমলালেবুর মত। বিকাশ বলত পৃথিবীর মত। বড়মা পৃথিবীর মত। সুজাতা হাসত।

সেইদিন তার মনে পড়ে যেদিন অনেকের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট করে। সে তাকে আবিষ্কার করেছে। কলম্বাসের মত। উত্তরমেরুর মত। বড়মা তার আবিষ্কার। আবিষ্কারের মত অপরূপ বড়মা। সুজাতার স্বামী ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। অনেকদিন হতে এই পরিবারটির সঙ্গে তাদের জানাশোনা। সুজাতার শ্বশুরবাড়ী ও তাদের দেশ একই জায়গায়। দেশটুকু দুপক্ষেরই ঘুচে গেছে, পরিচয়টাও অনেকদিনের অব্যবহারে পলকা, তবু সেই পরিচয়ের শাখা-প্রশাখা ধরে তাদের চেনা-শুনা। বিকাশ তখন চাকরীর সন্ধানে প্রায়ই আসতো যেত। সুজাতাকে সে দেখত; ভালো লাগতো। হঠাৎ একদিন তার হাতে রবীন্দ্রনাথের বলাকা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

—কি পড়ছেন।

সুজাতা তার চোখের সামনে বইটি প্রসারিত করে ধরে।

—রবীন্দ্রনাথ কেমন লাগে।

সুজাতা আলগা হাসে। সেইদিন হতে তারা ঘনিষ্ট হয়। তাদের পরিচয় বেড়ে উঠল কবিতার সারথ্যে। রবীন্দ্রনাথ হলেন তাদের মাধ্যমিক আকর্ষণ। কবিতার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে দেখত।

বিকাশকে ঘরে বসিয়ে চা আনতে গেল সুজাতা। বিকাশ স্থাণুর মত বসে থাকে। তার মন বাতাসে ভাসে। ঘরটি অনতিবৃহৎ। গৃহস্থালীর সামান্য দু'একটি টুকিটাকী। জানালার কোলে পড়বার একটি টেবিল। সাদা ওড়না দেওয়া। মাঝখানে জরির প্রজাপতি আঁকা। পাখাগুলোয় নীল সুতো। বিকাশ সেইখানে বসেছিল। রাস্তার উপর বাড়ীটি। জানালাটা খোলা। তেমনি আছে বড়মা। ভাবছিল বিকাশ—কেবল আরো একটু দীর্ঘ হয়েছে—চোখ দুটিতে আরো ছায়া, আরো স্নিগ্ধ।

* *

ঘরেতে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বিকাশের কোলে উপুড়করা একটা বই। একটু দূরে বসে সুজাতা। সাদা শাড়ি তার শরীরে; পাড়ের কাছটা একটু চিত্রিত। খানিক আগে সে একটা কবিতা পড়ছিল। ঘরের মধ্যে সেই সুর সন্তর্পিত। ঘরের ম্লানায়মান ধূসরতায় তাকে দেখায় একটা সাদা রেখার মত।

—আলোটা জ্বেলে দাও।

—থাক না, বেশ'ত অন্ধকার; সাপের মত তোমার শরীরকে জড়িয়ে রেখেছে।

বিকাশের স্মৃতি উপ্ত হয়। সে ঘন হয়ে ওঠে তার স্মরণের মধ্যে।

* *

ফাগুনের অপরাহ্নে আকাশে হাওয়া বইছে লঘু, ঝিরঝিরে। ছাদের উপর তাদের কবিতা আলোচনা চলেছে। বিকাশের ভাল লাগত টমাস হার্ডি। বড়মার প্রিয় কবি ছিল হপকিন্স। স্ব-স্ব কবির পক্ষে তাদের যুক্তি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিংবা কোনো দিন তারা গল্প করত। পরচর্চা। জেরমের গল্প সুজাতার খুব ভাল লাগত। সুজাতা হাসত।

জল পড়ছে। শার্সিতে আওয়াজ বাজছে জলের। বিকাশ ভিজতে ভিজতে ঢুকল।

—নিতীন বাবু আছেন। নিতীন বাবু সুজাতার স্বামীর নাম।

—চাকরী ভক্তি তোমার প্রশংসনীয়। সুজাতা জানত সে আসবে।—কাল এলে না কেন? একটা চাকরী খালি ছিল। লোক নেওয়া হয়ে গেল।

—অতএব ইয়েটস’ও দোকানে ফিরে চলল।

অনেক ভুলে যাওয়া দিন তাকে নেশার মত জড়িয়ে ধরে। সুজাতা চা নিয়ে এল। কৃশ ও দীর্ঘ শরীরটিকে বেষ্টন করে সাদা শাড়িটি উঠেছে চুলের উপর। ললাটের উপর একটু আনমিত।

পাঁচ বৎসর পরে সুজাতার সঙ্গে আবার তার দেখা। ‘পাঁচ বৎসর’ বিকাশ ভাবছিল, এই পাঁচ বৎসরে কতগুলি দিন। প্রত্যেকটি দিন তাকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সেও সরে গেছে। তবু সুজাতা সরে যায়নি। সেই নিরায়ত চোখে লাবণ্যবান ঋজুতা ; চওড়া কপাল আর সূচালো হয়ে আসা আমের মত মুখাবয়ব।

—কি করলে তুমি এই পাঁচ বৎসর : দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক হয়ে উঠেছ নাকি।

বিকাশ অল্প একটু হাসল।—কেমন লাগল দেশ বিদেশ।

দেশ বিদেশের আলগা গল্প চলে। বিকাশ কি লিখলে, কত লিখলে। তাদের কথা বারে বারে ছেদ পড়ছিল। সহজ হবার জন্য দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করে। হঠাৎ এক সময় বিদেশের সামান্য ঘটনা নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠবার, কিংবা বিকাশের কোনো লেখা নিয়ে উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করে, হাস্যকর ভাবে পরস্পরের কাছে লজ্জিত হয়। আবার মাঝখানে পাঁচ বৎসর।

পাঁচ বৎসর! মাঝখানের এই সময়ের ব্যবধান পেরিয়ে ছোঁবার চেষ্টা করল বিকাশ।

ছোট জা’ এসে নানা কথা কইলে। খর্ব, শীর্ণ, মাতৃত্বপীষিত নারীটি। স্ফীত নাসারন্ধ্র। কেমন আছে সে। কত টাকা মাইনে পায়। তাদের বাড়ী একদিন যাবে। কলকাতার যেন সবই পালটে গেছে। কবে তার বিয়ে হবে। আজকাল ছেলেরা বিয়ে করতে কেন নারাজ। তার কথার শেষ নাই। অবিশ্রান্ত বলে যায়। বিকাশ সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়। মাঝে মাঝে তাদের কুশল উচিত ভেবে জিজ্ঞাসা করে। বিকাশ এক সময় সুজাতার ছেলে সম্বন্ধে কথা কইতে সুরু করে। চমৎকার ছেলেটি। বিদেশের জল বায়ুতে পুষ্ট ও পরিপূর্ণ।

—কি নাম দিলে।

—কি নাম দিই বল'ত।

বিকাশ ভাবতে চেষ্টা করল। কি নাম। ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে চাইলে। সরল নাসা। স্মিত অধর। গায়ের রঙে রক্তের আভা। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও স্ফুরিত। নরম শরীর। ধবধবে দাঁত। ধনুকের মত উজ্জ্বল ভুরু। বিকাশের ছেলেটিকে দেখতে ভালো লাগল। শিশু দেবতার মত।

—তিন অক্ষরের না চার অক্ষরের।

বিকাশের গলায় পুরনো দিনের বেশ বেজে ওঠে। কবিতার কাটাকুটি তাদের একটা প্রিয় খেলা ছিল। বিকাশ একটা লাইন লিখলে। শেষের লাইনটি মেলাতে হবে সুজাতাকে। হয়ত তখন বাইরে নেমেছে বর্ষা। শার্সিতে জল-তরঙ্গ বাজছে। কিংবা নীচে জনযানের কোলাহলের একটা বিচিত্র গুঞ্জন উঠেছে। দুই তিন তিন দুই মাত্রায় পংক্তি ভাগ করতে হবে। দুটি মাথার ঘন সন্নিবেশে তখন তারা কথার সমুদ্রে শব্দ সন্ধান করছে। সুজাতা না পারলে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে। না পারলে তার পয়েন্ট যাবে কাটা। দাঁত দিয়ে কলমটাকে চেপে ভ্রু কুঁচকে বিকাশের চোখের দিকে তাকায় সুজাতা। তার চোখের মধ্য দিয়ে সেই শব্দকে সে উদ্ধার করে আনবে। সুন্দর সাজান দাঁত সুজাতার।

—আচ্ছা, পারব না : মেলাও তুমি।

বিকাশও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইন দিতে পারলে না।

—কেমন। খাও গোল্লা।—উল্লাসে ফেটে পড়ে সুজাতা।

—তিন অক্ষর না চার অক্ষরে।

—আচ্ছা, চার অক্ষরে। ভ্রু গুটিয়ে বললে সুজাতা।

চার অক্ষরের কোনো নাম তার মনে আসছিল না। যতগুলো শব্দ আসে ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে সে বরখাস্ত করে দেয়। কোনো নাম মানায় না।

—তিন অক্ষর মনে লাগছে। তুমি কি দিয়েছ।

—তিন অক্ষর। হাসল সুজাতা।—প্রসূন।

প্রশ্ন। ঠিক নাম। ঠিক শব্দ। ছেলেটির দিকে আর একবার চেয়ে বিকাশ নামটির মানে বুঝতে পারলে। পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

*　　　*　　　*

বিকাশ যখন মেসে ফিরল তখন রাত খানিকটা হয়েছে। দোতলা বাসের মাথায় চেপে সারা সহর সে ঘুরেছে। সুজাতার বাড়ী থেকে বেরিয়েই তার মন আশ্চর্য রকমের হালকা হয়ে গেছল। অনেক দিন পরে মনের খুসীতে সে বাসের মাথায় চেপে টো-টো করে ঘুরল। আলোয় জলছে সহর। কালির ফুটকির মত মানুষের মাথাগুলো। আনমনে তাকিয়ে গুণগুণ করেছে। মেসে ফিরেছে শেষ বাসে।

অমূল্য পাশের সিটটায় শুয়ে শুয়ে তার প্রেমের কাহিনী বলছিল। কেমন করে একটি কিশোরী মেয়ের নয়নের নীলে যৌবনের সমস্ত আকাশ আতুর হয়ে ওঠে। সুরে সুরে ভরে যায় দিগন্তের ইন্দ্রজাল। রঙ ও রস।—বুঝলে বিকাশ দা, প্রথম প্রেম অনেকটা শীতের সকালের মত। মুখের কাছে চায়ের বাটি—আঁচ মুখে লাগছে, অথচ গায়ের ঢাকা খুলে মুখ বাড়াবার একটি মধুর ভয়।

বিকাশের ঘুম পাচ্ছিল। জানালা দিয়ে বসন্তকালের হাওয়া আসছিল। গা শিরশির করে। অমূল্য বলছিল মেয়েদের মনের কথা। দুটি ঘন আঁখি-পল্লবের তলায় আকাশের সে কি অগাধ অজস্রতা। এক মুহূর্তের স্পর্শে অনন্তকালের পুঞ্জীভূতি। ঘুম! ঘুম! হাওয়ায় তার শরীরে ঘুম ঘনিয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যে বিকাশ হাসছিল। কে যেন তাকে ছুঁয়ে গেল এই খানিক আগে। হাওয়া হয়ে। অমূল্যর কথার একটানা সুর হয়ে। প্রথম প্রেম হয়ে। হেসে সে পাশ ফিরল। নরম বালিশটা টেনে নিলে পায়ের নীচে। হাঁসের পালক। নরম, সাদা, কোমল। এক মুঠো বুকের উত্তাল ঘনতা। বিকাশের নাক দিয়ে সহজ নিঃশ্বাস পড়ছিল।

*　　　*　　　*

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তার ছোট-জা মনের কথাটি ভাষায় ব্যক্ত করল। একটা টাকা চাই তার। তার বড় ছেলের জন্য। বায়স্কোপ যাবে। সুজাতা একটা টাকা দিলে। জিজ্ঞেস করলে কাল রাতে কি হয়েছিল। তার দেবরের

একটু পানদোষ আছে এবং সেটি যেদিন মাত্রা অতিক্রম করে গৃহস্থালীতে এক একটি নাটকের মহলা সুরু হয়। প্রথম প্রথম এটা তার ঠেকত। কিন্তু ক্রমশঃ নিজের ক্ষেত্রটি সে গুটিয়ে আনলে এবং নানা দিক দিয়ে নিজেকে সাবলম্বী করে তুললো। বিশেষতঃ প্রসূন যত বেড়ে উঠতে লাগল তত সে সংগোপিত হল নিজের আয়তনের মধ্যে।

—দেখলে'ত দিদি—তুমি'ত জান সবই। অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম এক কাঁড়ি টাকা যে মাইনে পেলে মাসের পনেরো তারিখের ভেতরই গেল কোথায় সব। সে অনর্গল বলে যায়। তার কোনো অভাব ছিল না। এখনো তিন ভাই তার বর্তমান। তিন ভাই তিন রত্ন। এক উপযুক্ত ছেলে। কেবল অনেকগুলো অপগণ্ড কাচ্ছা-বাচ্ছায় সে নাজেহাল হয়ে পড়েছে। আবার তার নিম্নোদর স্ফীতবান।

হাসিতে সুজাতার মুখ সুন্দর হয়ে ওঠে। মমতায় চোখ দুটি সুনীল দেখায়। কেন এমন হয়। ভালভাবে থাকলেই পারে। কুশ্রীতার দিকে মানুষের এই স্বভাবগত আচরণ কেন। আনমনে সে পথের দিকে তাকায়। বিকাশ চলে গেল ঐ পথ দিয়ে। যেটুকু নিয়ে আমরা বাঁচি সেইটুকু কেন সুন্দর হয় না, পরিচ্ছন্ন হয় না। মানুষ অনর্থক ক্ষতি পায় আর ক্ষয়। দৈন্য, কুশ্রীতা, মালিন্য: মানুষের ইচ্ছায় তৈরি ক্লিন্ন পরিবেশ। যা' পেয়েছি তার বাইরে পাবার জন্য এই ক্ষোভ আর ক্ষতি কেন। দুঃখবাদের কোনো কি ক্রমান্বয়িক ইতিবৃত্ত আছে। মেঘ-ঘনানো উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে ডুবন্ত সূর্যের আলো চিকমিক করে। মেয়েদের কাপড়ের পাড়ে নক্সার মত মেঘের কোলে কোলে নানা রঙের বাহার। আকাশ থেকে চোখ ফেরালো প্রসূনের দিকে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে ছেলেটা। সুজাতা তার পাশে এসে বসল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে। চোখের ঘন পল্লবগুলি গালের উপর ছায়া এনেছে। আঁচলে করে মুখটা মুছিয়ে দিলে। মাথাটা ধরে নাড়া দিলে প্রসূনের। চোখ খুললে প্রসূন। এই চোখ খোলাটি অনেক দিন সে তার বিছানার পাশে বসে দেখেছে। ঠিক পদ্মের মত। পাপড়ি মেলার মত। সুজাতা তার মুখের দিকে চেয়ে একটু নিঃশব্দে হাসল।

—কটা বাজে।

—পাঁচটা বেজে গেছে—ওঠ।

—না। হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল—এসো, তুমি শোও। সুজাতা নীচু হয়ে তার চোখের পাতায় একটা চুমু খেলে। প্রসূন আরো ঘন হয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে হেসে উঠল।

—শোও, এসো, ঘুমোও।

সুজাতা কিছু বলল না। তার পাশে শুয়ে পড়ল। প্রসূনেব চোখেব দিকে তাকিয়ে সে হাসছিল। তার চুলের মধ্যে বিলি কাটতে থাকে।

—কি সুন্দর গন্ধ মা তোমার গায়ে। তার বুকের মধ্যে তার মুখ—ঈষৎ মুখ তুলে বলল প্রসূন।—এত নরম আর সাদা তোমাব বুক মা।

—কি সুন্দর তোমাব চোখ খোকা।

তারা দুজনে খানিকক্ষণ সহাস্যে তাকিয়ে রইল। তাবপর দুজনেই যেন কি বুঝতে পেরে সশব্দে হেসে উঠল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন বিকেলবেলায় ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দিতে অনুভা বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে সে কলকাতায় এসেছে। তার আসবার পরেই নার্সের থাকবার আর প্রয়োজন রইল না। একদিন সে বিদায় নিলে। অনুপমা সুস্থির হয়। ঐ নার্স যেন তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কণ্ঠস্বরের সুতীক্ষ্ণ লাবণ্য আর দ্রুত আঙুলগুলি নিপুণ শৃঙ্খলতায় একটি থেকে অপর একটি কাজে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে—দেখতে তার অবচৈতনিক ভয় আসত। ত্রৈলোক্যবাবুকে আড়াল করে রাখলে অনুভা। সেই ধূসর, শব্দহীন প্রেতশীলতায় ত্রৈলোক্যবাবু আবার নিরাপদ হলেন। অনুভার মধ্যে কোনো উদ্বেগ ছিল না। সর্বাঙ্গে সে প্রশমিত। তার জীবনের যেন এই নির্ণীত সূচিপত্র। তার পিতাকে ঘিরে রাখা; তার পিতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে থাকা। স্থির, শান্ত ও উন্নিদ্র। অনেক দিন সে রাস্তায় নামে নি। কিছু মার্কেটিং করে আসবে। কিছুদিন হতে শরতের হাওয়া বইতে সুরু করেছিল। বিকেলগুলি লঘু। বাষ্পহীন সাদা মেঘগুলি অতিকায় আজেব পাখীর মত। আকাশের নীল উত্তাপে চারিদিক আলস্যায়িত। পথে নেমে পথকে ভালো লাগল অনুভার। তার আজকে একটু সাজসজ্জার আড়ম্বর ছিল। মুখে খানিকটা ক্রীম ঘষেছে; চুলটাকে ছাঁদ করে বেঁধেছে। শাড়ীখানি পর্যন্ত পড়েছে নির্বাচন করে। আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে তাকিয়ে দেখল। নিজেকে দেখতে তার ভালো লাগল। এক বিচিত্র ভালোলাগায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

গলিটুকু পেরিয়ে গেলেই মোড়। মোড়ে এসে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল অনুভা। ডাক্তারের বাড়ী মধ্য কলিকাতায়। হাতে তার একটা ভ্যানিটি

ব্যাগ। কলকাতায় আসবার পর একখানা চিঠি সে দিয়েছিল এবং একখানা চিঠি সে পেয়েছে তার জবাবে। চিঠিখানা এসেছিল আজ সকালেই। জীবনপ্রসন্নবাবুর হাতের লেখাটি বেশ। চমৎকার। প্রতিটি অক্ষর প্রতিটি থেকে ছাড়ানো। একটু বেঁকিয়ে 'অ' লেখা। ঐ বাঁকা 'অ' যুক্ত শিরোনামা লেখা চিঠিটি পড়তে অনুভা কৌতুক পায়। হোস্টেলের ব্যাপার এখন মুলতবি থাকবে যতদিন না অনুভা যায়। অনুভার না যাবার ভয়ানক ইচ্ছা হয়। তার ভয় করে। চিঠি পড়তে পড়তে মনে মনে সে বলছিল সে যাবে না। যতক্ষণ সে চিঠি পড়ছিল ততক্ষণ তার নিঃশ্বাস পড়ছিল দ্রুত, অনিয়মিত। কঠিন ও প্রগত ভয়ে কোনো অক্ষরটিকে সে স্পষ্ট করে চোখ দিয়ে পড়েনি। সেই নিঃশব্দ গোলগোল চোখে হাসির ছিট। এক মুঠো হাসনুহানার ফেনা। খর্ব, স্ফীত আঙ্গুলগুলি দিয়ে অনুভার হাতে আংটি পরাচ্ছে। অস্থায়ী কাজ চালিয়ে নেবার জন্য বিশীর্ণা দেবী তার স্থানে বাহাল হয়েছে। মেয়েটি ভালো। তৎপর। তবে দায়িত্বশীল নয়। উপরন্তু পান্নালাল সুবিনয়ীকে বিবাহ করে কিছুদিন হ'ল কাজে ইস্তফা দিয়ে তার নিজের দেশে চলে গেছে। অনুভা অবাক হয়ে গেছল। বিস্ময়ে সে স্পন্দিত হয়। আশ্চর্য! পান্নালাল। কি সে বলতে চেয়েছিল। ভালবাসা। থেমে থেমে—ঈষত্তপ্ত কণ্ঠে—চোখের অচঞ্চল একাগ্রতায়। সে সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছিল যখন সে থামখা কুড়িয়ে নিয়েছিল তার একখানা হাত। আশ্চর্য জলন্ত আগুন। নিষ্ঠুর চোখ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি ভালোবাসতে চাই তোমাকে। মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করে অনুভা। কথাটি সে আজও বুঝতে পারে নি। কি সে বলতে চেয়েছিল!

একটা বাস তাকে যাত্রী মনে করে তার সামনে থমকে দাঁড়ায়। সে উঠে পড়ে। লেডিজ-সীটে একটি মহিলার পাশে একটি ছেলে কোলে আধাবয়সী লোক বসেছিল—ক্ষিপ্র উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটিকে বৌটি কোলে নেয়। অনুভা তার পাশে বসল। টিকিট নিতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল সে ট্রামে আসবে ঠিক করেছিল হঠাৎ বাসে চেপে বসল। সে জানেনা বাসটা কোথায় যাবে। কত নম্বর। তার মন খারাপ হয়ে যায়। বাস তার ভালো লাগে না। পেট্রোলের

গন্ধ, উঁচু-নীচুর ঝাঁকুনি, ঘেঁষাঘেষি লোকের ভীড়। পাশের বৌটির দিকে আড়-চোখে তাকায়। সেও চোখ বাঁকিয়ে তাকে লক্ষ্য করছিল। অরুণা দ্রুত চোখ সরিয়ে নেয়। পরিমিত হয়ে বসে। ব্যাগটা শক্ত করে ধরে তাকায় সামনে। টিকিট নেবার সময় বৌটির শরীরে একটু স্পর্শ হয়। চোখাচোখী হতে বৌটি মুচকি হাসে—অনুভাও হাসে। ঠিক অমনি—মুচকি।

—কোথায় যাবেন। বৌটা ফিসফিস করে।

—কলেজ ষ্ট্রীট।

অনুভা একটু সরে বসবার চেষ্টা করল। ভালো করে তাকাল একবার বৌটির দিকে। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা। সরু, লম্বা, হিংস্র নাক। লাল, দীর্ঘ একটি সিঁদুরের রেখা জলজল করছে। ঠোঁটে মাংস নাই।

যদি সুবিনয়ী এমনি ঘোমটা টানে। লাল সিঁদুর টানা সিঁথির তলায় চকচকে চোখ। হঠাৎ-সুবিনয়ীকে মনে পড়ে। দেখবার ইচ্ছা হয়। সোজা হয়ে বসে সামনে তাকায় অনুভা। পান্নালাল তার একখানা হাত হঠাৎ তুলে নিয়ে তাকে বলছে: থেমে থেমে—কেঁপেকেঁপে—ঈষতুপ্ত স্বরে। একটি হাসি তার ঠোটের কিনারে ধারালো ওঠে। তাকে হাসতে দেখে বৌটি আবার প্রশ্ন করে সে কলেজে পড়ে কি না।

—না। অন্যমনস্ক থেকে অনুভা বলে। আশ্চর্য। সে নিঃসন্দেহে জানতে পারলে পান্নালাল হঠাৎ সুবিনয়ীর হাত তুলে নিয়ে অমন করে বলতে পারে না। ঘোমটা টানা কপাল: চকচকে চোখ। কিন্তু কি বলতে চেয়েছিল পান্নালাল।

—ঐদিকে আপনার বাড়ী বুঝি। বৌটি আবার তাকে প্রশ্ন করে। ফিসফিস আওয়াজ হয়। অনুভা এবার পুরোপুরি মুখ ফেরালে। বৌটির সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল যে, সে যাচ্ছে ডাক্তারের কাছে যে থাকে কলেজ ষ্ট্রীট—তার বাবার অসুখ—সে পড়ে না পড়ায়। এবং প্রশ্ন করলে তারা কোথায় থাকে?

বৌটি ঘনিষ্ঠ হয়। কালীদর্শন করতে গিয়েছিল তারা। সেইখানেই ছিল সারাদিন। রেঁধেছে, খেয়েছে। তার ছেলের মানত। কালীর দোরধরা ছেলে। ঠুনকো স্বাস্থ্য। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। তাদের বাড়ী শ্যামবাজারে যেখানে

চিত্রা 'টকী' বায়স্কোপ আছে। যে ছবিটি এখন হচ্ছে সেটা খুব ভাল। সে তিনবার দেখেছে। প্রত্যেকটি কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল অনুভা। বৌটী কথা বলে যায়। সে নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করে। পাতলা নাকটা হিংস্র রকমের নড়ছে। ধূর্ত চোখ দুটো চকচক করে। হঠাৎ চৌরঙ্গীর মোড়ে কয়েকটি যুবক গাড়ীতে ওঠবার জন্য কলরব হয়—অনুভা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চৌরঙ্গীর মোড। এসপ্লানেড। সে উঠে দাঁড়াল; টিকিট ছিল কলেজ ষ্ট্রীটের—হঠাৎ সে দড়ি টেনে নেমে পড়ল। বৌটি কি বলতে গিয়ে অনুভার দ্রুততায় সময় পেলে না। পথে নেমে অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে রইল অনুভা। হঠাৎ সে যেন ভুলে গেল সে কোথায় যাবে। এই বৃহৎ জনতা ও বিস্ফারিত বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সে নিরালম্ব দাঁড়িয়ে রইল। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। নেমে আসা আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে হতাশ চোখে কি যেন সে খুঁজতে থাকে।

—এখানে? পিছন থেকে ডাক শুনে চমকে সে মুখ ফিরালে। বিকাশ। মুখ ফিরিয়ে অনুভা বিকাশকে দেখতে পেলে। শ্যামবাজার। বাগবাজার। গ্যালিফ ষ্ট্রীট। ওয়েলেসলী। ট্রামের ব্যূহ ভেদ করে বিকাশ তার পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে তার কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা। চামড়ায় বাঁধানো লাল মোটা একটা বই। অনুভা বিকাশকে দেখে খুসী হল। সে যেন ঠিক বিকাশকেই খুঁজছিল। তার চোখের তারা হিল্লোলিত হয়ে ওঠে।

—ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছিলাম। লাইব্রেরিতে এসেছিলেন? শ্যামবাজারের ট্রামে চেপে বিকাশের দিকে তাকাল অনুভা। কথা বললে না। বিকাশ উঠলো। হঠাৎ অনুভার শারীরিক ভালো লাগতে সুরু করে। বাইরে বিদ্যুতের বিজ্ঞাপন জ্বলতে সুরু করেছে। আলোয় আলোয় সঙ্কীর্ণ পথ। অনুভা বাইরের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ মন্তব্য করতে থাকে। বিকাশ অল্প উত্তর দেয়। সে ভাবছিল। সকাল থেকেই মেজাজ তার ভাল ছিল না। হঠাৎ তার এক প্রকাশকের চিঠি পায় যে বইখানি যন্ত্রস্থ অবস্থায় রয়েছে তার জন্য আরো দেড়ফর্মা লিখে দিতে হবে। পড়েই সে চটে গেল। একি জবরদস্তি! যেখানে প্রয়োজন বুঝেছে সেইখানে সে থেমেছে। প্রকাশকের কাটতি, আয়-ব্যয়ের অঙ্ক হিসাব করে কেমন করে সে

পাতা ঠিক রাখবে। এই নিয়ে মন খারাপ করলে খানিকক্ষণ। একটা ভেকেনসিতে ইনটারভিউ চেয়েছিল। সেখানকার সাহেব এক নীচুজাতের বাঙালী। পাদরী লঙের আমলে তারা খ্রীষ্টান হয়েছিল। পাইপ মুখে ইংরিজিতে কথা বলে। বিকাশকে জামাই ঠকানো প্রশ্ন করলে। তার উত্তরগুলি খুব প্রীতিকর হল না। সবার উপর তার পিতার চিঠি এসে পৌঁছেচে তারা শীঘ্রই তীর্থভ্রমণ শেষ করে ফিরবেন। লাইব্রেরীতে সে যা' বই চাইল তা' ছাড়া সব কিছুই আছে। অবশেষে একগাদা এ্যানথ্রোপলজির বই নিয়ে বসল এসে টেবিলে। এ্যানথ্রোপলজি সে বোঝে না আর তাই সবেগে নোট নিতে লাগল। যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পথে নামল তখন বিকেলের ছায়া পথের দুধারে নেতিয়ে পড়েছে। কার্জন পার্কে পোকার মত কিলবিল করছে মানুষ। চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে কয়েকটা পত্রিকা কিনলে যা' সে কোনো দিন পড়ে না। বাহারে। বিজ্ঞাপনে ভরাট। মেয়েদের সভঙ্গী ছবিওলা পত্রিকা। তারপর আনমনে তাকাতে তাকাতে দেখতে পেলে পথের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অনুভাকে। অনুভার সেই চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে থাকা তাকে স্পর্শ করল। হঠাৎ অনুভাকে সে যেন কুড়িয়ে পেলে। মনে হল তারই জন্ত সে অপেক্ষা করছে। বিকাশ ভাবছিল। সারাদিন তার মনের ভাবনা লঘু পাখায় ঘুরে বেড়িয়েছে। বিস্রস্ত ও জড়ীভূত ভাবনা নিয়ে অনুভার সঙ্গে এলোমেলো কথা কইতে কইতে তাকে দেখছিল। অনুভাকে বিকাশ জানত। শান্ত, স্তব্ধ ও দুরূহ। দুরূহ ও সাইকোলজীর একটা চমকপ্রদ কেস হিসাবে। অনুপম যে মেয়েটী সম্বন্ধে ভয়ের সঙ্গে চিন্তা করে—বিকাশ তা জানে। সে সুদূর নয়, মিষ্টিক নয়—A case from the psychoanalaytical point of view : obsessional neuroses. ওর দাঁড়িয়ে থাকাটা একটা ছবির টানের মত।

—দিনাজপুর কেমন লাগল।

—চমৎকার। খোলা আকাশ। লাল ধুলো যখন ওড়ে ঠিক যেন ঢেউএর মত। দেশটা রুক্ষ।

—কলকাতায় আছেন ক'দিন। ছুটীত একমাস।

—যাবো না আর। পড়াতে ভালো লাগে না।

—তবে গেলেন কেন? অনুপম বললে আপনি'ত চেষ্টা করে গেছেন।

—কলকাতা এক এক সময় এমন বিশ্রী লাগে। খানিক থেমে আচমকা প্রশ্ন করে বসল অনুভা,—আচ্ছা কলকাতার এত আলো যদি নিভে যায়। ট্রামের আলো তার কপালে আর বাহুতে চিকচিক করছিল।

—সে কলকাতাকে কল্পনাতে স্থান না দেওয়া ভাল। অনুভা শব্দ করে হেসে উঠল।

—আমার কিন্তু দেখতে ইচ্ছা করে সেই কলকাতাকে! বড় বড় বাড়ীর মাথায় আলো নাই। অন্ধকাব। এ ওর গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। ঠিক যেন সমুদ্র। অন্ধকারের সমুদ্র। আপনি সমুদ্রে গেছেন।

—ইচ্ছা নাই। শুনেছি সমুদ্রের ঢেউএ গা বমিবমি করে। শারীরিক যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারি না।

—আমিও না। কিন্তু এক একজন পাবে।

—আপনার দাদা পারে। পম।

—আব দাদার যখন যন্ত্রণা ভয়ানক হয়ে ওঠে তখন তার সিগারেটেব মাত্রা থাকে না।

বিকাশ তাকে খুঁটিয়ে দেখল। অনুভাকে সে অনেকদিন দেখেছে। তাদের বাড়ীতে অনেক বিকেল এমন কি দিন সে কাটিয়েছে। কিন্তু তাদের ঐ:বাড়ীতে কিছুতেই সুস্থির হয়ে চলা ফেরা এমন কি উচ্চারণ পর্যন্ত সহজ ভাবে করতে সে যেন পারত না। যে অনুপমকে অতি নিকট থেকে জানে—সেই উষ্ণ, উচ্ছল, প্রাণবান অনুপম সেও যেন নতুন হয় বীভৎস হয়। সেই ম্লানায়মান ঘবের ধূসরতায়, মৃত্যুপঙ্কাচ্ছাদিত অবাস্তবতার মধ্যে বহুবার অনুভাকে দেখেছে, কথা বলছে ভয়ে ভয়ে, কেটে-কেটে; সভ্যতা ও শালীনতাকে ছুঁয়ে, মেপে! আর বিরক্ত হয়েছে। বাড়ী এসে ভেবেছে obesessional neuroses : a case for psychoannlaysis. হঠাৎ সে অনুভব করল ঐ মেয়েটির সাথে তার বহুদিনের পরিচয়। তাকে সে চেনে। সেই পরিচয় আবিষ্কার করবার জন্ত ভাল করে তাকাল অনুভার দিকে। অনুভা বাংলার

বিজ্ঞাপন রীতি নিয়ে কি একটা মন্তব্য করলে। তারা যেন ডুব দিয়ে পার হয়ে এসেছে সমুদ্রের তলহীন চাপ। বিকাশ খুসীতে ভরে ওঠে। অনুভবে তার মন ভরে যায়। এই সুন্দর সন্ধ্যাটি, শরৎকালের বায়ুতে স্নিগ্ধ আলোকজ্জ্বল নগরটি যেন তাদের আচম্বিত জানা শোনার জন্যে নির্মিত হয়েছে। বিকাশ কিন্তু কিছুই আবিষ্কার কবতে পারল না। ট্রামের বাষ্পীয় জনতার মধ্যে ঐ মেয়েটি তার মনে ছায়া ছড়িয়ে দিলে।

ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দিয়ে ও উপদেশ নিয়ে তারা দুজনে পথে নামল।

কিছু মারকেটিং করে নিয়ে যাবে অনুভা। কমলালেবু কিনলে, কয়েকটি নাসপাতি ও কিছু খেজুর। বিকাশের ভালো লাগছিল তার পাশে পাশে চলতে তার জিনিষ কেনার মধ্যে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করতে।

—আপনি অসম্ভব কম দাম বলেন।

—আর আপনার বলাটা যে সম্ভবকেও ছাড়িয়ে যায়।

—আমরা'ত লোকসান করে কিনতে পারি না।

—আর ওরাও তা কোনক্রমে দিতে চায় না।

আবার তাদের কথা কখন থেমে যায়। আবার কখন সুরু হয়।

—এবার পূজোয় খুব উৎসব হবে মনে হয়।

—কলকাতা সে সময় জঘন্য হয়ে ওঠে!

—কলকাতার চেয়ে ভালো জায়গা কোথায় পাবেন বলুন।

—পিপড়ের মত গর্ত থেকে মানুষগুলো গাদাগাদি করে বেরোয় আর এতটা উৎসাহী হয়ে ওঠে সেটা প্রায় পাশবিক।

—সহরের বুকে পাঁচতলায়,—বিকাশ উদ্ধৃত করল,—মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্লাট—ভীড়েতে থেকেও কি নিরালয়—গোলমাল যেন পায়েতে ম্যাট।

বিদ্রুপটি কি সুন্দর নয়?

—ঐ ম্যাট কথাটিতেই জমেছে।

—কথাটি ইংরেজি বলে।

—আচ্ছা বাংলা কবিতায় অত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয় কেন?

—কারণ, বাংলা কবিতা আসলে ইংরিজি কবিতার উত্তরাধিকারী।

—কিন্তু ঐ শব্দটিতে খুলেছে লাইনগুলি।

—কারণ, বাংলা আর ইংরিজি দুটো ভাষা জাতে এত তফাৎ যে একটার মধ্যে অপরটিকে লাগিয়ে দিলেই জিনিষটা বাঁকা শোনাবে। মার্কিন মহিলার শাড়ীপরা ছবি দেখেছেন ?

—আপনি সিনিক। ব্যক্তিবাদী। দাদা হলে বলতো বুর্জোয়া।

—সিনিক কথাটি আমার মনে হয় দুটো আলাদা শব্দের যোগফল সিন+সিক। যস্য স বহুব্রীহি। এ'কে ও'কে না বুঝিয়ে তা'কে বোঝায়। অনুভা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

—ব্যক্তিবাদী নই—অভিব্যক্তিবাদী। কারণ, বাংলা কবিতায় ইংরিজি শব্দ ব্যবহারের আমি পৃষ্টপোষক—আর আপনার দাদা যে ঐ কথাটি প্রায় আমাকে বলে তার কারণ সে আজও প্রলেটারিয়েট হতে পারে নি।

—আচ্ছা, বলুনত মিল দেওয়া কবিতা লেখা শক্ত না, মিল না দেওয়া।

—আপনি আধুনিক সাহিত্যের একটি তর্কমূলক অধ্যায়ে এসে পড়েছেন। এ'সম্বন্ধে অবশ্য আমার একটি মতামত আছে কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে ভয় পাই।

অনুভা সকৌতুক তাকাল।

—আসলে, কবিতা যে কোনো জিনিষ এমন কি রাষ্ট্রনীতি নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে সহজ।

অনুভা বড় বড় চোখ করে তাকাল।—তা কেমন করে, আমি চেষ্টা করেও পারিনি।

—তা'হলে আমার বিশ্বাস আপনি কবিতা লিখতে চাননি, কবিতা কি লিখতে চেয়েছিলেন। ওর কতগুলো টেকনিক আছে সেইটা জানতে পারলেই কবিতা লেখা যায়। প্রথমতঃ, আপনাকে ভাবতে হবে আপনি একজন কবি। দ্বিতীয়তঃ, ভাবতে হবে আপনি যা' লেখেন তাই কবিতা ও আধুনিক কবিতা। তৃতীয়তঃ, কবিতাই একমাত্র যার দ্বারা পৃথিবী নতুন ভাবে তৈরি হবে।

বিকাশ তার পরিচিত দোকান থেকে কয়েকটি বাংলা বই কিনলে। বেশীর

ভাগই কবিতা। বইগুলি নাড়তে চাড়তে হঠাৎ বললে অনুভা,—আমার কিন্তু কবিতা ভালো লাগে না—ঘুম পায়।

—কি ভালো লাগে। বিকাশের চোখে খুসীর আলো। কথা কইতে পেয়ে সে সুস্থ হয়। যে কথার মধ্যে গতি আছে। আর সেই গতির মধ্যে দিয়ে অনুভাকে সে স্পর্শ করতে করতে চলে।

—কি ভালো লাগে আপনার।

—প্রায় সময় কিছু না।

—কোনো সময়।

—ছবি। আমার ছবি ভালো লাগে। গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি খুব ভাল—না?

—ছবি আমি বুঝি না। কিউবিজিম কাকে বলে।

—আশ্চর্য। কিউবিজিম কাকে বলে জানেন না। পিকাশোর ছবি দেখেন নি। গগনেন্দ্র বাবুর ছবিতে পাবেন। শুধু লাইনিংএর তফাৎ। অনুভা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কথায় কথায় ফেনিয়ে ওঠে অনুভা। কথায় সে হালকা হয়ে যায়। এসপ্লানেডের বায়স্কোপ পাড়ায় তারা পড়ল।

ছবির সারি: আলোর মালা: গাড়ী: মেয়ে: মানুষ ঠেলে ঠেলে দুজনে এগুতে লাগল।

—আচ্ছা বাংলা দেশে কতগুলো সিনেমা আছে। অনুভা অতৎপর প্রশ্ন করল।

বিকাশ তার অজ্ঞতা জানাল। অফিসের বাঙালী সাহেব এ প্রশ্নটা তাকে জিজ্ঞাসা করলে পারত। আধুনিক ও কাল্‌চারাল।

—আচ্ছা শুধু এই কলকাতায়। বিকাশ আবার দুঃখের সঙ্গে শোচনীয় অজ্ঞতা জানালে।

—বাঃ, সক্কলে জানে। দিনাজপুর স্কুলের মেয়েরা সিনেমাষ্টারদের বাড়ীর চেহারা গাড়ীর নম্বর মুখস্ত বলে দিতে পারে।

—তারা অধ্যবসায়ী। বিকাশ জানালে যে সিনেমা দেখলে কেমন হয়। দুখানি টিকিট কাটিয়ে তারা ঢুকল। 'সো' আরম্ভ হয়েছে সবে। অন্ধকারের

মধ্যে হাত ধরাধরি করে হোঁচট খেতে খেতে বিকাশের পাশে বসে পড়ল অনুভা। এই অন্ধকারটুকু অতিক্রম করতে সে হাঁপাচ্ছিল। সে বসে বিকাশকে পাশে অনুভব করে। আরো অনেকক্ষণ পরে অন্ধকার তার চক্ষুতে সহ্য হয়ে যাবার পর সচকিত টের পেল তাদের দুজনকে ঘিরে সামনে পিছনে, বাঁয়ে ডাইনে অগণ্য লোকের নিঃশ্বাসপতনের গুমোট। আর সকলের চোখে স্থিরীকৃত উজ্জ্বলতা পর্দার দিকে লটকানো। অনুভা ছবির দিকে তাকাল। একটি ড্রয়িংরুমে কতগুলি সম্ভ্রান্ত নরনারীরা পান-ভোজনের মধ্য দিয়ে কথোপকথন কইছে। দ্রুত ইংরাজি অনুভা ভাল বুঝতে পারে না। তার ভাল লাগে না। সমস্ত অন্ধকার ও নিঃশ্বাসের উপর সেই কথোপকথনের আওয়াজ সবেগে বাজছে। তার কপালে ঘাম দেখা দেয়। অগণ্য লোক, নিঃশ্বাসের জটিলতা; বিকাশের সিগারেটের আগুনটা তার কানের পাশে জ্বলছে। সারা পথটা তার মন হালকা ছিল: গানের মত: সুরের মত। মনের নেশায় উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। সে নিজেকে জানত না। হঠাৎ যেন সে নিজেকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার বাবাকে মনে ছিল না। তার বাবার সেই শীতল, নিঃশ্বাসহীন, নিস্পন্দ ঘর। তার সেলাই, তার ছবি, তার কোনো ভয়। ভয়ের স্তব্ধতা যেন সে গুড়িয়ে ফেলেছিল। সে এতক্ষণ জানতে পারেনি বিকাশ তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল—অনেক অবান্তর কথা কয়েছে তার সঙ্গে। খুসীর সমুদ্র থেকে উঠেছে সেই সব কথার ঝলক। কথা কয়ে তার ভুরু ভয়ে কুঁচকে ওঠেনি। এই ভয়হীন সন্ধ্যাটি একটি গাঢ় চেতনায় তার মনে ঝিলমিল করেছে সারাক্ষণ। হঠাৎ এই সিনেমায় এই রেশমের মতন নরম অন্ধকারে, বহুজনের নিঃশ্বাসঘন জটিলতায় তার কানের পাশে সিগারেটের জ্বলজ্বলে আগুনের আঁচ পেয়ে সে বিকাশকে অনুভব করল। আস্তে আস্তে সে পা দোলাচ্ছিল। সারা পথ বিকাশ তার সঙ্গে আছে, তাকে ছুঁয়ে আছে। গভীর সুখের সঙ্গে সে পা দোলায়। ছবিতে তখন নায়ক-নায়িকারা একটি পুষ্পশোভিত উদ্যানমধ্যে পায়চারী করতে করতে গান গাইছিল। একটা কমলালেবু ছাড়িয়ে মুখে দিলে অনুভা। একটু টক রস। হঠাৎ যখন সে শরৎকালের বায়ুস্নিগ্ধ অপরাহ্নে তার দুস্তর প্রাত্যহিকতা থেকে একটি মুহূর্তের

মত ছিঁড়ে গেল তখন সে খুঁজে পেল বিকাশকে। আর তার পাশে বসে থাকা বিকাশকে বুঝতে পারলে সে কে। তারা পরিচিত। সেই আলাপ এই মুহূর্তে উদগীরিত হয়েছে: বহুকালের পথে বিস্তীর্ণ সেই পরিচয়। গভীর আরামে ও নিরাপত্তায় পা নাচাতে নাচাতে লেবু খায় অনুভা।

এক সময় পর্দা সাদা হয়ে গেল—আর সেই মুহূর্তে ঘর আলোয় উঠল ঝলকে। অনুভা হতভম্ব হয়ে যায়। হঠাৎ তাকে কে যেন পাহাড়ের কঠিন, উত্তুঙ্গ চূড়া হতে ছুঁড়ে ফেললে অন্ধকারের গর্ভে। সে কাঁপা চোখে বিকাশের দিকে তাকায়। বিকাশকে সে প্রথমে চিনতে পারলে না। শারীরিক, সুসভ্য বিকাশ। পাৎলা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, চোখে চশমা, চুলওলটানো, নাতিদীর্ঘ এই অনেকদিনের দেখা বিকাশকে সে চেনে না; এই মুহূর্তের বিকাশ তার কাছে অপরিচিত। সেই উত্তপ্ত অন্ধকার ও জটিল-নিঃশ্বাস-সিঞ্চিত-আবহাওয়ায় চুলের পাশে বিন্দু বিন্দু করে যে বিকাশ জলে উঠেছিল একটা দমকা হাসির মত তা' গুড়িয়ে যায়। সমস্ত অডিটরিয়মে কে যেন ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলে। প্রখর, অদমনীয় ব্যস্ততা। বিকাশ তার দিকে চেয়ে হাসল। চশমাটা রুমালে মুছে নেয়। সমস্তক্ষণ একটিবারও সে পর্দা থেকে চোখ সরায়নি। কিন্তু ছবি সে দেখেনি। অদ্ভুত একাগ্রতায় সে এতক্ষণ নিশ্চল হয়েছিল: অনুভূতির প্রখরতায় কণ্টকিত। যা' বিকাশের স্বভাব বিরুদ্ধ। তার মনে কোনো কথা ছিল না: কোনো শব্দের ছাঁট্। স্থির, অনুদ্বেগ ও উজ্জ্বল। সে সারাক্ষণ অনুভব করেছে ঐ মেয়েটি তার পাশে বসে রয়েছে। একসময় সক্রিয়ভাবে সে অনুভব করল কেউ যেন তাকে কেড়ে নিচ্ছে: তার নিজের থেকে, তার সুখের থেকে, তার ইচ্ছা থেকে! আর ঐ মেয়েটিকে বোধ করেছিল তার পাশে। হঠাৎ সে তার দেহের মধ্যে আত্মাকে বুঝতে পারলে; তার পীড়ন স্থির হয়ে সে অনুভব করল—একাগ্র নিস্পন্দতায়। অধিক্রান্ত আত্মার টান সে বুঝতে পারে। যন্ত্রণায় সে কঠিন হয়ে ওঠে; পাংশু দেখায় তার মুখ। আচমকা যখন আলো জলে উঠল দপ করে সমস্ত কিছু উদঘাটিত হয়ে গেল তার মধ্যে। তার মধ্যে সন্দেহ নাই। সব নিরসন, নিঃশেষ হয়ে গেল। ঐ মেয়েটি তাকে টানছে। সে তাকে ভালবাসে। সেই ভালবাসার টান

অন্ধকারের মধ্যে সে বোধ করেছে। অনেকদিন ধরে তাকে ভালবাসে। বিকাশ তার কাঁপা, শূন্য চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে জানল সেই ভালবাসার রূপ। সে ভয় পেয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

* * *

অনুভা যখন বাড়ী ফিরল তখনো ত্রৈলোক্যবাবু ঘুমাননি। নীচু চৌকিতে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় তিনি বই পড়ছিলেন। অনুপম তখনো ফেরেনি। পার্টির কাজ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। চাকরী সে ছেড়ে দিয়েছে। অনুভা খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়মিত এসে বসেছে ত্রৈলোক্যবাবুর কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ওষুধ ঢেলে খাইয়েছে। তারপর একসময় তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনুভাকে একবার দরকার পড়েছিল ত্রৈলোক্যবাবুর। অনুভার ক্লান্ত ও সন্ন দেহটির দিকে তাকিয়ে ত্রৈলোক্যবাবুর মায়া হয়। নরম, বেগুণে আলোটি পড়েছে ওর বুকে। ছায়ায় ভরে আছে মেয়েটি। আহা! গায়ে একটা চাদর দিক। নরম নরম হাত-পা গুলিকে ছড়িয়ে শু'ক—ঘুমো'ক ও। যখন তিনি অনুভার কপালে হাত দিয়ে ডাকছিলেন বুকের বাঁ দিকটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। সমস্ত নিঃশ্বাস তার বুকের মধ্যে আঁকপাঁক করে উঠল। তিনি মুখ বিস্ফারিত করেন। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠে। আর মুহূর্তে একটি অকাট্য হেঁচকিতে মাটিতে টলে পড়েন। তিনি নিঃশ্বাসকে ঠিকমত জায়গা দিতে পারেন নি। অনুভার ঘুম তার অবশ্য অনেক পরে ভেঙেছিলো। ঘরে বেগুণে আলোটি জ্বলছে। তার মনে পড়ছিল সব। তার বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেও সে তুলল না। তার আলস্য এল। শান্তি এল। সে আলস্যে, শান্তিতে হাত পা'গুলি ছড়িয়ে দিলে। তার সমস্ত মনে পড়ছিল। সমস্ত দিনটি একটু একটু করে রেখায় রেখায় তার মনে পড়তে থাকে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে তার বাবার কথাটি পর্যন্ত সমস্ত তার মনে পড়ে। তার মনে পড়ল সে ঘুমোচ্ছিল। কেউ তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল।

—সত্যি কিছুই ব্যর্থ নয়।—জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। তার বাবা বলছিলেন ঈষৎ কর্কশ ও একটানা গলায়। অনুভা পাশের চেয়ারে বসে সেলাই বুনছিল।

—কেন তোমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়!—ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা,—পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে। কিছুই অকারণ নয়; কেন পারনা একথা মানতে। তার বাবা যেন তাকে বলছিলেন কিন্তু তাকেই বলছিলেন না। অন্যদিনের মত সবদিনের মত তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনুভা তাকিয়েছিলো ত্রৈলোক্যবাবুর নাকের স্ফীত প্রান্তটির দিকে। শীর্ণ মুখের উপর মাংসল নাকটি কার্টুন ছবির মত।

—দুর্বল। নির্বোধ। ত্রৈলোক্যবাবু হাতের আঙুলের ফাঁকে বইটাকে মুড়ে সামনের দিকে তাকান।

—জানলে, কোথাও আছে এক পরিপূর্ণ ধৃতি: এক অখণ্ড সত্তা: আত্মার সমগ্রতা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—ফুলে ফলে, আর তারায় আর শীতের উত্তর বাতাসে তারই বর্ণায়মান প্রকাশ। সত্যি! ভেবে দেখো! কিছুই অনর্থক নয়। অবান্তর কথাটা অবান্তর। সবকিছুই আমাদের জীবনলীলার অন্তর্গত। কোনো অচ্ছেদ্য অনুভূতির ভগ্নাংশিক উৎক্ষিপ্তাংশ। দুঃখ বল, বেদনা বল সব কিছুই'ত সেই বৈদন্ধ বিন্দুর উদঘাটন।

অনুভা শুনছিল। অনুভা শুনছিলনা। এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ওষুধের শিশি ও গেলাস পাড়ল। ত্রৈলোক্যবাবু খেয়ে মুখ বিকৃতি করলেন। অনুভার আঙুলগুলি টেনে নিলেন—মোচড়ান। গালের উপর সেই সরু, ঠাণ্ডা আঙুল গুলি ধরে স্থির হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। অনুপম তখনও ফেরেনি। আলোর ছায়া তার মুখের একাংশে হাওয়ায় নড়ছিল।

—আমি আলাদা। আমার জীবনযাপনের আলাদা পথ ও ধারণা। ত্রৈলোক্যবাবু আবার একসময় একটানা গলায় আবৃত্তির মত বলে যান। অনুভা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শোনে। ত্রৈলোক্যবাবু তার আঙুলগুলিকে চেপে, ছুঁয়ে বলে যান।

—আর তুমি আমার পাশে বসে—আর্দ্র, স্পন্দমান তোমার স্পর্শ, একানুভূতি বলা যেতে পারে। এমন কোনো শব্দ, উচ্চারণ তুমি খুঁজে পাবেনা যা' দিয়ে এই স্পর্শটিকে প্রকাশ করা চলে। অথচ এই'ত তোমার আঙুল কাটির ডগা: বিদ্যুতের

মত প্রবাহ লাগছে আমার মধ্যে। স্তব্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে! এ কি—এ কেন! এই অনুচ্চারণীয় সমগ্রতায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকি! আর আমরা যদি হারিয়ে যাই তোমার আমার অতীত কোনো সত্তায়! অথচ তুমি আলাদা—জীব হিসাবে তোমার আলাদা প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব! ঠিক এইমুহূর্তে বাইরের সভ্যতার মাঝে, মানে, বিশেষ একটা গণ্ডগোলের মাঝে প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ জীবন বহন করে চলেছে। কেউ ব্যবসায়ী কেউ বুদ্ধিজীবি; পলিটিক্স, কেরানী,—চা, সিগারেট; কিন্তু চলে যাও মনেরলোকে—নিস্পন্দ অনুভূতিতে কান পাতো: এক প্রবাহ, এক ধারা—জীব হিসাবে কেউ পৃথক নয় সেখানে: অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য। সমুদ্রের উপরে থাকে ঢেউ তাদের সংখ্যাময় উত্থান পতন কিন্তু সব মিলিয়ে সে বারিধি: সেই বারিধি আমাদের এই প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মহামানুষ। বুঝলে, এমনি করে তাকিয়ে দেখো সামনে, ভয় পেওনা অন্ধকারের। জানালা খুলে দাও আলো আসুক অবারিত। দেখো, এই যে প্রত্যেক মুহূর্ত ঝরে পড়ছে এ' শুধু হারিয়ে যাচ্ছে না কোনো কিছু না'র মাঝে; সেই পরিপূর্ণ অপেক্ষামান অম্বুধি যা' আমাদের প্রাণ।—মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ঘুমের মত নিটোল এই এক একটি মুহূর্ত।

অনুভার মাথা ঝিমঝিম করছিল। একটানা, তন্দ্রালু ও ঈষৎ কর্কশ গলা তার মস্তিষ্কের ভিতর জালের মত ছড়িয়ে পড়ে। অবসন্ন বোধ করে সে। চোখ দুটি ফাঁকা: অন্ধকারের গর্ত। আঙুলকটি আলগা হয়ে গেছে ত্রৈলোক্যবাবুর হাত থেকে। সে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তেমনি আমাদের জীবন। একে ভয় পেও না: একে গ্রহণ করো: একে স্বীকার করো। যা' নিশ্চয় তাই অকাট্য আর তাই সার্থক। কোনো ভুল নাই এ'তে—খালি মেনে নাও। বুঝলে, আমি অনুভব করি: এক এক সময় অসহায় ভাবে অনুভব করি: আমরা সবাই এক। এক ও অকাট্য। একই তীর্থপথের আমরা দুঃসাহসিক পথিক। বিভেদ কিছু নাই, অসম্পর্ক কিছু নাই। এক, অখণ্ড ও পরিপূর্ণ। তবু ঘটে পথের অনৈক্য। আমি এক ও আলাদা: তুমি অনুভা—স্বতন্ত্র। এমনি প্রত্যেকে—নানা চিন্তা, নানা

পথ, নানা আবিষ্কার; তবু একথা ঠিক কোনো একটি জায়গায় আমাদের মিলন অবধারিত। Dissolution বলো ক্ষতি নাই। তখন হাস্যকর ভাবে দেখবো এককেই কেন্দ্র করে আমরা ঘুরেছি অবিরত। সূর্যকে কেন্দ্র করে নানা গ্রহ উপগ্রহের মত। পৃথক কক্ষপথে স্বতন্ত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রেরণায়। আমরা সবাই এক। একই বিরাটের পদতলে আমাদের প্রণাম পৌঁছে দেবার জন্য এই গতি, এই যাত্রা : অনির্বানতা।

* * *

অনুপমের এক সময় সাড়া পাওয়া গেল। সে বাড়ী ফিরেছে। ত্রৈলোক্যবাবুর ঘরে সে যখন এলো তখন তিনি আবার বইয়ে মনোনিবেশ করেছেন। অনুভা পাশে বসে সেলাই বুনছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই ছায়াবৃত ঘরটিকে লক্ষ্য করে।

—আজ কেমন ?

—অনেকটা ভাল মনে হচ্ছে।

—ডাক্তারবাবু কি বললেন। অনুভাকে জিজ্ঞাসা করলে।

—কতগুলো ওষুধ বদলে দিলেন। কালকে একটা ইনজেকসন দেবেন।

—একটা কথা ভাবছিলাম। ত্রৈলোক্যবাবু এতক্ষণ অনুপমেব মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। যদিও স্পষ্ট কিছুই সেই স্বল্পালোকিত ঘরটিতে দেখা যায় না। তবু দাড়ির অংশটি ত্রৈলোক্যবাবু লক্ষ্য করছিলেন। ও'র ঠোঁট দুটি আশ্চর্যরকমের চাপা। অত সংবদ্ধ চিবুক কেন।

—একটা কথা ভাবছিলাম। অনুপম চোখ ফিরিয়ে তাকাল।

—ইনজেকসন আর নেবো না।

—কি করতে চান।

—কিছুদিন ও'গুলো না নিলে চলেনা।

—কিন্তু আমি বলছিলাম কিছুদিন না হয় একটু বাইরে যান না; অনুভাও যাবে। কারণ কলকাতা কিছুদিনের জন্য আমাকে ছাড়তে হবে। বাইরে একটু দরকার পড়েছে।

কেউ কোনো কথা বললে না। অনুভা উঠে গেল অনুপমের খাবার বন্দোবস্ত করতে।

খেতে বসে অনুপম বলল—তোমার দিনাজপুর আর না যাওয়াই ভাল।

—আমিও আর যাবো না। ভুরু উঠিয়ে তাকাল অনুপম।

—বাবার ইনজেকশন নিতে আপত্তি কেন?

—একটু সুস্থ থাকতে চান।

অনুপম এক ঢোঁক জল খেলে।—আজ কিসের বক্তৃতা শুনলে—পরজন্মবাদ। অনুভা মুখ তুললে না।

—কলকাতায় কি রকম ভাবে সুস্থ থাকতে চাও। আমি বোধ হয় কলকাতায় থাকতে পারবো না জানো।

—তুমি'ত পার্টি ছেড়ে দিলেই পারো। অনুভা চোখ না তুলেই বলল।

—বক্তৃতা শুনব। বই পড়বো। তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে কি করতে চাও।

—আমি এখনো ভাবিনি।

অনুপম কিছু বললে না।

* *

অনুভা যখন চলে গেলো ত্রৈলোক্যবাবু বইখানিকে পাশে রেখে দিলেন। আলোটা নেভালেন না। সারারাত তার ঘরে আলো জ্বলে। বেগুনে, ঠাণ্ডা আলোয় তাব শরীরে কোনো তাপ থাকে না। বহুদিনকার ব্যবহৃত কেদারাটিতে অলসভাবে পড়ে রইলেন। ঘুম জড়িয়ে আসছিল তার শরীরে। তার নিজের কথা মনে হচ্ছিল। তার জীবনের কোনো ইতিহাস নাই: অতীতহীন একটি ধারাবাহিকতা। কতদিন গেছে তার মনের উপর দিয়ে—কতরাত্রি: দিনরাত্রির কত আসাযাওয়া। কত মুহূর্ত। উত্তরপবনক্ষিপ্ত কত নিষ্ঠুর মুহূর্ত, অলস মুহূর্ত, ঘুম, বিস্মরণ আর শেষহীন, স্মৃতিহীন এই সময়—তার শরীরে আঘ্রাণ পাওয়া যায়। আশ্চর্যরকমের নিরুদ্বিগ্ন তার জীবন। নিশ্ছিদ্র। তিনি অভিজ্ঞ। তিনি জানেন অভিজ্ঞতা কি! মানুষের বয়োবৃদ্ধির সাথেসাথে যে ভূয়োদর্শন তারই নাম অভিজ্ঞতা নয়: তার অভিজ্ঞতা একটি বৃত্তের মত।

গোলাকার একটি সম্পূর্ণতা। সেই সম্পূর্ণতা তিনি নিজে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নামই অভিজ্ঞতা। তার জীবনে অন্ধকার নাই, পরদা নাই, স্মৃতি নাই, অতীত নাই। সময়ের স্রোতে তিনি চলেছেন। সেই মৃদুছায়াঘনাক্ত ঘরটিতে তিনি নিজেকে হঠাৎ দেখতে পেলেন। তিনি জানতেন ঐ মেয়েটি অনুভা যার নাম তার সঙ্গে জড়িত। তার জীবনের ছায়ায় ওঁ ঢাকা, আবৃত। অসহনীয় কোমলতায় তার ভিতরটা দুলে উঠল। তিনি যখন থাকবেন না অথচ অনুভা যখন থাকবে! তিনি বুঝলেন অনুভা কি চায়। প্রতীক্ষা। অনুভাকে অপেক্ষা করতে হবে। সূচ হাতে: পেনিলোপের মত: স্থির, নির্বেগ, আবেগ-উপ্ত। আর অনুপম! তিনি জানেন তার অন্ধকারে তার ছেলে ও মেয়ে নিশ্চিহ্ন। অনুপম মরে যাচ্ছে। কিন্তু অনুপম মরবেনা। সে মুক্তি চায়। সে আলোক চায়: ক্ষুধার মত সে জ্বলতে চায়। অনুপমের জীবন তার পায়ের তলায় আর তিনি তাদের মধ্যস্থলে। তার নিরাপদ, নিঃসীম, নিগর্ভ শূন্যতা দিয়ে ঠাসা এই বাড়ী এই মাধ্যমিক বায়ুমণ্ডল। তাই অনুভা যখন রাত্রে একসময় তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল ত্রৈলোক্যবাবুর মায়া হয়। তার মুখের লুকানো অবসাদে আলো পড়েছে। তিনি উঠতে চেষ্টা করলেন। তার কপালের উপর থেকে চূর্ণ চুলগুলিকে গভীর স্নেহে সরিয়ে দিতে—নিঃশ্বাস দিয়ে মুছে ফেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কপালের রাশিকৃত ঘামগুলি।

* * *

অনুভা ছাদে উঠে এল। শান্তি! শান্তি! গভীর শান্তিতে হাওয়াগুলি ঈষৎ আন্দোলিত হয়। আর অনেকদূর আকাশে চাঁদ উঠেছে। প্রতিপদের চাঁদ। শীতল জোছনায় ছাদ ভরে গেছে। খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল অনুভা। তারপর এসে দাঁড়াল আলিশার ধারে। যতদূর দেখা যায় বাড়ীগুলির উঁচুনীচু মাথা অনেকদূর অবধি গিয়ে এক রহস্যময় দুর্নিরীক্ষ্যতায় হারিয়ে গেছে। ঘুমন্ত, নিরুশ্বাস পৃথিবীর মুখের উপর উঠেছে এই শান্তির চাঁদ। দাদা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ডাকবে তাকে! কিংবা তার বাবাকে গিয়ে তুলবে! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনুভা। অনুপমকে ডাকতে তার ইচ্ছা হল না। সে উঠলেই ছটফট করে

উঠবে ব্যস্ততায়। কি বক্তৃতা শুনলে আজ—পরজন্মবাদ। ত্রৈলোক্যবাবুর সেই একটানা, অবিশ্রান্ত কণ্ঠস্বর তার মাথায় খানিকক্ষণের জন্য ঝিমঝিম করে ওঠে। এরপর সে কি করবে! সামনের দৃষ্টিসীমাবহির্ভূত বাড়ীগুলির অস্পষ্ট মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল।

—এরপর কি করতে চাও তুমি। অনুপমকে সে ডাকবে কিনা সে স্থির করতে পারল না। আকাশে মেঘ নাই। ছায়াপথটি সাদা ধোঁয়ার মত আকাশে লম্বমান। আকাশে অনেক তারা। কিছুই করেবে না সে। দিনাজপুরে আর সে যাবে না। তার করা শেষ হয়েছে। সে এসেছে। কখন তার চোখে জল এসেছে সে বুঝতে পারে নি। সে এসেছে। তার আসার যন্ত্রণায় আর ব্যথায় তার সব কিছু ফুরিয়ে গেছে। দু' হাতের মধ্যে মুখ রাখলে অনুভা। কেন এল সে! কে এল সে! অনুভা কাঁদছিল। সবকিছুকে ছেড়ে মুক্ত হবার দুর্বিষহ শান্তি তার বুক তোলপাড় করে। দুই তালুর মধ্যে মুখ রেখে সে অজস্র কাঁদলে।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

:

পার্টির সঙ্গে বিকাশের গোল বাধল। কিছুকাল থেকেই তার মনে হ'চ্ছিল এ'পথ তার পথ নয়। সকলের সঙ্গে সমান হতেই সে চায়। কিন্তু এ'পথে তাব পা এগোয় মন পেছোয়। অথচ সে স্বীকার করতে রাজী নয় যে সে counter-revolutionist. সে বিপ্লব চায়। দুঃখ চায় না সুখ চায়। সুখী করতে চায় তার পরিবেশকে, পারিপার্শ্বকে। সকলে সুখী হলেই তবে যে কোনো কারুর সুখ। না হ'লে হাজাব সুখের মধ্যে খচখচ করে বিঁধবে কাঁটা। রাজী সে তার জন্য লডতে। তার সর্বশক্তি উদ্দীপ্ত করতে। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে বিযুক্ত করে নয় নিযুক্ত করে। কিন্তু এ'ত গডপডতা! গড়পড়তা মন—মানে ঐতিহাসিক মন! তাই কি? গডপড়তা মত—মানে ঐতিহাসিক মত। তাই কি?

এরা বলে ডায়লেটিক। বলে, রাশিয়া। মার্ক্সের আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে তাদের পার্টি পরিচালিত হয়—মানে কম্যুনিজিম। অর্থাৎ তারা কম্যুনিষ্ট। কিন্তু মার্ক্সের বইয়ের সঙ্গে তার যতটা মত মেলে মার্ক্সিষ্টদের সঙ্গে তেমনি তাব বনে না। আসলে, তার মনটা হল ঐতিহ্যমুখীন। ভারতীয় ঐতিহ্যের আভিজাত রক্তে সে অলঙ্কৃত। রক্তে রক্তে তার এ্যারিষ্টোক্রেসী! সে ফিনফিনে দেশী ধুতি ছাড়া পরতে পারে না, শারীরিক পরিশ্রম তার সহ্য হয় না। সে গান ভালবাসে, প্রেমের কবিতা লেখে। তার ব্যবহার ভদ্র, আলাপ পরিশীলিত, রুচি সুসঙ্গত। পরিমাণবোধ ও সুষমাসঙ্গতি তার চরিত্রের সহজ উৎস। তার ভালবাসায় ভাণ নাই। কিন্তু সে ভালবাসা দানের। সে দান গর্বের নয় সকলের সঙ্গে নিযুক্ত হবার উৎস। দেওয়ায় সে নিঃশেষ হতে রাজী—সেই তার ব্যক্তিত্বের জোর, রচনার জৌলুষ। তার রচনার মধ্যদিয়েই একদিন সে সৃষ্টি করবে নন্দলালের

রেখাচিত্রের মত জীবনের অনায়াস উচ্ছ্বাস, যামিনী রায়ের সাবলীল তুলির টানের মত একদিন তার লেখা খুঁজে পাবে সরল, বলিষ্ঠ, লোকানন্দ গতি! তার সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তার রচনার মধ্য দিয়েই সকলের সঙ্গে উপভোগ করতে চায় সকলের জীবন, সাম্যের জীবন।

আসলে, তার মনটা পলিটিক্যাল নয় মেটাফিসিক্যাল। কিন্তু গ্রহণ যারা করবে তাদের দিক দিয়ে যে কত গণ্ডগোল সে তা' জানত না। অবশেষে গণ্ডগোলটা চরমে উঠল 'সাম্যবাদের আওতায় সাহিত্য'শীর্ষক একটি প্রবন্ধ নিয়ে। কার্যকরী সমিতি তাকে প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে নিষেধ কিংবা, কয়েকটা জায়গায় কিছু অদল বদল করতে উপদেশ দিল। বিকাশের বক্তব্য ছিল এই যে, সাম্যবাদ নির্ভয়ে গ্রহণযোগ্য কিংবা বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র অবলম্বন কিনা এর নিরূপণ ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রের দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যায় পাওয়া যাবে। এ' সম্বন্ধে সে যথেষ্ট অবহিত নয়। সাম্যবাদের কাম্য হিসাবে সে যে'টুকু জানে তাই যদি তার স্বরূপপ্রকৃতি হয় তা'হলে সাম্যবাদে তার অনিচ্ছা নাই। কিন্তু, এরজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে কতগুলি অনিবার্য সত্যকে একটেরে করে রাখলেই সাম্যবাদের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা আসবে এ কথার তাৎপর্য তার কাছে অজ্ঞাত। কতগুলি বিশেষ পুষ্টির জন্য কতগুলি প্রচলিতকে পিষে মারা (এই কথাটি তাদের বক্তৃতায় কিংবা প্যাম্‌ফ্লেটএ ঘনঘন ব্যবহৃত হত) এই কথাটি যখন তাদের নীতিস্বরূপ তারা বলে তখন অজ্ঞাতেই কি ইতিহাসকে অস্বীকার করে না। দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক গতিবেগে সাম্যবাদ একটি অনিবার্য বিকাশ। সুতরাং পিষে মারবার চেষ্টা পণ্ডলক্ষণাক্রান্ত। তারপর কোনো অস্তিত্ববান পদার্থের অস্বাভাবিক বিনাশ সর্বদাই প্রতিক্রিয়াপন্থী। সুতরাং ঐ ক্রিয়াটি ঐতিহাসিকভাবে সার্বিক ও স্বাভাবিক নয়। প্রত্যেক যুগের সাহিত্য যে তার অর্থনীতির উপর আস্থাবান এই গভীরতম সত্যটিতে সে বিশ্বাসী। দেশে দেশে, যুগে যুগে এই অর্থনীতিক পরিবেশিতায় সাহিত্য বিধৃতবান। অর্থনীতিক পংক্তিভেদে সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামে ভারাক্রান্ত সেখানে সাহিত্যের বিশেষ ও একক নীতি আবিষ্কার করতে যাওয়া ভাঁড়ামী মাত্র।

দেশগত সাহিত্য কিংবা সমাজগত ইতিহাস যেমন সার্বজনীন নয় তেমনি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক বিশৃঙ্খলায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব একটি বিশেষ জাতির কয়েকটি probabilityকে স্ফীত করবার নাম যেমন সাম্যবাদ নয় তার আওতায় সাহিত্যের সার্বজনীন সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যাওয়ার চেষ্টা হাস্যকর ভাবে বাতুলতা। উপরন্তু, প্রচলিত সাহিত্যে, অর্থাৎ চলে-আসা সাহিত্যে, মানে বুর্জোয়া সাহিত্যে অর্থনিতীক সহযোগীতার বাইরে একটি বিশেষ অবদান দেখা যায় যেখানে সে স্বয়ংসিদ্ধ। ( art for art's sake কি all art must be dedicated কি art for my sake এ সব নিয়ে তর্ক বিষয়ান্তরে মাথা-গলানো) এই স্বয়ংসিদ্ধতা অর্থনীতিক অতিরিক্ত কোনো প্রাণশক্তি যেখানে জনমনের সঙ্গে তার নিগূঢ় সংযোজন। সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রাণশক্তির একটি নির্দেশবান গতিশীলতা আছে, ( পুনরায়, প্রাণধর্ম নিয়ে আলোচনা সে এখানে অনাবশ্যক মনে করে) এই অন্তর্লীন সাহিত্যিক গতিবেগে probabilityর দ্বন্দ্ব স্বীকার্যমান কিন্তু বস্তুতন্ত্রের অতীত কোনো বাস্তবতায়। কারণ, ব্যক্তি ব্যষ্টির সঙ্গে নিরপেক্ষ ভাবে সংযুক্ত থাকায় তার ইতিহাসে নিয়মতান্ত্রিকতা সূচিত হয় না। অতএব এমন সাহিত্য যদি বর্তমানে সৃষ্টি করবার প্রয়োজন পড়ে যা' ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রিক ভূ-তত্ত্ববাদকে সম্পূর্ণ মেনে নেবে তা' তার আয়ত্ত ও জানাশোনার বাইরে। তার উপরোক্ত যুক্তিগুলি যদি কন্‌ভেন্‌শন হয় তাহলে তার লজ্জিত হবার কারণ নাই। সে জানে conventionalism is highly reasonable only when it is maintained. বিকাশ তার পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে।

পার্টির দলপতি বিকাশের মন্তব্যের উপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে তার বর্তমানে কিছু বক্তব্য ছিল না। তিনি বিকাশকে পার্টির কর্মজীবনের প্রণালী লক্ষ্য করতে আন্তরিক অনুরোধ জানালেন। একদিন এই পত্রিকা ছিল পরিষদের মুখপত্র আর তার মূলনীতি ছিল দেশের মাটিতে practical politicsএর সার দেওয়া। ক্রমশঃ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পথ নির্মাণ হয়েছে। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর এক গভীর ও বিস্ময়কর ওলোট পালট ঘটে গেছে। দেশের সংগঠন কাজে তাদের দায়িত্ব ক্রমস্বীকার্যমান।

পশ্চিমের যুদ্ধ পূর্বে আঘাত করেছে। সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য দেওয়াল সম্প্রতি বিধ্বস্ত। এই আসন্ন বিপর্যয়ের মধ্যে তারাই নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে পারবে যাদের আছে সংগঠন ও একসঙ্গে মিলিত হবার একটি নিবিষ্ট প্রেরণা। এই প্রেরণাটিকে শরীরি করে তুলতে হবে ঐতিহাসিক কর্মিষ্ঠতায়। সেই ঐতিহাসিক বেগ মার্ক্সিজিম। Probability সম্পর্কে বিকাশ যা' বলেছে তার মধ্যে যুক্তির আলোক আছে। কিন্তু, এই যুক্তির ক্ষেত্রটি ব্যবস্থা ও অনুষঙ্গ ভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য। মোটামুটি এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে ব্যক্তিগত probabilityর ক্ষেত্র কমিয়ে আনতে পারলেই ব্যষ্টিগত সম্ভাবনা সক্রিয় হতে পারবে। এ'হ'ল আত্মরক্ষার স্থূল প্রণালী। এই সামান্য সত্যটুকুও মেনে নিলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, একদা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক আওতায় ও পরিবেশে সাহিত্য যদি জৈবজীবন থেকে বিভক্ত হয়ে থাকে আজকের জাগতিক পরিক্রমণে জৈবিক হয়ে উঠাও নীতি হিসাবে অচল হবে কেন ( যখন একথা সত্যি যে সমস্ত সভ্যতার গতি একটি যুদ্ধোত্তর অধিকেন্দ্রের দিকে ) দেশ কাল ও সময় সম্পর্কে বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর angleএর অভাব ছিল। Capitalist systemএ ধন অসাম্যের ইতিহাসটা নিয়মতান্ত্রিক হয় না—দেশ কাল ভেদে এর চেহারা বিভিন্ন তাদের পন্থাও যৌগিক। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরসিপের তফাৎ আছে। ভারতবর্ষের শোষণনীতির ভেতর নবতম প্রণালী আছে। কিন্তু সাম্যবাদ জগতে সমস্ত পরিণতির একটি মাত্র উদ্দেশ্য। এই অবিচ্ছিন্ন উদ্দেশ্যের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে তার probabilityর উপরে চাপ দেয়। ইতিহাস সম্পর্কে বিকাশ যা' বলেছে তা প্রণিধাণযোগ্য। জড়ত্ব ভৌতিক বিজ্ঞানের নিয়মে মৃত লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু নিজের স্বার্থকে ফাঁপিয়ে তোলাই এখানে ঘটনা। এটা যে কোনো যুগের সাধারণ কাহিনী। এর চাপে কেউ যদি বিনষ্ট হয় বুঝতে হবে ঐতিহাসিক ভাবে তা বিপর্য্যস্ত। ব্যষ্টিগত স্বার্থে যা জীবন্মৃত ব্যক্তিগত পরিবেশে তাকে চিহ্নিত করতে যাওয়া শুধু অযৌক্তিক নয় অনেকটা অলৌকিক।

তাদের মতামত নিয়ে আলোচন চলল। বিকাশ শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে তার সম্পাদকীয় পদ। অমূল্য খুব দুঃখিত হল। বললে, তুমি চলে যাবে বিকাশ দা,

কাগজ এবার ফাঁসবে। এই সুযোগে বলে রাখা দরকার তাদের পার্টির সেক্রেটারী আমাদের পূর্বপরিচিত মার্শিষ্ট। তারই প্ররোচনায় অরুণা এসে দলে নাম লিখিয়েছিল। অরুণা বর্তমানে একজন উৎসাহী কর্মী। এবং খুব সম্ভবতঃ সেই এবার কাগজ সম্পাদন করবে। তবে কার্য্যকরীভাবে খবরটা প্রকাশ হয়নি।

অমূল্য বিকাশকে খবরটা জানালে।—এইবার সাহিত্য বিভাগের বদলে প্রসূতি বিভাগ না আমদানী হয়। মেয়েরা করবে সাহিত্য! বোদলেয়ার পড়তে বসে যাদের হাই উঠে! মেয়েদের প্রতি তার উষ্মা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তার প্রণয়কাহিনীর প্রচলিত পুনরাবৃত্তি ঘটে গেছে। সেই strange fits of passion that have I known—চোখের মধ্য দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া! একটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্তকালের পুঞ্জীভূতি! মেয়েটির একদিন বিয়ে হয়ে গেল। ফুল দিয়ে মোটরে একটা ময়ূরপঙ্খী তৈরি। প্রথমটা অমূল্যর চোখে জল এসে গেছল। তারপর তার ঘৃণা এল। সেই কালো কাঠন চোখ আর তাতে সুখের নধর ছিট; সরু কোমর, মৃদু, সর্পিল গ্রীবা। এক গভীর বিবমিষায় সে উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে। একটা পার্কে এসে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে। বিহ্বল চোখে দেখলে আকাশের প্রান্তে ওঠা নির্বোধ গোলাকার চাঁদ; আর আকাশটা ফ্যাকাসে, এ্যানেমিয়া রুগীর মত। একসময় সে ভুলে গেলো। উঠে রেস্তোঁরায় খেলে এক কাপ চা ধরালে একটা সিগারেট তারপর নজরুলের একটা গজল ভাঁজতে ভাঁজতে হোষ্টেলে এসে উপস্থিত হল। সে মনে প্রাণে কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠল।

—তুমি আজও প্রেমে পড়নি, অমূল্য বলছিল,—তাই ব্যক্তিত্বকে আজো নিষ্ঠুরভাবে মান্য কর। প্রত্যাখ্যাত হওনি তাই সত্যিকারের সাম্যবাদী নও। মেয়েদের মন নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখছে সে। শোপেনহাওয়ারও নাকি এত আনুপূর্বিক লিখতে পারে নি।

বিকাশ যখন দল ছাড়ল অনুপমের ভেতর দ্বিধা আবার মাথা উঁচু করল। কম্যুনিজিম সম্পর্কে তার কোনো ব্যবহারিক চিন্তা ছিল না। হঠাৎ সে যেন

ছবির মত তার চেহারা দেখতে পেলে। তার ভিতর দিয়ে নিজের প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল। কোনো অভ্যস্থ পটু শৃঙ্খলে আমাদের প্রাণধারণ সমাপ্ত। আমরা ক্ষইছি। কেননা জীবনে আমাদের ব্যবহারিক সংগ্রাম নাই। কামনার উজ্জ্বল একাগ্রতা, চেতনার উলঙ্গ উজ্জীবিচ্ছা। আমাদের মধ্যকার উৎপাদন নাই। অনুপমের চিন্তাপ্রণালী অনেকটা এই ধরণের: ইনডিভিডুয়ালকে স্বীকার করলেই চোখ বুজোতে হবে যন্ত্রসভ্যতার দিকে। অথচ ইতিহাসের এই অনিবার্য অধ্যায়টিকে না মানবার যুক্তি কি! হেগেলের মতানুসারেই যে পৃথিবী পরিক্রমণশীল তার প্রমাণ কোথায়। 'সত্য' বোধটি কি একটা উপলব্ধি নয় যা' কেবল জৈবিক পরিবেশিতার মধ্যে ব্যক্তিক সত্তায় চিহ্নিত। অথচ এই চিহ্নমান সত্তায় মানুষের মধ্যে ছোটখাটো বিভক্তিগুলো কেমন করে সমাজগত সমর্থন পায়। আসলে, হয়ত আমাদের মধ্যে নিরাবৃত্তি আসতে পারে এমন জায়গায় আমাদের যুক্তি ও চিন্তার প্রবেশাধিকার নাই। এই কথাটি হয়ত ঠিক। পেসিমিজিমকে তার ব্যক্তিগত জীবনে স্বীকার করতে আপত্তি—নিজেকে সুখী করতে পারে না এই ধারণায়। ঐতিহাসিক নির্দেশ দরকার যাব মধ্যে সংগঠন আছে। কারণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়েই ইতিহাস গতিমান। Democratic constitution স্বীকার করব কেমন করে যতক্ষণ আমাদের উৎপাদন ও বণ্টনে শ্রেণীভেদ থাকবে। কোনো বৃহৎ সত্তায় ব্যক্তি ক্ষীণায়ু হলেও প্রতিশ্রুতিশীল। ব্যক্তিবাদের ক্রমোন্নতির দ্রুততায় শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ কি সম্ভব! ব্যক্তিগতভাবে সার্থকতা চাইতে গেলেই সংগঠনকে অস্বীকার করতে হবে। নর্মালকে অতিক্রম করার নামই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো ব্যক্তিত্ব নির্ভাঁজ নয়, ইতিহাসের পাদপূরণ। এ'দিকদিয়ে চিন্তা করে ডায়লেটিক্‌কে পুরোপুরি মানতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিত্বই একটি পরিণামমুখী পরিক্রমণশীলতা যা' নিজের চারপাশে একটি অকাট্য শূন্য নির্মাণ করে রাখে—যা' ঐতিহাসিক নিরূপকতার বাইরে। এই ব্যক্তিত্ব মরে না। ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে গোপন করে চলে, তারপর নিজেই একদিন ধারাবাহিকতা পায়, নিজেই সৃজিত হয়—ব্যাপ্ত হয়। অনুপম ধাঁধায় পড়ল। বিকাশকে জানাল তার কথা।

—পার্টির পলিসি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

—পার্টি তোমাকে আমাকে চায় না। তার পলিসি রপ্তানী হয় সাগরপার থেকে। অথচ আজকের জনগণ বলতে বোঝায় তুমি আমি।

—বলতে চাইছ কংগ্রেস।

—আপত্তি কি। বলবে মিডলক্লাস ইনটারেষ্ট—ন্যাশানালিজিম। আমার উত্তর এই যে, সেইটাই আজকের দেশ : দেশের শক্তি। ভুলে যেও না, সামন্তপ্রথা আজও শেষ হয়ে যায় নি কেবল খোলস পালটাচ্ছে। দেশের ক্যাপিটল এখনো ছড়ায়নি কেবল মুখ দেখাচ্ছে। চীনের কুম্যুনিজিমের দিকে তাকাও। রাশিয়ার বলশেভিজিমের সাক্‌সেসের আগে ইনডাষ্ট্রিয়াল রেভুল্যুশন দরকার হয়েছিল। আর communism in one land মানেই nationalism—এত প্রমাণ দেওয়া যায় আশা করি তা' তুমি নিশ্চয় চাইবে না।

—কিন্তু পৃথিবীতে বাঁচতে গেলেই তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে মানতে হবে। আবার যুদ্ধ বেধেছে এবং এই যুদ্ধ আমাদের উপর আসবে।

—যুদ্ধ আমরা চাই না—আমাদের মর‍্যাল এতে নাই।

—তুমি চাও বা না' চাও এটা ঘটনা—এড়াবে কি করে।

—অর্থাৎ জাপানকে রুখতে হবে। লড়াইয়ে যোগ দিতে হবে।

—নয়ই বা' কেন! বেঁচে থাকতে গেলেই লড়তে হয়। অন্যদিকে বেঁচে থাকার নামই লড়াই। যখন যেমন তখন তেমন। আজ ফ্যাসিজিম কাল ইম্পিরিয়লিজিম।

—কিন্তু বেঁচে থাকতে চাই কেন : সুখের জন্য, শান্তির জন্য ; কে বলেনি একথা। কিন্তু সুখী আমরা কতদুর হয়েছি। আর কি করেই বা জানবো সভ্যতার মানে কি ? সুখের মূল কোথায়।

—একমাত্র তোমাকে দিয়েই বোধ হয় এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে পারো।

—কিন্তু তার গ্যারাণ্টি কোথায়। জাপানকে রুখলেই আসবে বলতে চাও' ত গায়ের জোরে বল। ফ্যাসিজিম বরবাদ হোক চাই। কিন্তু ইম্পিরিয়লিজিমের শিকড় আলগা হবে কিসে ? ডায়লেকটিক। ওটা চালাকী—এ' জায়গায়

ধাপ্পাবাজি। আমরা আমাদের শক্তি নিয়ে লড়ছি কোথায়—পরের হাতের হাতিয়ার হয়ে অপরের জোর বাড়াচ্ছি। ফ্যাসিজিমের নীতি আমাদের কাছে পরোক্ষ কিন্তু আড়াই'শ বছর ধরে যে নীতি তোমাকে ঝাঁজ্‌রা করে দিয়েছে তাকে অস্বীকার করবে কি করে। ফ্যাসিজিম হটিয়ে যদি ইম্পিরিয়লিজিমের সঙ্গে লড়তে পারি—ইম্পিরিয়লিজিমকে হাটিয়ে ফ্যাসিজিমের সঙ্গে লড়তে পারব না কেন। সে'ত দেশের আবহাওয়ার পক্ষে সহজ। সোজা কথা আমি বেঁচে থাকতে চাই আমার দেশের ঐতিহ্যের মাঝে—কোনো সভ্যতায় যখন কোনো হদিস নাই তখন দেশ কাল পাত্রর মধ্যেই সম্পূর্ণতা চাইতে হবে।

—কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখো—যা' নিরপেক্ষ। ভবিষ্যতের গর্ভে যার প্রতিশ্রুতি। এই খানেই'ত political outlook.

—সে'ত নিরবচ্ছিন্ন সময়। তার জন্য যে প্রস্তুতি সে'ত দেশ-কাল পাত্র-হীন আন্তর্জাতিকতা। অর্থাৎ permanent revolution. ওদিকে ট্রটস্কির মাথায় হাতুড়ি মেরে'ত কাবার করেছো। কিন্তু তোমার আমার বেঁচে থাকা তার মাঝে কি সদর্থ পাবে। ভবিষ্যতের মধ্যে প্রতিশ্রুতি কিন্তু বর্ত্তমানই'ত ভবিষ্যতের বীজ।

—কিন্তু এ'ত সত্য কথা যে বেঁচে থাকা মানে নিজেকে বিকাশমান রাখা। যখন গতি ফুরোলো তখন মৃত্যু—যে কোনো অর্থেই ধরো। আজকের রাষ্ট্রশক্তি যে ব্যাপক অর্থে চলমান তার সঙ্গে যদি যোগ হারিয়ে যায় তার মানেই মৃত্যু। দুটো বিরাট শক্তি আজ পাগলা ষাঁড়ের মত লড়ছে। মরবে একটা নিশ্চয়। তোমার স্বার্থ আজ যে কোনো একটা দিক নিতে হবে। তৃতীয় শক্তি হিসাবে তুমি বাঁচতে পারো না। কারণ এই যুদ্ধের পরিণতির উপর ভবিষ্যতের বনিয়াদ দাঁড়াবে। রাশিয়া হাত মিলিয়েছে মিত্রপক্ষে, এই যুদ্ধের রাশিয়া একটা দিক। Father-land of socialismকে বাঁচতেই হবে পরের যুদ্ধের জন্য। আজকে নিরপেক্ষ থাকা মানেই যুগ-অচেতন হয়ে থাকা।

—সমস্যা'ত সেইখানেই। আমার বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই'ত এখানে বাতিল। বিকাশের ধারা নিষিদ্ধ, অপাংক্তেয়। রাশিয়া হাত মিলিয়েছে কিন্তু আগে সে

রাশিয়া, মানে, সোভিয়েট রাশিয়া তারপর সে মিত্রশক্তির একজন। কোথায় আমাদের আগে ভারতবর্ষ তারপর মিত্রশক্তির একজন। ক্রীপস প্রস্তাবের বেশী তারা যেতে চায় না কেন! তাদের উদ্দেশ্যের সাধুতা কি করে প্রমাণ হবে। আমাদের লড়া মানে ইম্পিরিয়লিজিমের এজেণ্ট হয়ে লড়া; রাশিয়ার লড়া মানে সোভিয়েটের লড়াই। মাথা নেই তুমি খুঁজছ মাথা ব্যথা। কাল বাদ পরশু আবার সেই পুনর্মুষিকভব। তোমার ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে'ও বলতে হবে যে দুটো শক্তি আজকে পরস্পর লড়ছে কালকে তাদেরই একজনের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে Father land of socialismকে কিংবা বিজেতা শক্তির সঙ্গে অজাঙ্গী হতে হবে। কংগ্রেসকে স্বীকার করা বৃটিশ ইম্পিরিয়লিজিমের পক্ষে বরং সহজ। কারণ, সেইটা দেশের ক্যাপিটালিষ্ট ফোর্স। আজকে দিশী ক্যাপিটালিষ্টরা চাইছে বিদেশীদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে—করবে'ও। সেইটারই নাম আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম। যদিও লড়াইটা দেশী পুঁজিবাদীর সঙ্গে বিদেশী পুঁজিবাদীর তবু স্বার্থটা মূলগত এক—তাই কালকে পরস্পরের উপর নির্ভর করতে চাইবে স্যোসিয়লিজিমের আটক হিসাবে। তখন আমাদের ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরে। এর চেয়ে ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাক। আমার কি!

—কিন্তু তোমার সেই চিরন্তনী বেঁচে থাকা। নিরপেক্ষ থাকবে অথচ চেতনায় বেঁচে থাকবে এ'ত ম্যাজিক। আরো, তেমন করে যদি বাঁচতে পারো পুরোপুরি ঠেলে উঠতে হবে সোজা মিডলক্লাস ইনটারেষ্টের চরমে। যার শেষ পথ ক্যাপিটালিজিম। সেই গোলাকার গর্ত।

—নিরপেক্ষ আমি থাকতে চাই না। আমি বিপ্লব চাই। কিন্তু আজকের ঘটনাগুলো সচেতনভাবে মেনে নিয়ে। স্যোসাল ইভোল্যুশনের প্রিমিটিভ ষ্টেজ থেকে লাফিয়ে স্যোসিয়লিজিমের পূর্ণ পরিকল্পনা একপ্রকার মায়বিক আতিশয্য। মাঝখানের এই national capitalismএর সামনা সামনি হতেই হবে। বিপ্লব দীর্ঘ ও দ্রুত করে সংক্ষেপ করে নিতে পারি আমরা, কিন্তু এড়িয়ে যাব কি করে। তুমি কি মনে করো জীবনের কোনো একটা দিক দিয়েই আমরা নিজেদের বাইরে নিয়ে যেতে পারবো। এইখানটাই তোমাদের পার্টির সঙ্গে বনে'না পম।

তোমরা বল দুর্বল। কিন্তু আমি দুর্বল নই। কারণ আমি খাঁটি কারণ, আমার ঐতিহ্য ভারতীয়। কারণ, ভারতীয় ঐতিহ্য সংবেদনশীল।

—তুমি ডিমোক্রাট বিকাশ। অনেকটা Leekyর মত। তুমি যা' চাইছ চিন্তার এ্যারিষ্টোক্রেসী। যেখানে সমস্ত ঐতিহ্যটা ধ্বংসের দিকে—যা passive. তুমি নিজের ব্যক্তিত্বকে হয়ত কাঁপিয়ে দেখছো। এ'ও আমি ভেবে দেখেছি বিকাশ যে, বোধ হয় এইজন্তই প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের উল্টো পথে গড়ে ওঠে। আর মানুষের বেঁচে থাকবার প্রণালীতে এই দ্বন্দ্ব অস্বীকার করা যায় না। দ্বিধা আর সংশয়ের মধ্যেই পেসিমিজিমের বীজ। নেতির মধ্যে কোনো উৎপাদন নাই। কিন্তু মানুষের নির্মোহ হ'বার রাস্তাটাই'বা কি! Factsএর উপর আস্থাবান হওয়া, পৌনঃপুনিকতার মধ্যে জীবন দর্শন! যে দিক দিয়ে পৃথিবীর যাওয়া উচিত ছিল তা' যায় নি। মানুষের শুভবুদ্ধির সাথে প্রকৃতির এই লড়াই চলেছে ভৌতিক জীবনের অনধীত কোনো কেন্দ্রে। প্রকৃতির এই নির্বাচনশীল শক্তির সঙ্গে মানুষের গ্রহিষ্ণু ক্ষমতা সবসময়ই পাল্লা দিচ্ছে। তার ফলে নিজের মধ্যেই আমরা পালটাচ্ছিনা বদলাবার প্রভূত ক্ষেত্রও নির্মাণ করে রাখছি। মানুষের অভ্যাস, স্মৃতি ও ক্রিয়ার মধ্যে তার বীজ বর্তমান। কিন্তু মানবিক শুভবুদ্ধি যার প্রেরণায় চিরকাল একটি ফলবান ও অখণ্ড অধিকেন্দ্রিকতার দিকে তার সভ্যতার এই ব্যর্থ পরিক্রমণ তার মূলে কিসের প্রতি বিশ্বাস। এই খানেই আমার সমস্ত জিজ্ঞাসা। এই যে বিশ্বাসের জন্য লড়াই এইখানেই কি আমাদের বাস্তবতা বোধ নয়? বিশেষ করে আমাদের চেতনা যা' ক্রমশঃই ধারালো হয়ে উঠছে। কিন্তু এই চেতনার মানে কি?

—ঠিক বলতে পারবো না তবে যদি আমাকে বলাতে চাও আমি এমনিভাবে জিনিষটাকে প্রকাশ করতে পারি: Conciousness to perpetuity.

—বোধ হয় তাই। কারণ, এরচেয়ে ভাল করে আমি প্রকাশ করতে পারতুম না। কিন্তু এর ব্যাখ্যা দেবে কি?

—আমার বেঁচে থাকা। ঘটনার মধ্যে সজীব হয়ে থাকা।

—কিন্তু কথাটা'ত এইখানেই। সমাজবোধটাই যেখানে বিস্মৃত শ্রেণীসংগ্রামকে

সেখানে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সেখানে তোমার বেঁচে থাকার ভেতর porpetuityর বোধ আসছে কোথায়।

—Materialistic phillosophy যদি একমাত্র নজির ধরো তবেই তোমার সন্দেহ জোর পায়। কিন্তু সে দিক দিয়েও দেখো: রাষ্ট্রিক পটভূমি যদি এক হয় তা'হলে এই conciousness থাকে কোথা। চেতনাটাই তখন বাতিল। ডায়লেকটিকের প্রাণ যদি হয় class struggle—class-less sociteyতে আইনতঃ ডায়লেকটিক নসাৎ করে দিতে হয়। বস্তুতন্ত্রের ব্যাখ্যাত গোটা মার্ক্সিজিমটাই তখন ধাপ্পাবাজী হয়ে দাঁড়ায়।

অনুপম চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ভ্রূ কুঁচকে ভাবলে। এদিক থেকেও'ত ভাবা যায়! কিন্তু সে'দিক দিয়ে তার বক্তব্য নয়। খানিকক্ষণ বাদে বলে, —যে তরফ থেকে তুমি কথা বলছ তার মধ্যে তোমার কনভেনশন্‌টাই আসল। ধরে নিচ্ছ যে, মানুষের চেতনা একটা স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপার, কারণ, এর পিছনে একটি বিস্তৃত ফিলজফি আছে। অন্তটা: চেতনার যে দিকটাকে ইঙ্গিত করে যুক্তি দিচ্ছ সে'দিকটা অস্বীকার করলেই ইভোল্যুশন শিঙে ফুঁকবে—কিন্তু এ'কথা তুমি মানবে যে প্রত্যেক সভ্যতা তার রাষ্ট্রের বাইপ্রোডাক্টস। এর ফলটা মারাত্মক। চেতনা আসলে চাপবোধ। এর ব্যষ্টিগত ও ব্যক্তিগত দুটো আলাদা ক্ষেত্র আছে। সভ্যতার পটভূমিকায় এই চেতনা একটি ব্যাপক সামাজিক চাপবোধ। যেখানে রাষ্ট্র কয়েকজনের বিশেষ সুখ সুবিধার যন্ত্র সেখানে এই চেতনা সাধারণতঃই প্রতিক্রিয়াশীল, সকীর্ণ ও দলগত। কিন্তু সোসিয়লিজিমে সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সেখানে তোমার আমার প্রত্যেকের চেতনা একটি ব্যাপক চাপবোধের ফল। চেতনাটা নিষ্ক্রিয় এইটা ছিল তোমার যুক্তির law of gravity. কিন্তু ব্যাপারটা তা' নয়। কারণ এমনি ভাবে দেখলেই বোঝা যাবে এর উৎপাদনশীলতা। আমাদের ব্যবহারিক চরিত্রগুলি যার রূপান্তর। আর তারই অনুপাতে আমরা পৃথকভাবে একই সমাজবোধের সঙ্গে যুক্ত। আসলে conciousnes to perpetuity এই খানেই সম্ভব। সবাই মিলে এক এবং একই সমস্ত: এটা Monisim বা Pantheism নয় এইটাই বোধ হয় Materialistic socialism.

অনুপমের তবু সংশয় গেল না। ইতিমধ্যে বাংলার নিকটবর্তী দু'একটি সহরের কারখানায় ধর্মঘট ঘটে গেল। তার ঢেউ বাংলায় এসেও লাগল। যুদ্ধ ক্রমশঃ ভারতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, আতঙ্ক আর অস্বস্তি। অরুণা আর মার্ক্সিস্ট দুজনে সফরে বেরিয়েছে। বিশেষ করে দু'একটি জায়গায় ধর্মঘট হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। অনুপমই বর্তমানে তাদের ইউনিয়নের কার্যকরী সম্পাদক। প্রত্যেকটি অংশে তাদের কর্মের উৎসাহ। সহরের উপকণ্ঠস্থ কারখানা অঞ্চলে, গ্রামে, একটার পর একটা ইউনিয়ন তৈরি হচ্ছে। রাষ্ট্রিক সুবিধা ও সুযোগ পিছনে থাকায় প্রত্যেকটি কাজে তৎপরতা সূচিত হচ্ছে। শত্রু সামনে। শত্রু ডাইনে ও বাঁয়ে। অথচ অনুপম তার কাজের মধ্যে যথেষ্ট সন্তোষ পায় না। কোথায় যেন একটি গভীর অনৈক্য রয়েছে যেখানে তার চরিত্র প্রতিফলিত হতে পারছে না। অথচ সে কাজ-ই চায়। অফুরন্ত, অদম্য: কাজের মধ্যে সে বেগবান। তাদের কাগজ পত্রিকায় একটি সংখ্যায় তার একটি প্রবন্ধ বেরুল। সেটির সারাংশ এই:

দ্বন্দ্বমূলক ধর্মে যারা বিশ্ববেক্ষণা করতে অভ্যস্থ সীমানা তারা মানেন না। কারণ এই দ্বন্দ্ব কোনো একটি বিভেদবিন্দুর পরস্পর বিধর্মী বাস্তবতা; এবং এরই পারম্পর্যে সূচিত করে সভ্যতার মানবিক বিকাশ। অতএব প্রত্যেক বিকাশটাই একটি ক্রমাম্বয়িক ধারাবাহিকতা। ব্যক্তিগত ভাবে এই দ্বন্দ্বে বিশ্বাস করা শক্ত—সঙ্গে সঙ্গে সীমানা মেনে নেওয়া'ও সহজ নয়। মানুষের কৃষ্টি, বিজ্ঞান, সাহিত্য মানুষের আত্মিক অবদান। জীব হিসাবে মানুষ একটি প্রাগৈতিহাসিক উৎক্ষেপ। এর প্রচাপ দ্বন্দ্বময়। অথচ সবচেয়ে একটা লক্ষণীয় বস্তু এই যে, মানুষের আত্মিক অবদানের মধ্যে জীবগত কি জাতিগত 'নিরাপত্তাবোধ' একটি বিশেষ প্রচেষ্টা যা' অনস্বীকার্য। কোনো একটি অখণ্ড সমগ্রতায় ফলবান হবার ইচ্ছা মানুষের কল্পনায় একটি বেগবান উৎসাহ পায়। এই নিরীখবোধই আসলে সভ্যতার মাপকাঠি। সরল বাংলায় এই দাঁড়ায় যে, জীবগত ভাবে মানুষের বিকাশের যে ধর্ম আত্মিক বিকাশেও সেই অনুরূপকতাই যে অকাট্য এ'যুক্তি অবিসংবাদী হতে পারে না। কারণ, মানুষের মন যেমন বস্তু নিরপেক্ষ নয় তেমনি

বস্তুবাচকও নয়। অথচ আমরা জানি, জীবগত বিকাশের ক্রম্যাভিব্যক্তিতে 'মন' একটি বিশেষ উপলভ্যমান সংজ্ঞা। অন্তদিকদিয়ে আরো একটু দেখা দরকার নিছক ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ যেমন সম্পূর্ণ নয় তেমনি ব্যষ্টিগতভাবে ফলবান হবার পথও দুরূহ। আবার ব্যক্তি বা ব্যষ্টি পরস্পর বিধর্মী কোনো বিভেদবিন্দুর উৎক্ষিপ্তাংশ নয়। ব্যক্তিগত বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা বোধ-ই মানুষকে ব্যষ্টিগত চেতনায় একাত্মীভূত করে। মানুষের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিশেষ 'গতি' ( move ) পাওয়া যায় যার মধ্যে জৈবিক সীমার অতিরিক্ত আবেগ ( emotion ) আছে এমনি সন্দেহ উঠতে পারে। দার্শনিকদের মতে এই আবেগের তাগিদ রয়েছে বিশ্বশক্তির মূলে। এই দিকদিয়ে মানুষের 'বোধি'র স্ফুরণই সভ্যতার সূচিপত্র নির্মাণ করা সম্ভব। কারণ এই বোধি একটি ছন্দামুক্ত অভিব্যঞ্জনা যেখানে নৈবর্তিক প্রকৃতির খণ্ডবিহীন প্রতিভূতি প্রতিভাসিত। এই শক্তিকে যদি সভ্যতার পরিমাপে নিরীখ টানতে দেওয়া হয় তার আওতায় এসে পড়ে একটি চরম সত্য। (ultimate good) এই মতে মানুষের সৃজন ক্রমশঃই শুভতার দিকে অভিব্যক্তবান। এই শুভতা একটি আপেক্ষিক অর্থমাত্র নয় সম্পূর্ণ অবচৈতনিক প্রেরণা। অন্তদিকদিয়ে বলা খানিকটা দরকার যে, এই অবচৈতনিকতা মনস্তাত্ত্বিক কার্যভূমি নয়। মানব প্রকৃতির মূলে এই সন্ত-আবিষ্কৃত অবচৈতনিকতা ব্যবহারিক ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে প্রযুক্ত। মানুষের যৌনগত অবদমনের কার্যতঃ ও ফলতঃ ইতিহাস ব্যক্তিজীবনে হদিস পাওয়া গেলেও জাতীয় জীবনে ঐ কারণে সদর্থ খুঁজে পাওয়া দুরাশা মাত্র। যারা আবার মানেন যে এই অবচেতনা মানুষের বহুবিধ অবদমনের নির্ণয় কেন্দ্র—শুধু একক যৌন সংস্পর্শমান নয় তাদের মতে মানুষ যে আদিম অন্ধকার ও অনৈতিহাসিকতা থেকে উঠে এসেছে তার ক্রমবিবর্ধমান পথে এক বৈপ্লবিক বিস্ফোরক জমা হয়ে আছে মনের দরজাবদ্ধ কুঠরিতে। আর মনের পিছনে এই দুর্বোধ, দুঃসাধ্য, আদিম অন্ধকারের ছায়া জৈবিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে বহন করে আজো চলেছি। কিন্তু এই জানার ফলেই আমরা সুখী হতে পারি না। চেতনা শব্দের কোনো নিরূপিত অর্থ নেই। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি দুই

চেতনশীল কেবল বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তির মধ্যে। যে অবলম্বন পেলে আমরা চিন্তা করি তার অনুপস্থিত কতগুলো সুযোগে মানুষ অনুভব করে। কিন্তু একথা ঠিক মানুষের সভ্যতা রচনার পিছনে মানুষের thinking ও feeling দুই বর্তমান। কারণ দু'টোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্য অবধারিত। এর গতিশক্তি চেতনা ও অবচেতনার মধ্যেও ক্রিয়াশীল। কোনো একটি বিশেষ অর্থে একে প্রতিফলিত করতে যাওয়া চেষ্টা ও কষ্টসাধ্য। কোনো একটি কি কোনো একটির দ্বৈত ব্যঞ্জনা ও সংঘাত মানব সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ামক নয়।

মানুষের দলগত চেতনার প্রথম যুগে ছিল গোষ্টিবোধ, তারপর পরিবার বোধ, আজকের মানুষ রাষ্ট্রাভিমুখী (নানা তথ্যের মধ্যে এখানকার আলোচনাটি কণ্টকিত কাজেই আমরা বাদ দিয়ে গেলাম) এই রাষ্ট্রাভিমুখ একটি দুর্বিকল্প নৈরাজ্যবাদ। আজকের রাষ্ট্রিক আওতায় একের সঙ্গে অপরের সংযোগ কেবল উৎপাদন ব্যবস্থায়। এর ফলটা ফলেছে মারাত্মক। ক্রমশঃ একদল মানুষ বুদ্ধির উপর যারা নির্ভরশীল ঝুঁকছে ব্যক্তিবাদের স্বচ্ছলতার দিকে। এই ব্যক্তিবাদ ডিমোক্রেসী নয়। অন্ততঃ যে ডিমোক্রেসীর চারণ হুইটম্যান আর কিপলিঙ যার ধ্বজা আর চার্চিল যার বশম্বদ। ঐতিহাসিক গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে মানুষের য়ুটোপীয় ধারণা যে মানুষ: Isolated, Free: একের থেকে অপরের ভিন্ন হাওয়ার নামই নাকি ডিমোক্রেসী। রাষ্ট্রিক গঠনে এর চেহারা গেছে তুবড়ে। কোনো ব্যবহারিক রাষ্ট্র এমনি একটা অনুবোধের উপর বাঁচতে পারে না। আবার দেখা যাচ্ছে মানুষের সভ্যতার বিবর্তমান পথে রাষ্ট্র একটি অনস্বীকার্য্য অবলম্বন হয়ে দেখা দিয়েছে। এ'দিকে এই ক্রমউদগীরিত ব্যক্তিবাদের একটি সজীব ও প্রতিক্রিয়াশীল অনুক্রমণতা আছে। মানুষের মধ্যে যে অহরহ দ্বন্দ্ব সে কেবল এমনি একটি সংস্কৃতির মধ্যে বেঁচে থাকবার বাধ্যকতাজনিত রোগ। মানুষের primitive functionএর মধ্যে যে সহজ বেগ, ও নিরালম্ব উদ্‌ঘাটন জীবনের সত্যিকারের পরিমুক্তি সেইখানে। এই উগ্রতা বোধ থেকেই মানুষ নিঃসঙ্গ পাখীর মত আকাশে ডানা মেলতে চায়। ঘাসে ঘাসে সবুজ মাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে তার মধ্যভাগে খয়েরীরঙের কাকাতুয়া হাতে একা আমি: একটা ডাচ্ স্কুলের ছবির মত।

প্রত্যেক যুদ্ধ এসেছে আর আমরা অবাক হয়ে দেখেছি আমরা যা' চেয়েছিলাম তা' ভুল আর তাই ভাঙলো। আবার এসেছে যুদ্ধ। এতদিনের যন্ত্রসাধনার নিরসন ঘটবে হয় বিপত্তিতে নয় প্রতিপত্তিতে। পৃথিবীর ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যতদিন একটি অখণ্ড সাম্যব্যবস্থা কায়েমী না হচ্ছে ততদিন যন্ত্রসাধনার একটা বিশেষ ধারা পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে অটুট থাকবে। আসলে সব কিছুটাই ইতিহাসের নৈবর্তিক পটভূমিকা। মানুষ একলা, স্বতন্ত্র এর নিরুক্ত প্রস্তাবনায় বিশ্বাসী হতে পারে না। জীবনে যারা বাঁচতে চায়, জিজীবিষার গভীর অনুরাগ যাদের ব্যক্তিত্বে উদ্গীরিত হতে চায়, উচ্চারণ পেতে চায় তাদের সমস্ত চেতনা এইখানে স্তূপীকৃত হয় একটি নির্বাক অকর্মণ্যতায়। চেতনার অর্থ এখানে ভিন্ন। চেতনায় যেখানে অতীত অবরুদ্ধ জৈবিকগতি সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে বশীভূত। তার ক্ষেত্র আধিদৈবিক। অতীত যেখানে ক্রিয়াশক্তির মাঝে স্ফুরিত, প্রসিদ্ধ সেইখানে মানুষের চেতনা নির্মাণশীল: Survival of the fittest.

এইখানেই তার প্রবন্ধ শেষ হয়নি। এর পরেও কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী যে আলোচনা আছে তা প্রচলিত রাষ্ট্র ও কূটনীতিগত। অতএব সেটুকু আমরা বাদ দিয়ে যাবো কারণ, উপন্যাসীয় চরিত্র গঠনে সেই মতামত খুব প্রবল নয়।

কয়েকটা জায়গায় ধর্মঘট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইউনিয়ন থেকে অনুপমকে পাঠালে। এ'দিকদিয়ে তার কার্যকরী দক্ষতার সুনাম আছে। অনুপম এলো। কাপড়ের কল। কয়েকটা ছুতা-নাতায় মালিকরা একটা রিডাক্‌শন চালায়। ফলে লকআউটের সম্ভাবনা দেখা দেয়! তার চেহারাটা স্পষ্ট হবার পূর্বেই মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে মজুরদের একটা ছোটোখাটো দাঙ্গা বাধে। মালিকরা সমস্ত ব্যাপারটা ফৌজদারীর এলাকার মধ্যে ফেলতে চায়—লেবর ইউনিয়নকে এরসঙ্গে চাপ দিয়েছে ফলে ধর্মঘট পুরোপুরি দেখা দিয়েছে।

মার্কিষ্ট বললে—মালিকেরা সন্ধি করতে বাধ্য। কারণ সরকার এদিক দিয়ে দমননীতি চালাতে পারবে না। বাইরের লড়াইটা দরজায় এসে গুঁতোচ্ছে।

অরুণা বললে সেইজন্য আমাদের দাবীগুলো বেশী সমর্থন পাবে বাইবে থেকে ওদের লোক আমদানী বন্ধ করতে পারলেই ওরা কায়দায় আসবে।

—কিন্তু অন্যদিক দিয়ে সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ফের আবার তেতে উঠবে। আসল কাজ করবার নানা অসুবিধা তৈরি হতে থাকবে। যার জন্য ধর্মঘট সেইটা মেনে নিলেই ধর্মঘট গুটিয়ে নেওয়া দরকার।

অনুপমের আপত্তি এইখানেই। ঐ জিনিষটাকে আবো ছড়িয়ে দিয়ে এব বিপ্লবাত্মক দিকটাকে সক্রিয় করে তুলতে চায়। অরুণাবও মত তাই। মার্কিষ্ট বললে—মার্ক্সের পন্থা আপাততঃ ভুললে চলবে না। মাঝামাঝি পথ নিতে হবে। শত্রু সামনে। শত্রু বাঁয়ে ও ডাইনে। শ্রমিক শক্তিকে ব্যাপক প্রতিরোধ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ফ্যাসিজিম যদি একবার দেশের মধ্যে শিঙ গলাতে পারে তাহলে সব জিনিষটাই ঐতিহাসিক ভাবে ভেস্তে যাবে। চীন যাবে। রাশিয়া আরো কোন ঠাসা হবে। বলকানের উপর বণিকদের বনিয়াদ কঠিন হয়ে শিকড় গাড়বে। এটা বিপ্লবের সময় নয় তৈরি হবার।

একজন দলের মধ্যে থেকে বিদ্রুপ করে বলে উঠল—স্তোসাল ডিমোক্রটদের অবস্থা ও পরিণতি এর মধ্যে ভুলে যাবার নয়। অনুপমের মত অনেকটা তাই। লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে সাগর পার থেকে ফৌজের আমদানী সুরু হবে এবং হয়েছেও। ভারতকে রক্ষা করতে ভারতের সর্বনাশই একমাত্র সহজ পথ হয়ে দাঁড়াবে। Denial policyর কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে। যে সব মাটিতে সোনা ফলত সেখানে বসেছে সেপাইদের ছাউনি। পাটের চাষের যে জমি তা'ও ছ.ড়া হবে না খাবার ফসলের জন্য। ওয়ার্কারদের রিপোর্ট যদি সত্যি হয় ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ ডাক দিয়েছে দেশে। জমির মালিকানা স্বত্ব বরবাদ হবে। তা' যাক তাতে রাষ্ট্রিক সুবিধা দেশবাসীর হাতে আসবে না। আরো, যুদ্ধ যত বেশী এগিয়ে আসবে ধনিকদের স্বার্থ তত বেশী সাঁড়াশীর মত চেপে বসবে। যুদ্ধ আরো ভিতরে এলে একটা জিনিষ নির্ঘাৎ এই টলটলে সামন্ত যুগটা একেবারে ধ্বসে যাবে। মার্ক্সের ভাষায় সমস্ত জিনিষটা তখন ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফলের উপর তার আসল ভ্যালু দাঁড়িয়ে।

বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের বিভৎস ও আচমকা শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে ফ্যাসিজিম। চূড়ান্ত জয়লাভ যেদিক দিয়েই হোক না কেন সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ যে সরল রেখায় কেন্দ্রাতীর্ণ হবে এ বিশ্বাসটা ভুল। সরকার আজ নিজের স্বার্থের জন্য শ্রমিকশক্তির সাহায্য নেবে মূল প্রতিরোধ হিসাবে—কিন্তু যুদ্ধের মূল কেন্দ্র থেকে সরিয়ে রেখে। সমাজের হাওয়া বদলের ধারায় এদের শক্তি সংহত হতে পারবে না। এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে ইতিহাস 'পেছোবে! অন্ধকাবের গর্ভে, অবচেতনার বন্ধ্যাত্বে। আড়াইশো বছরের ইংরিজি আমল যে ক্ষতি করতে পারে নি এই শ্রমশক্তির অপব্যয় হয়ত তা করবে। অরুণার সঙ্গে অনুপমের মতে মিলল। যদি আমরা যুদ্ধের মাঝখান দিয়ে যেতে পারতুম। অরুণার মতে শ্রেণী বিরোধকে সংঘর্ষের বিন্দুতে টেনে নিয়ে যাবার এই সব চেয়ে উপযোগী সময়।

—কিন্তু আসল সমস্যাটা কি গবর্ণমেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাওয়া। অনুপম বললে।

—অনেকটা, কারণ দুটো হাত এক সাধারণ শত্রুর সঙ্গে লড়ছে।

—আমাদের লড়বার জোর কোথায়: অপর একটি ছেলে বললে—আমাদের স্বাধীনভাবে স্বীকৃত নই।

—হতে হবে। মার্ক্সিষ্ট বললে,—এবং তা সম্ভব সংগঠনেব দ্বাবা।

—এই সংগঠনের নির্দেশ কোন দিকে! অনুপম আবার বললে—নৌকা পোড়ানো আর জমি থেকে উৎখাত করার কাজে সহযোগীতা—কৃষকদের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে বেড়ানো—সংগঠনের দিকদিয়ে কি সাহায্য করতে পারে এ'সব। ফ্যাসিষ্টদের রুখতে চাই কিন্তু যেমন অন্যান্য দেশে সাধারণেব হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য পূর্ণ ব্যবহার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কোথায় আমাদের তা'। গেরিলা বাহিনী তৈরি করবার জন্য যারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তাদের ছাড়ছে না কেন গবর্ণমেণ্ট। এ'ত একপ্রকার স্বেচ্ছাসাবক মনোবৃত্তি।—যেমন সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণে পাড়ার ছেলেরা উৎসাহি হয়ে ওঠে! মানুষের সেবা নিশ্চয় ভাল কাজ কিন্তু প্রাকটিক্যাল পলিটিক্স হিসাবে নেওয়া যায় কিনা এইটাই হচ্ছে কথা।

—যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই সমস্ত কিছু দাঁড়িয়ে। কারণ এটা দিক

পরিবর্তনের সময় একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয় রাশিয়া—রাশিয়ার উপর নির্ভর করতে হবে।

—রাশিয়াকে কেন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে না?

পিছন থেকে অপর একজন চেঁচিয়ে উঠল।

অনুপম বললে—বিশেষ একটা সুযোগ নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের একথা ভুললে চলবে না। আমরা রঙের তাস হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছি অথচ যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রে আমাদের সংগঠন, দায়িত্ব এ'সবের কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। আজকে এই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে দোস্তি ভবিষ্যৎ ভারত সহজ চোখে দেখবে না। সন্দেহ করবার যথেষ্ট ক্ষেত্র থেকে যাচ্ছে যে' এর বেশী আমাদের কিছু করবার ছিল না। ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে কিছুতেই দেশের মধ্যে নাক গলাতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু, তারজন্য আমাদের অর্থনীতি গঠননীতি কোনোটাই দায়িত্বশীল কাজ পাচ্ছে না। Indusca প্রথায় দেশের মধ্যে কাজ করার এই উপযুক্ত সময়। হাজার হাজার জমি ছাড়া কৃষককে এই কাজে লাগাতে পারি। যুদ্ধের বৃহৎ চাহিদার পূরণ করতে পারবো—সবার চেয়ে বড়ো কথা দেশের ওয়েলথ্ হিসাবে এর দাম কম নয়। এই গুলোর ভেতর যদি আমাদের সংগঠন যুদ্ধের সুযোগে তৈরি হয়ে উঠে দেশের মাটিতে এর মূলধনকে পুরোপুরি খাটাতে পারি—ক্রিপস প্রস্তাব কংগ্রেস নেয়নি। যুদ্ধে তারা যোগ দেবে না—গবর্ণমেণ্টকে কেন এই দিক দিয়ে এই পথ নেওয়াতে বাধ্য করবো না আমরা। আমরা আমাদের সুনাম পর্য্যন্ত তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। Denial policyতে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি—কিন্তু কেমন ভাবে তাদের ব্যবহার করবো কোন কার্যকরী পথ আমরা সামনে গ্রহণ করছি না। হয়ত কটু শোনাবে কিন্তু দুর্ভিক্ষকে আমরা passive support দিচ্ছি। আমাদের ব্যবহার করা হচ্ছে fifth columist রুখবার broad casting যন্ত্র হিসাবে।

—আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে তাল সবসময়ই রাখতে হবে এর মধ্যে থেকে সুযোগ বেরিয়ে আসবে।

ধর্মঘট চলল। কিন্তু যেমন আশা করা গেছল তেমন নয়। অনুপম বুঝলে

কোথাও একটা মারাত্মক গলদ রয়েছে। শ্রমিক শক্তির পিছনে কোনো কার্যকরী তাগিদা নাই। এ টা ইউনিয়নের ঔদাসীন্য। দু'দিন ক্রমাগত বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে অনুপম হাল ছেড়ে দিলে। রমজান বললে—মিছে ঘুরে মরছেন। আপনা থেকেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

—এর মানে'টা কি বল দেখি। এ' সময় চাপ দিলে'ত সহজে কাজ আদায় হবে। কাজ ওদের চালাতেই হবে এবং পুরোদমে; লড়াই দরজায় এসে গেছে।

—এইটা বুঝতে পারছেন না। দক্ষিণপন্থীরা হেটে যাচ্ছে ক্রমশঃ এই সুযোগে গবর্মেণ্টের সুয়ো হয়ে উঠলে দেশের উপর তাদের রাষ্ট্রনীতির লাগাম কষে বসবে।

—কিন্তু এর আশু ফলটা কি? তুমি বিশ্বাস করো রমজান। রমজান হাসলে,—বাবু, অনেক বছর এই ইউনিয়নের কাজে কাটিয়েছি—আপনিও অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। কিন্তু এমনি একটা অবস্থা আসতে পারে আমাদের চাঁইয়েরা ধারণা করতে পারেনি। আমাদের দেশের মজুরের অবস্থা কেউ বোঝেনা। চলুন-না বস্তিতে একবার ঘুরে আসি।

—ভালো লাগছেনা রমজান।

—লাগিয়ে নিন। না হলে গোলা বারুদের কারখানায় ঢুকে পড়ুন।

অনুপম চুপ করে ভাবতে লাগল।

—উপায় সবসময় এক থাকে না বাবু। কিন্তু উদ্দেশ্য ভুল হলেই মুস্কিল।

অনুপম অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালে; তার বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারছিল না; রমজানের চকচকে চোখ, রোদে পোড়া মুখের চামড়া, চেতালো নাক। গোঁফে কয়েকটা সাদা চুল।

—তুমি কি এতে বিশ্বাসী নও।

—বাবু মার্ক্স আমি পড়ি নি, রাশিয়ায় আমি জন্মায়নি। সারপ্লাস ভ্যালু ঠিক বুঝি না।

—কিন্তু আমেদাবাদে তোমাকে আমি দেখেছি।

—সেইটাই আমি বলতে যাচ্ছি। আমেদাবাদ আর এখানে তফাৎ আছে। মনে আছে আপনার আমেদাবাদে গুলি চলেছিল। ফলে ওদিককার মজুরগুলোর

দিকে তাকিয়ে দেখুন; গুলির দাগ এখনো আমার হাতে আছে। কিন্তু এখানে গুলিও ছুটবেনা একটা কারখানার লোকও না খেতে পেয়ে মরবে না। মরবে চাষী-ভুষো গুলো। গ্রামগুলোর দিকে আর মহাজনদের তৈবি হয়ে ওঠা বাজারের দিকে একবার তাকান।

—তুমি কি মজুরদের ভেতর তেমনি অবস্থা দেখতে পেলে খুসী হতে।

—একই অবস্থা যে ওরা বারবার তৈরি করবে এত কাঁচা কলওলারা নয়। ওদের লড়াইয়ের চাল নতুন নতুন। কেবল আমাদের তলোয়ারেই জঙ্ ধরে গেছে কিংবা রাশিয়ার ১৯১৭ সালের হাতিয়ার ভাড়া করে এনেছি।

রমজান একটা ঘরে ঢুকল। একটা কাহার মেয়ে রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে আসছিল। বুকের কাপড় ভিজে। রমজান জিগ্যেস করলে মতিবিবি কোথায়? মেয়েটি বললে মিটিং ঘরে।

—গঙ্গু ফিরেছেরে। মেয়েটি জল আর বাসনগুলি নামিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল: ভগ্‌বান করে ও হারামখোর আউর নেহি লোটে। রমজান হাসল। মেয়েটি বস্তির গালাগাল আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকে একটা শুকনো কাপড পরে বেরিয়ে এল। রমজান পকেট থেকে একটা টাকা বার করে মেয়েটিকে দিলে। —এটা রাখ। গঙ্গু এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

—মেরা নসীব'ত ফির গেয়ী ওস্তাদ। ছোটা বাবুকা একটা লেড়কী হোয়ী। হামকো'ত ব্যোলায়া আজ।

—বহুত আচ্ছা। রমজান তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিলে—ঠিক সে খবরদারী চালানা। ছোটা সাবকী লেড়কী।

অনুপম এতক্ষণ মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিল। কালো, কঠিন শরীর। মধ্যাঙ্গী। সবল উরু। ছাপানো কাপড় পরেছে। কপালে একটা কাঁচপোকার টিপও লাগিয়েছে ইতিমধ্যে। রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ও কি কলে কাজ করে।

—হ্যাঁ, তবে ওর পেট চলে আলাদা উপায়ে। মেয়েটা ধাত্রীর কাজ জানে। ওই এখানকার নামজাদা ধাই। দরকার পড়লে অমরবাবুও ডেকে পাঠায়। রমজান একটু হাসল।

—ওকি ইউনিয়নে আছে?

—ও'সব ও মানে না বলে 'ঝুট মুট হুজ্জত।'

হঠাৎ অনুপমের মন ঐ মেয়েটির শরীরকে কেন্দ্র করে পাক খায়। এক অস্বস্তিকর বিরক্তির সঙ্গে অনুপম পথ চলতে লাগল। কাঁচপোকার টিপ কপালে: শক্ত, মধ্যাঙ্গী শরীর: ঝুটমুট হুজ্জত। হঠাৎ অনুপমের মনে হল রমজান এতক্ষণ ধরে যে কথাটি বলতে চাইল তার চেহারাটা যেন সে চিনতে পারছে। সারপ্লাস-ভ্যালু নিয়ে আজ সকালে অরুণা একটা বক্তৃতা দিয়েছে। ঝাঁঝালো ভাষায়, বিপ্লবী গলায়। অনুপমেরও ভালো লেগেছিল। এমন কি অরুণা যখন নতুন প্যাটার্নের বুইকে চেপে বেঙ্গল উইমেনস এসোসিয়েশনে 'রাষ্ট্রক্ষেত্রে নারীর স্থান' নিয়ে বক্তৃতা করতে গেল তখন তাকে নমস্কার জানিয়ে বোলেছে রাত্রে আবার দেখা হবে। অনুপমের মনে আবার সেই পুরানো দ্বিধা মাথা চাড়া দেয়। ঘোলাটে চোখে সে পথ চলতে থাকে। আবার সে ফুরিয়ে গেছে! হঠাৎ এই নোংরা গলিও অনির্দেশ্য কলরবের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মনে হল কোথায় যেন নিজের থেকে নিজে সরে গেছে—নিজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে—তার পক্ষে প্রাণধারণের বায়ু নাই সেখানে।

মিটিং ঘরে যখন দুজনে ঢুকল তখন মিটিং ভেঙে গেছে। মতিবিবি এবং আরো কয়েকটা লোক জটলা করছে বসে বসে।

—আসুন—আসুন! মতিবিবি তাকে খাতির করে তক্তাপোষের উপর বসালে। ছোটো ঘর। করগেটের চালা। ওপরের ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

বিড়িটা নীচে ফেলে দিয়ে রমজান বলল—কি ঠিক হল বিবিসাহেবা। মতিবিবি এখানকার লেবর ইউনিয়নের শ্রমিক তরফের সর্দারণী। মেয়েটির কথায় পাঁচহাজার মজুর ওঠে বসে। বেঁটে, স্থূল; হাতে পায়ে প্রচুর লোম। গোল গোল চোখ।

—চলুন আমার ঘরে। দোতালায় কোনের দিকে একটা ঘরে নিয়ে এল। এইটা মতিবিবির ঘর।

বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁসে একটি মাঝারি দেরাজ। এ'কোন থেকে ও'কোন পর্যন্ত খাটানো:একটা দড়ি তাতে জামা কাপড় থাকে। সস্তা কেরোসিন কাঠের টেবিলে জড়ো করা নানান রঙা কাগজ। ইউনিয়নের প্যামফ্লেট। তারা তক্তাপোষে বসল। রমজান বালিশটাকে কোলের উপর নিয়ে ঝুঁকে বসে। টেবিলের পাশে ক্যাম্বিশের খাটে ভেঙে পড়ে মতিবিবি বললে,—ঠিক হয়ে গেল বাবু সাহেব! এ ধর্মঘট আর চলতে পারে না। কালকে সরকারের তার আসবার কথা আছে, এলেই মালিকদের সঙ্গে আপোষের কথাবার্তা সুরু হবে।

—এটা তোমার মত না ইউনিয়নের। রমজান বললে।

—আমার আর মত কি দোস্ত! মতিবিবির ঠোঁট মোটা; হাসলে মুখের চামড়া কুঁচকে ওঠে,—আসল কথা ইউনিয়নের জোর নাই।

—আপোষের কথাটা সুরু হবে কোন দিক দিয়ে।

—হার জিতটা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না রমজান।

—চলবে বই কি! রমজান আরো ঝুঁকে ঠোঁট চেপে বললে,—সেইটাই আসল কথা। এ'টাকে যদি পালাগানই বলো তাহলে হারজিতই'ত মোদ্দা কথা।

—রমজান, কোনো উপায় নাই। অবশ্য এখানে হারজিতের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মন্ত্রীরা এ ব্যাপারে হাত দিয়েছে। তারা মাঝখানে রয়েছে—কিন্তু ভয় পাচ্ছি কোথায় জানলে যে মজুর-শক্তিকে দলবদ্ধ করে রাখা যাবে না। এইখানেই বাজী মারবে ওরা। নয়া নয়া কারখানা গড়ছে। শুনছি আমেরিকা থেকে ফৌজ আসছে। তারা কল বসাচ্ছে—দেশের সমস্ত মজুর শক্তিকে এই কাজে টান মারবে। ধান চালের বাজার দেখো, ক্রমশঃ আগুন হয়ে উঠছে; কেবল মাটি আর লাঙলে চলবে না। দলে দলে যোগ দিতে বাধ্য হবে।

—কিন্তু লড়াইয়ে আমাদের যোগ নাই।

—সেইটাই'ত ভয়ের কথা। ডবল রোজ পেলে কোন মজুর দল ধর্মঘট চালাতে পারে বল'ত। বিশেষতঃ ধর্মঘটের উদ্দেশ্য যেখানে মজুরী বাড়ান। দেশ বিদেশ

থেকে লোক আমদানী হবে। আরো, ব্যাপারটা 'কি জানলে, ক্রমশঃ বাজারের জিনিষপত্রে যত টান ধরবে সরকার তত বেশী কাগজ ছাড়বে—ফলে মজুরের দলগত জোর নেমে পড়তে বাধ্য হবে।

—কিন্তু অন্যদিকেও বলা যায় দেশের যেটা আসল শক্তি সে'টা ধরা পডবে আমাদের হাতে। অনুপম অনেকক্ষণ বাদে বললে।

—সেইটাই'ত একমাত্র আশা। কিন্তু এ'ত ঢেউয়ের মুখে কুটো, বাবু।

—যুদ্ধে যোগ দেবার তুমি বিরোধী। রমজান বলল।

—নিশ্চয় না, এটা'ত একটা মস্ত লাভ। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদেব ঘাঁটিতে লাভটাকে খাটাবার রাস্তা কোথায়!

রাত অনেক হয়েছে। অনুপম উঠল। একটা সিগারেট ধরালে।

—লেগে পড়ুন বাবু। রমজান হাসতে হাসতে বলল,—ভেসে পড়া ছাড়া উপায় নাই—রঙপুরের কারখানায় কেমিষ্টের জন্য লোক চাই।

চাঁদ উঠেছে আকাশে সম্পূর্ণ গোল হয়ে। কিন্তু বাতাস নাই। একটা মাঠ অনুপমকে পেরোতে হবে। সবুজ আলোয় পথ দেখতে দেখতে চলল। পশ্চিম দিকের তাড়িখানায় কেরোসিনের আলোটি জ্যোৎস্নায় হলদে দেখায়। বাতাসে হল্লা অস্পষ্ট শোনা যায়। অনুপম দুর্বলতা বোধ করছিল। সে কাজ করতে চেয়েছিল। এই ক'দিন সে প্রচুর পরিশ্রম করেছে কেবল কাজের ঝোঁকে। হঠাৎ সে ভাবলে সে কি শ্রমিক চেতনায় বিশ্বাসবান। কেউ যদি হঠাৎ তাকে প্রশ্নটা করে সে ধাঁধায় পড়বে। এই বিভ্রমকেই সে ভয় করে। অথচ রমজানকে সে দেখেছে, মতিবিবিকে জানে! কোথায় যেন বাঁচবার ধারার সঙ্গে একটা অনৈক্য রয়েছে। সেটা কি! ওদের চরিত্রে ওদের আবেগটা কার্যকরী। তাদের জীবনের দরজাগুলো খোলা। অনুপম হঠাৎ চমকে উঠল। সে কি উল্টো পথে ভাবছে না। এরই নাম'ত প্রতিক্রিয়া: পলায়ন মনোবৃত্তি: ঘটনা থেকে সরে থাকা: বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া। ঘটনা কি? তার বাবাই কি ঠিক। মনের দিক দিয়ে মানুষ নির্মুক্ত হতে পারলেই চরিত্রে গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে! আর একটা সিগারেট ধরালে। মাঠ পেরিয়ে এসেছে। উইমেনস ক্লাবের পাশের

রাস্তা। একটু দাঁড়ায়। বাড়ীটার দিকে তাকাল। ভেতরে বৈদ্যুতিক বাতি জলছে। অনেকগুলো কণ্ঠের নানারকম আওয়াজ আর হাসি বাতাসে ছুটোছুটি করছে। সভা ছিল। সভা ভেঙে গেছে। অরুণা বক্তৃতা দিয়েছে আজকে এখানে। কোনো মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট আজ সম্মানীয় অতিথি ছিলেন। অনুপম মোটরগুলোর দিকে তাকাল। কয়েকটি উর্দিপরা দরোয়ান। অরুণার কালো বুইকটা রয়েছে। মোটরটা একাউনটেন্টের, চড়ে বেড়ায় অরুণা! ইচ্ছা করেই এ'পাশে ও'পাশে ঘোরাঘুরি করল খানিকক্ষণ—একই সঙ্গে যাবে। অরুণার মানে একাউনটেন্টের বাঙলোতেই সে থাকে।

অল্পক্ষণ পরেই অরুণা বেরুল। সঙ্গে আরো অনেক রঙীন চেহারার মহিলারা! হাসির কলধ্বনি উড়িয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে বিভিন্ন মোটরে গিয়ে উঠলো।

অনুপম বললে—আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

—কি আশ্চর্য, গাড়ীর দরজাটা খুলতে খুলতে বলল,—ডাকেননি কেন? আসুন। মোটরে ষ্টার্ট দিলে। অরুণা চালায় ভাল। একাউনটেন্ট বলে গাড়ী তার হাতে পোষা বেড়ালের মত চলে।

—সভা কেমন হল। অনুপম জিজ্ঞাসা করলে।

—মন্দ না। আই, সি, এস গুলো যে এত নিরেট হয় জানতুম না,—হেরিডিটি সম্পর্কে সে ক্রপটকিনের মতামতটি এমন ভাবে চশমার ফিতে হাতে করে বললে যে সকলে ভাবলে লোকটার ওরিজিন্যালিটি কি ভয়ঙ্কর। অথচ ক্রপটকিন আজকে পড়ে কে?

—আপনি কিছু বললেন না। এতক্ষণে অনুপম অনেকটা সহজ হতে পারে। তার ঠোঁটের সেই পাৎলা রেখায় বিদ্রূপটি কুঁকড়ে ওঠে।

—বেধেছিল মার্ক্সিজিম নিয়ে। By the by ও'দিকের খবর কি?

—সে মিটে গেছে। আপোষে সন্ধি। ঠোঁট উল্টিয়ে বললে অনুপম। সে হাসছিল। চাপা, সতর্ক হাসিতে তার কণ্ঠ বিচ্ছুরিত হয়।

—ধর্মঘটের আসল দিকটাই ওরা ধরতে পারে নি। ধর্মঘট ওদের একটা নেশা। আসলে ওদের ডায়েলেকটিক জ্ঞানটা স্পষ্ট নয়।

—কেমন করে ঢোকানো যায়।

—বুদ্ধির দিকটায় অনেক পিছনে।

ফাঁকা জোৎস্না সর্বাঙ্গে এসে পড়েছে। অনুপম এবার কঠিন করে তাকিয়ে নিলে। চোখে বুদ্ধির ধার আছে। লম্বা গ্রীবা। একটা কাঁচ পোকার টিপ কপালে পরলে কেমন দেখাবে—অরুণার দিকে চেয়ে অনুপম চিন্তা করছিল। অরুণা তখন ধর্মঘটের বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছিল। ইতালী, রাশিয়ার নজির দিচ্ছিল।—কিংবা কুরুবকের চূড়া: কুন্দফুলে গুম্ফিত বুকের উন্নাল দুটি স্তবক। লাল উষ্ণতার মৃদু স্পন্দন তার ধারে ধারে। অনুভা যদি আরব দেশের মেয়ের একটি ছবি আঁকে! অরুণার এই বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি কালো ওড়নার মধ্য দিয়ে প্রতিভাসিত হয়। একটা রক্তাক্ত গোলাপ তার গাল ছুঁয়েছে—অনুপম চোখ নামিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালে!

* * *

সমস্ত রাত্রি অসহ্য গরম গেছে। ঠিক গরম নয় গুমোট। নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হয়েছে অনুপমের। খানিক খানিক ঘুম শরীরকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। সারা রাত্রি সে ভেবেছে। কি ভাবলে সে জানে না। অথচ ভাবনায় ছটফট করেছে। রাত্রির গাঢ়তা তখন ফিকে হয়ে এসেছে। দু-একটা পাখীর ডাক শোনা যায়—সে উঠে পড়ল। স্নান করবার ইচ্ছা হোল। ঘামে তার শরীর অস্পৃশ্য বোধ হয়। বাইরে বেরিয়ে আসে। ভোরের দিকে একটু হাওয়া বইতে সুরু করেছে। বাগানে নেমে খানিকক্ষণ উঁচু মুখে হাওয়া খেলে। এই ধূসর, আবছা প্রত্যূষটিকে তার ভালো লাগল। একটি নিরলস শান্তির সজীবতা চারিদিকে উন্মীলিয়মান। যতদূর দেখা যায় আকাশ আর মাঠ। কলের ধোঁয়া তরঙ্গের মত আকাশে ফেনায়িত। ধীরে ধীরে সে পুকুর ঘাটের দিকে এল। ঠাণ্ডা হাওয়া। জলের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। এখনো সকলে নিদ্রিত। কাল অনেক রাত অবধি সকলে জেগেছে। নিস্তরঙ্গ নীল জল। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা তেকোণা পুকুরটা। তারের আওয়াজের মত এখানে সেখানে রঙ বেরঙের পাখীগুলোর কণ্ঠ ঠিন্‌ঠিন্ করছে। হঠাৎ জলের শব্দ হয়।

খানিকটা জল এসে ঝাপট মারে অনুপমের মুখে চোখে। কে যেন জলরেখা ভেদ করে চলে গেল। সেই ধূসরতায় অনুপম শক্ত করে তাকাল। কিছু সঠিক দেখতে পেলে না। আবার খানিকটা জলের সঙ্গে হাসির আওয়াজ তার মুখে বাজে। অরুণা! সমস্ত মনটা তার বিরক্ত হয়ে উঠল। স্নান করবার ইচ্ছা হল না। চুপ করে তাকিয়ে রইল। জলরেখা ভেদ করে অরুণার লঘু ও ক্ষিপ্র শরীরকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। মাথায় স্নানের টুপী, কান দুটি ঢাকা। মাঝখানে এসে থেমে গেল। হাত তুলে লাফিয়ে পড়বার জন্য অনুপমকে ইসারা করল। হঠাৎ অনুপম লাফিয়ে পড়ল। জলের কণাগুলো হাওয়াতে ছিটকায়—ডুব দিয়ে ছুঁতে গেল অরুণাকে। হাসির আওয়াজের মধ্যে অরুণা আরো গেল এগিয়ে। অনুপম তার পিছন পিছন—চোখে তার আদিম, হিংস্র দৃঢ়তা: জল কেটে কেটে এগোয় অরুণার দিকে। অনেকখানি ভোরের আলো পড়েছে। অরুণাকে স্পষ্ট দেখা যায়। নীল জলের উপর সাদা ঢেউয়ের মত তার শরীর দুলছে, কাঁপছে, ভাসছে।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে জমির উপর শরীরটিকে বিছিয়ে দেয় অরুণা। চুল খুলে লতিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাসের তাপে বুকটা উঠছে নামছে। উন্নত নাক দিয়ে নির্ঘোষ নিঃশ্বাস বেরোয়। সে গুণগুণ করে গান গাইছিল। অনুপম সাঁতার কেটে সজীব বোধ করছিল। শরীরের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে কর্মঠ কঠিনতায়। অরুণার প্রসারিত শরীরটির দিকে তাকায়। তার জড়তা নাই। কথা বললে না কেউ। চোখের পাতায় তারা দুটিকে আবছা ঢেকে চোখ নামিয়ে গুণগুণ করছিল অরুণা।

অনুপম তার পাশে এসে বসল। শ্যামল ঘাস। সমতল অনাভি। জলের বিন্দুগুলি তার শুভ্র বাহু ও জানুর উপর টলটলে মুক্তোর মত সূর্যের তাপে স্পন্দমান: কৃশ কটি। একটা গানের কলি আবৃত্তি করছিল অরুণা। অনুপমের দেহে মনে কোথাও জড়তা ছিল না।

অরুণা চলে গেল আর সেই কাঁচা রোদের মধ্যে অনুপম শুয়ে রইল। তার মনে কোনো চিন্তা ছিল না, ক্ষোভ ছিল না। সে নিশ্চিন্তে আকাশের দিকে

মুখ করে পড়ে রইল। হঠাৎ সে বুঝতে পারলে সে কি ও কেন। কিছুই অস্পষ্ট রইল না। নিজের কাছে আশ্চর্যভাবে সে সহজ হয়ে গেল। মাটির গন্ধ নাকে আসছিল। জীবনের কোনো জটিলতা তার নাই: পরিমুক্ত, সহজ, নিঃশ্বাসের মত। সে নিজেকে জানতে পারলে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। অশ্রান্ত সাঁতার কাটলে। সব তার শরীর থেকে ধুয়ে গেছে, সূর্যালোকে শুড়িয়ে গেছে তার সমস্ত অবচেতনা! তার জীবনে অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই সে একটা বিন্দু, সময়ের স্রোতে একটি নির্বেগ ধারাবাহিকতা। সে জানলে এই সময়ের কি মানে। সূর্যালোক তার সমস্ত সত্তায় সৌরভের মত জড়িয়ে ধরল।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিছানায় শুয়ে অনুভা বই পড়ছিল। চলাফেরা তার নিষেধ হয়ে গেছে। নড়াচড়া কর'তেও সে পরিশ্রম বোধ করে। অনুভা আসন্নপ্রসবা। সম্পূর্ণ নিবিষ্ট শরীরে শুয়ে বইখানা পড়ছিল। বিকাশের নতুন লেখা উপন্যাস। 'কাগজের নৌকা'। 'কাগজের নৌকা'। নামটা দেখে হেসেছিল। 'কাগজের নৌকা' কি? বইয়ের নাম অমন বিচ্ছিরি হয়। কাগজের নৌকা, টিমটিমে; ফুঁ দিলে কাৎ হয়ে ডুবে যায়। কিছু কিছু সে শুনেছিল আগে বিকাশের কাছে। বিকাশ তখন তাদের বাড়ীতে আসত। ঠিক ছ'টা পনেরো। যেদিন দেরী করে আসত সেদিন তার মুখ অদ্ভুত কঠিন দেখাতো। লক্ষ্য করত অনুভা। কেন হয়। ত্রৈলোক্যবাবুর আঙুল দেখলে তার ভয় করত। পান্নালালের চকচকে দাঁত। অনুভা একটা মুখের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছিল। অয়েল কলারে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা মুখের ভঙ্গী। বিকাশের ঠোঁটের ঐ'যে অদ্ভুত কোঁচের ভঙ্গী যা' তার শ্যামল, তরুণ মুখটিকে কঠোর করে তুলতো কিছুতেই সে স্মরণ করে তুলি দাগাতে পারতনা। ছবিটা অসম্পূর্ণ পড়ে আছে। অনুভা জানত তাদের বিয়ে হবেই। তার কোনো বিমূঢ়তা ছিলনা। বিকাশ যখন তাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে তখন সে চুপ করে বাইরে তাকাল। এ'ত হবেই। সেইদিন রাত্রেই সে বুঝেছিল। সেই তারায় ভরা রাত। তার বাবার কাছ থেকে উঠে এসে ছাদে দাঁড়াল: গভীর রাত। তারপর থেকে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। অনুপমকে শুদ্ধ সে ভয় করেনি। যখন অনুপম তাকে জিজ্ঞাসা করলে তার মত আছে কিনা সে কথা দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিল। অনুভা কাৎ হয়ে শোয়। বইটাকে আড় করে টেনে নেয় বুকের কাছে। নিটোল স্তনে বইয়ের চাপ পড়ে। সকলের মাঝে এসে ভাল লাগল। সব কথা সে ক্রমশঃ ভুলে যায়। নিরন্ধ্র ভালবাসার মধ্যে সে ক্ষয়ে

গেল। বিকাশকে বললে সে একটা ছবির গ্যালারি খুলবে। রাত দিন সে বসে বসে ছবি আঁকে। একটা ডালে একটা পাখী বসে: দুটো তেকোণা পাতা, আবছা সবুজ রঙ দিয়ে ঢাকা। প্রাতিভাসিক। কিংবা আকাশে চাঁদ ওঠেনি। এ'বাড়ী ও'বাড়ী নানা বাড়ীর আলোর কণা ছিটকে ছিটকে উঠছে। বাড়ীগুলো সাজানো হয়েছে স্থূলকোণী ত্রিভুজের ধাঁচে। বাদামী আর খয়েরী রঙের মিশাল দেওয়া আবরণ। আলোর ফুলকিগুলি নানা রঙের: লালচে, মৃদু-বেগুনে, গোলাপ-রাঙা, হলুদ-নীল। পোর্ট্রেট আঁকা সে ছেড়ে দিলে। ইচ্ছা ছিল শ্বশুরের একখানা পোর্ট্রেট নেবে। তার শ্বশুর মানে বিকাশের বাবা যখন চেয়ারে বসে কাগজ পড়ত তাকে দেখাত জেব্রার মতন। অনুভার মনে হত ঠিক ঐ ধাঁচে বসলে লোকটির চেহারায় চরিত্র আসে। চওড়া কপাল। বলিরেখার খাঁজ কাটা। নাকটা নীচের দিকে স্থূল ও চাপা। চিবুকের কোঁচটি বিকাশের মত। এত আস্তে কথা কয় যে কান পেতে শুনতে হয়।

অনুভা বইটা বন্ধ করে ঘুরে শু'ল। সামনের আয়নাতে ছায়া পড়ে। নিজের উত্তানিত শরীরটিকে দেখতে তার আবেশ লাগছিল। চুলের বাঁধুনি খসে পড়েছে কাঁধে। গ্রেচেন। বিকাশ এমনি ভঙ্গিতে তাকে দেখে একদিন বলেছিল—গ্রেচেন তুমি। লক্ষী মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে। অনুভার ঠোঁটে একটি হাসি ফোটে। আশ্চর্য! কত রকম নামে বিকাশ তাকে ডাকে। ঐ নামগুলোর ভেতর দিয়েই তাকে দেখতে চায়!—চুলগুলোকে ফাঁপিয়ে দাও। ওফেলিয়া। প্রত্যেক চিঠি লিখত আলাদা আলাদা নাম দিয়ে—বাংলাতে একটি মাত্র তুলনা আছে: উমা। ঐ নামে তোমায় ডাকতে ইচ্ছে যায়। অবনী বাবুর ঐ ছবিটা কি আশ্চর্য নয়। অনুভার লাগত। কেন বিকাশ তাকে চায় না। কারুর মধ্যে তাকে দেখতে চায়। বিধ্বস্ত হয় নিজে। ছটফট করে। আঘাত পায়। আঘাত দেয়। একদিন সে কেঁদেছিল। ব্যথার মধ্য দিয়ে সে তাকে পেয়েছিল। সেই সব হারিয়ে যাওয়ার রাত। সেই অনেক তারা-ভরা আকাশের তলায় তার সেই যন্ত্রণাকর বেদনা। একদিন বিকাশ তাকে চিঠি পাঠালে—To Lady Lillth.:

কাল সারা রাত্রি ভূতের স্বপ্ন দেখেছি। কে এসেছিল জানো: Lady

Lillth. মরা চোখ আমার চোখের উপর রেখে পাশে অনেকক্ষণ বসেছিল। চোখের রঙ নীল, চুলের রঙ বাদামী, খসখসে। বললাম :

—তুমি কে ?

—চিনতে পারছ না ?

—চেনা চেনা লাগছে।

—চেষ্টা কর ?

—রসেটি যাকে এঁকেছিল। Lady Lillth. আমার সঙ্গে তোমার কি ?

—সে'ত ছবি। আরো দেখ। আমার সঙ্গে তোমার কাল কত কথা হল।

—পারলাম না। তুমি যাও। তোমার চোখে প্রাণ নাই।

—কোথায় দেখেছো Lady Lillth কে !

—অনুভা বলে একটা মেয়ে তার জানালার পাশে। তার সামনে একটা জানালা ছিল তার ভেতর দিয়ে তুমি তাকিয়েছিলে।

—এইবার দেখ।

অনুভা, তুমি বসে আছ। তোমার পাশে সেই Lady Lillthএর জানালা। পৃথিবীর বাইরে ঐ জানালার মুখ। তোমার চোখে নীল। মরা মুখ। নীলের মধ্যে সব মিশে যেতে চায়।

আরেক দিন একটা চিঠি আসে : To Proserpine.

"Pale beyond porch and portal
Crowned with calm leaves she stands
Who gather all things mortal
With cold immortal hands;
Her languid lips are sweeter,
Than love's who fears to greet her
To men that mix and meet her
From many times and lands."

লাইনগুলি সুন্দর নয় ?

কোনোদিন না এলেই বিকাশ এমনি এক একটা চিঠি পাঠাত। অনুভা তখন লিখত : তুমি এসো। কথা আছে। লক্ষীটি, এসো। বিকাশ আসত। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারত না। বিকাশের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করত তার মুখ। বিকাশ ও তার সামনে কিছু বলত না। যেন, তাদের মধ্যে অলক্ষ্যে সম্পূর্ণ জানাশোনা হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইল অনুভা। তারপর একসময় উঠে বসল। মোটে সাড়ে পাঁচটা। এখনো অনেক সময়। এরপর সে উঠবে, চুল বাঁধবে, গা ধোবে, তারপর রেডিওটা খুলে অপেক্ষা করবে বিকাশের জন্য। টেবিলে এসে বসল। একটা চিঠি অনেকক্ষণ ধরে পড়ল। শ্বেত পাথরের টেবিল। একখানা চিঠির কাগজ নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে লিখলে : শ্রীচরণেষু! দাদা—:টেবিলের উপর বাঁহাতের কুনুইটা ভেঙে একটু সামনে কুঁজো হয়ে বসে। বুকের চেয়ে টেবিলটা আধহাত নীচু। দু-গাছা সোণার চুড়ি সাদা হাতের উপর চিকচিক করে। কনীনিকায় একটি সরু আঙটি। বিকাশ পরিয়ে দিয়েছিল ফুলশয্যার রাত্রিতে। 'একদা' লেখা। হঠাৎ ব্যথা বোধ করে অনুভা সোজা হয়ে বসে। হাতখানা গুটিয়ে নেয়। সেই বিস্ময়কর প্রভাবিত বেদনা। ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়ে সমস্ত শরীরে চারিয়ে পড়ে ব্যথাটি। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকে। বুক পর্যন্ত ঠেলে ওঠে সেই সচল বেদনাপিণ্ড। দমকা চীৎকার করে হঠাৎ অনুভা বিছানায় ছুটে গিয়ে সজোরে নিজেকে চেপে ধরে। চোখের পাতা আর ঠোঁট অসংযত রকমের কাঁপতে থাকে। সরু কপাল বিনবিনে ঘামে ভিজে ওঠে।

যখন সে সজ্ঞান হয়ে তাকাল তখন ঘর ভর্তি লোক। ডাক্তারের গলায় সাপের মত ষ্টেথিসকোপ ঝুলছে। তার পাশে শ্বশুর তার হাতটি নিয়ে নিস্তব্ধ বসে আছে। তার মুখের উপর ম্রিয়মান চোখ। মাথার কাছে শাশুড়ি হাওয়া দিচ্ছে। চারিদিকে অনুভা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হয়। চোখ বুজিয়ে সে অনুভব করতে যায়—হঠাৎ বুকের উপর স্পর্শ পেয়ে চোখ খোলে। ষ্টেথিসকোপ বুকে বসিয়ে নিরীক্ষণ করছে ডাক্তার। আবার সে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজোয় :

—না, আর ভয়ের কিছু নাই।

—অপারেশান করতে হবে কি।

—করলে ভাল হত : মানে, তাই করতে হবে। কিন্তু, I am rather afraid if she withstand that মানে, বড্ড weak. হার্টের গণ্ডগোলটাই ভয়ের কারণ।

—কিন্তু stageটা mature : প্রায়ই এমনি হচ্ছে।

—Uterus rapture করতে পারে : বড্ড congested. Blood transportation ভাল হচ্ছে না। অপারেশান করলে, মানে, that's only thing left now—কিন্তু সেটা risky—বাইরে কোথাও নিয়ে যান না। জল-হাওয়াটা ভালো। কোনো পাহাড়ী জায়গা।

ঘরে বেগুনে আলোটা জ্বলছে। ঠাণ্ডা ছায়া। অবিশ্রান্ত বাতাস পেয়ে গা, হাত, পা, শিরশির করে অনুভার। চুপ করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল তার।

—কষ্ট হচ্ছে মা! শ্বশুর মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে। অর্দ্ধেক চোখ মেলে অনুভা ঘাড় নাড়ে। কষ্ট হচ্ছে না।

—বিকাশ এখুনি এসে পড়বে। খবর পাঠিয়েছি।

চোখ বুজিয়ে অসাড়ের মতন অনুভা মনে মনে ভাবে কখন বিকাশ এসে তার পাশে বোসবে। আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে। বিকাশের গায়ের গন্ধ'র মধ্যে নির্ভরতায় মুখ ডুবিয়ে স্থির হয়ে ঘুমাবে।

বিকাশ যখন ঘরে ঢুকল অনুভা বুঝতে পারে। চোখ বুজিয়ে সজাগ থাকে।

—কি হয়েছে! কেমন আছে! শরীরের খুব কাছে অনুভা তাকে বুঝতে পারে—বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে।

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। একটির পর একটি যেন মনে করে করে বলছে তার শ্বশুর।

—তারপর! কতক্ষণ আগে? ডাক্তার কি বললে? বিকাশের গলায় অস্থির উদ্বেগ—অনুভার পরিচিত। এক একসময় এত উদ্বিগ্ন হয় কেন বিকাশ! তার বিয়ের আগে ঠিক অমনি উত্তেজনায় এক একসময় অসহিষ্ণু হয়ে যেত।

কি ছেলেমানুষ দেখায় তখন। তারপর রাত আরো বেড়ে গেলে সবাই যখন তাকে নিদ্রিত মনে করে চলে যায় অনুভা তখন চোখ খোলে। মিটিমিটি তাকায়। বিকাশ খাচ্ছিল। অনুভা হাসতে হাসতে তাকিয়েছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে সে। বিকাশের মোটা মোটা, ক্ষিপ্র, চলিষ্ণু আঙুলগুলোর দিকে সম্পূর্ণভাবে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে। সে অনেক দেখেছে। অনেক মানুষ। সরল, সম্ভ্রান্ত, উদার, উন্নাসিক ও উজ্জ্বল মানুষ। নাকের সূচালো ডগায় যাদের হিংস্র সতর্কতা—অনেক সুনিষ্ঠ চরিত্র, প্রশান্ত ললাট, চিবুকের প্রান্তে স্থূল অহমিকা। অনেক প্রেমিক। সঙ্কীর্ণ কাঁধ আর নির্বোধ নয়ন। বুদ্ধিজীবি। ভেসে বেড়ানো মানুষ। তার বাবাকে, অনুপমকে, বিকাশ, পান্নালাল, সুবিনয়ী, সেই বাসের ঘোমটাটানা বৌ। দেখতে দেখতে সে টিপে টিপে হাসছিল। হঠাৎ বিকাশের দিকে চোখ পড়ায় সে বলে—জেগে আছ এখনো? অনুভা চোখ মচকায়। হেসে হাত নেড়ে ডাকে! বিকাশ কাছে এসে দাঁড়ায়।

—এসো, শোও।

—কেমন আছ।

হাত ধুয়ে এস।

—কি হয়েছিল।

—শোন বলছি। মুখ নামাও। এক হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে,—

—আমার ছেলে হবে না। অনুভা হাসিতে মুখরিত হয়ে ওঠে,—এসো ঘুমোবে এসো।

বিকাশের ঘুম আসে না। অস্থিরভাবে মনটা পাক খেয়ে খেয়ে বেড়ায়। তার অস্থিরতার কেন্দ্রে অনুভার মুখটি আবছা। তাকিয়ে তাকিয়ে অনুভাকে দেখছিল। ঘুমে ভর্তি মেয়েটি। নিটোল, পূর্ণাবয়ব স্তন। কাঁধের রেখাটি সুডৌল হয়ে নুইয়ে আছে। গলা থেকে হাতটি ছাড়িয়ে সোজা হয়ে শু'ল বিকাশ। আশ্চর্য, ছেলে হবে! আর তারই স্পন্দনে ওর ধূসর, নৈবর্তিক শরীর ঘিরে কি গোলাকার সম্পূর্ণতা। চোখের তারা কি আশ্চর্য গভীর আর যখন চোখের পাতা কাঁপিয়ে চোখ মচকায়। সুরভির মত। ঘন পল্লব। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা

যায় না। অথচ অনুভার শারীরিক নৈর্ব্যক্ত্যের মধ্যেই তাকে সে স্পর্শ করেছে : ভালবাসার টান বুঝতে পেরেছে সিনেমা হলের মধ্যে বসে। তার বাবাও এ'কথা জানত। তাকে ভালো করে মন খুঁজে দেখতে বলেছিল। এরা কেমন করে বোঝে! অনুপমের কাছেও যখন সে বিবাহের কথা বলল সে বিস্মিত হয়েছিল ভাল করে ভেবে দেখতে বলেছিল। তার বাবা ও অনুপমের গলায় ঠিক একটি বিশেষ আধিভৌতিক উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল। অথচ এ'কথায় কোনো ভুল ছিল না যে, অনুভাকে সে বিয়ে না করে পারবে। দুজনে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত নিবিড় ঔদাসীন্যে। যতক্ষণ তারা পরস্পরের কাছে থাকত ততক্ষণ তারা শূন্য, ফাঁপা, সৃষ্টির মত নিগর্ভ। সত্যই তাই—বিকাশ এক একসময় বোধ করত তাদের এই পরিচয়ে সৃষ্টির আদিম বেদনা উপ্ত : এই বেদনা অসহ্য! হঠাৎ বিকাশ অনুভার মুখের দিকে তাকালে। তারই উত্তাপে কি একটু একটু করে অনুভা হয়েছে : রেখায় আর বিভাসে।

—এত অল্প কথা বল কেন? বিকাশ একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আলগা ছবি সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল,—কেন এত অল্প কথা বল তুমি?

অনুভা চকিতে তার দিকে তাকায়।

—তোমার ইচ্ছে করে না কিছু!

—ইচ্ছে। অনুভা তাকায়। পূর্ণায়ত দৃষ্টি। বড় বড় চোখের পাতা নামে ওঠে—কি ইচ্ছে করবে!

—জানি না! কত কি ইচ্ছে! যে কোনো ইচ্ছে। কেন তুমি কিছু বলতে চাও না।

বিকাশের অস্থিরতা অনুভার ভাল লাগে না। কেন চুপ করে থাকে না বিকাশ। ঠোঁটের রেখাটিতে কি অদ্ভুত একটি কোঁচ কুঁকড়ে ওঠে যখন ও চুপ করে তাকিয়ে থাকে। নিঃশব্দতায় ঘন হয়ে বিকাশকে সে অনুভব করে। সুখী হয়। চুপ করে ছবিটার কোন খোঁটে। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিকাশ। একটি নিঃশব্দ, ক্রুর হাসি বিকাশের ঠোঁটে রেখা ফোটায়।

—একটা ছবি আঁকো! বিকেল বেলাকার। গোধূলি নেমেছে। একটি

মেয়ে বসে আছে কাঠের চেয়ারে, ঋজু মেরুদণ্ড ; চোখে প্রাণ নাই ; পায়ের তলায় একটি ছেলে হাঁটু গেড়ে তার মাথার একটি ফুল চাইছে। কালো আর লালচেতে ছবিটার ফিনিশিং হবে। নাম দাও : মরা আলোর জোয়ার।

অনুভা চোখ তুলে তাকায়। বিকাশ শক্ত করে তাকিয়ে তখনো টিপে টিপে হাসছিল।

—কি থাকতে পারে আমার। চোখ না তুলে অনুভা বলে।

—এক একসময় মনে হয় তোমার দেহের মধ্যে তুমি নাই। তুমি প্রচণ্ড দুঃখ দাও : তুমি তা' জান। আর তাই তুমি কেবল দিতে পারো।

তবু বিকাশ বিয়ে করলে। কারণ, একদিন সে নিজেকে এত নিঃসীম অনুভব করলে যে তার আর কোনো দ্বিধা রইল না। একদিন তারা বসে আছে। অনুপমের সঙ্গে দেখা করা বিকাশের দরকার। তার যাবার সময় পেরিয়ে গেছে। ঠিক ন'টার সময় বিকাশ এখান থেকে ওঠে।

—দাদা বোধ হয় পার্টির কাজ ছেড়ে দেবে। ছবির কোন খুঁটতে খুঁটতে বললে অনুভা।

—পম বললে।

—কারখানাতে কাজ নিচ্ছে।

—কারখানায় কাজ করা তুমি পছন্দ করো।

—মন্দ কি ?

—না মন্দ কি !

—কাজ'ত করতেই হবে।

—তুমি কাজ ছেড়ে দিলে কেন ?

চোখ তুলে তাকায় অনুভা। সে বুঝতে পারে আবার অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে বিকাশ। গলায় আর চোখে যত বিদ্রূপ আছে এইবার সে ব্যবহার করবে। সে চুপ করে অপেক্ষা করে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। বিকাশ কবিতার পাতা ওলটায়। অনুভা আনমনে ছবি দেখে। জিজ্ঞাসা করলে বিকাশকে আর চা খাবে কি না।

বিকাশ বললে না। হঠাৎ তার দিকে তাকায় বিকাশ। হিংস্র আনন্দে তার চোখ চকচক করে।

—একটা কবিতা শুনবে?

অনুভা চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। কথা বলে না। তার বুক কাঁপে। বুঝতে পারে আজ যেন কিছু ঘটবে। অত নিষ্ঠুর চোখ বিকাশের।

বিকাশ ধারালো গলায় পড়ে যায়:

**You are beautiful and faded**
**Like an old opera tune,**
**Played upon a harpsichord.**
**Or**
**Like the sun flooded silks**
**Of an eighteenth century boudier.**

তার গলা তীক্ষ্ণ হয়:

**In your eyes**
**Smoulder the fallen roses of outlived muinutes**
**And perfume of your soul**
**Is vauge and suffsing.**
**With the pungence of sealed Spice Jars**
**Your half tone delighted me**
**And I grow mad gazing**
**At your bent colours.**

বিকাশ হাঁফায়। অনুভা ভয় পায়। এত উত্তেজনা তার কোনোদিন আসেনি। ন'টার সময় চলে গেলেই পারত বিকাশ।

'তুমি মানুষকে যন্ত্রণা দিতে পার'। 'তোমার দেহের মধ্যে তুমি নাই'। 'তুমি ঢেকে দাও মানুষের খুসী'। অনুভা অপেক্ষা করে। আরো কিছু বলবে বিকাশ। কিন্তু বিকাশ বলে না—নিঃশব্দে বইয়ের পাতা ওলটায়। কেন তাকে

বিকাশ এমনি বলে। কি করবে সে। কি করবার তার আছে। কি করতে পারে সে।

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সে দরজা খুলে দিতে নামে। হঠাৎ সিঁড়ির নীচে হাত ধরে বিকাশকে থামায়। হাত দিয়ে তার মুখটিকে নিজের দিকে ফেরায়।

—কেন রাগ করো তুমি আমার ওপর।

বিকাশ তাকাল তার দিকে। পূর্ণায়ত দৃষ্টি তার মুখের উপর প্রদীপের মত দপ দপ করে। বিকাশ ভয় ও লজ্জায় চোখ নামায়।

—কি করবো আমি বলে দাও। অনুভার মাথার চুল তার মুখ ছোঁয়।

—কি চাও তুমি আমার কাছে বল। কেন অমন করে বল আমকে। বিকাশ আবার চোখ তুলল। সেই স্থির, পূর্ণায়ত দুটি নির্ভরমান চোখ। সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রাস্তায় পা দিয়েই বুঝেছিল তার মাথার মধ্যে রক্ত দুলছে যেন নেশা করেছে, ঘুম পেয়েছে।

বিকাশ ছাদে উঠে আসে। উঠবার পথে দেখতে পায় তার বাবার ঘরে আলো জলছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভিতর থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে? বিকাশ সাড়া দেয়।

—এখনো ঘুমোয় নি।

—ঘুম আসছে না।

দুজনে ছাদে এল। স্বল্প ছাদ। রাত অনেক হয়েছে। বাতাসে শব্দ নাই।

—বৌমা কেমন এখন!

—ঘুমোচ্ছে।

—তুমি বাইরে যাবার কিছু ঠিক করলে।

—না ভেবে দেখিনি।

—আমার মনে হয় একজন নার্স আর ডাক্তার নিয়ে কিছুদিন বাইরে ঘাটশীলার ও'দিকে ঘুরে এসো। আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব আমাদের

সম্পাদকের ওখানেই থাকবে। তারা এখন অবশ্য ওখানে নেই। ফাঁকা, নতুন বাড়ী।

—হাঁসপাতালে দিলে কেমন হয়! কিংবা কোনো স্যানিটোরিয়মে।

—তুমি কি ভয় করছ। তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকাই এখন উচিত।

—অনুপমকে একটা চিঠি লিখে দেওয়া উচিত হবে না?

—সে আছে কোথায় এখন!

—ফরেক্কাবাদ।

দু'জনে অনেকক্ষণ বাইরে চেয়ে রইল। অন্ধকারে তারাগুলি ছড়িয়েছে। থেকে থেকে দমকা বাতাস বইছিল। অনেকটা ঝড়ের হাওয়ার মতন।

—একখানা যে নতুন বই ধরেছিলে কি হল তার।

—লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন? লেখা ছাড়লে কেন?

—ভালো লাগে না। দু'জনে আবার চুপ করে রইল। ক্রমশঃ আকাশের অন্ধকার লাল হয়ে উঠছে।

—কি হবে লিখে। হঠাৎ আবার বিকাশ বলল।

—ঘরে যাও। ঝড় উঠবে। বৌমা জেগে উঠতে পারেন। তিনি চলে গেলেন। তার ঘরের আলো নিভিয়ে দেবার শব্দ হয়। সেই শীতল অন্ধকারের মধ্যে বিকাশ দাঁড়িয়ে আকাশে লাল মেঘের সঞ্চার দেখতে লাগল। এক সময় একটা ঝড়ের হাওয়া আছড়ে পড়ল তার স্তব্ধ শরীরের ওপর। একটা দরজা সজোরে ঝনাৎ করে পড়ল। ঝড়ে তার চুল উড়ছে। হঠাৎ পাশের টবের একটা দীর্ঘ রজনীগন্ধার ডাঁটা তার পায়ের কাছে নুইয়ে পড়ে। বিকাশ সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে নীচে নামে। যেন এইজন্যে সে অপেক্ষা করছিল। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে কে যেন গুণগুণ করছে। সে এক অশরীরি ভয়ে স্থির হয়ে লক্ষ্য করে। চোখে অন্ধকার সহ্য হয়ে গেলে আবছা দেখতে পায় একটি নারী জানু আর কনুইয়ের ভরে পা দুটি গুটিয়ে উপুড় হয়ে আছে; চুলের অন্ধকারে মুখ চেনা যায় না। বুকে কাপড়

নাই। বোধ হয় অনুভা। অনেকক্ষণ বিকাশ বুঝতে পারলে না—সে কাঁদছে না গান গাইছে। সন্তর্পিত সে এগিয়ে যায়। পিঠে হাত রেখে ডাকে। কান্নায় তার নরম শরীর ফুলে ফুলে উঠছিল। ভয় কি: এই'ত আমি। তার কানে কানে বলে বিকাশ। অনুভা তার বুকের মধ্যে মাথা রেখে কাঁদে। দুটি সম্বিৎসু, আকুল হাত বিকাশের শরীরে কি খুঁজে বেড়ায়। রজনীগন্ধার ডাঁটাটি তার কপালে বুলাতে বুলাতে বিকাশ তাকে সান্ত্বনা দেয়। আর হঠাৎ শব্দের ঝাপটে সে নিজেকে ফিরে পায়: তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে:

He did not know if he was alive
And the girl was dead.
He did not know if the girl was alive
And he was dead.
He did not know if they both were alive
And both were dead.

বহুকাল পরে আবার সে শব্দের মধ্যে তরঙ্গিত হয়। গভীর মমতায় অনুভার চুলের ওপর রজনীগন্ধার ডাঁটাটি বুলায়।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অরুণার বিবাহোপলক্ষে সকলে একটি মজলিসে জড়ো হল। বাঙলা দেশেরই একটি গ্রামের মধ্যে তারা এই বাঙলোটি বানিয়েছে। এইখানেই একাউনটেণ্টের সঙ্গে অরুণা বিবাহপত্রে স্বাক্ষর করেছে। অরুণা যখন উইমেনস্ এসোসিয়েশনের তরফ থেকে বাঙলার গ্রাম পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিল তখন তার সঙ্গী ছিল একাউনটেণ্ট। একাউনটেণ্ট তার কোনো নিঃসন্তান জ্ঞাতির বেশ ফাঁপালো সম্পত্তি পেয়েছিল। অরুণা তাকে বললে লাকি ডগ। দু'জনে চাকরী ছেড়ে বিলেত যাওয়া বর্তমানে অসম্ভব বলে বাঙলা সফরে বেরুল। অরুণার অবশ্য গ্রাম দেখতে ভয়ানক ভালো লাগল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম—ক্রমশঃ বাঙলা দেশটা তারা চষে ফেললে। সব চেয়ে ভালো লাগত গাছপালা কাঁপিয়ে যখন ঝড় উঠতো। দিগন্তরেখা অন্ধকার করে কিংবা চারিদিক আচ্ছন্ন করে নামতো বাদল: দুর্ভেদ্য, ধূসর জলরাশি আর ফাঁকা মাঠে ঝড়ের ঢেউ খাওয়া এক রোমান্টিক উত্তেজনা। এখানে বাঙলো স্থাপনের ইচ্ছা জাগলো এইজন্যে। এইখানেই অরুণা বিবাহে সম্মতি জানায়। হঠাৎ একদিন দিগ্বলয় আচ্ছন্ন করে নামলো বৃষ্টি; রাত্রি তখন গভীর। মুকুন্দপুরে সভার জন্য মার্কসের ইঙ্গিত নিয়ে অভিভাষণ লিখতে ব্যস্ত ছিল অরুণা। পাশের ঘরে একাউনটেণ্ট হাত পা কেদারায় মিলে দিয়ে এডগার ওয়ালেসের বই পড়ছিল। এক ঝাঁক গ্রাম্য হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির তীক্ষ্ণ কণা টেবিলের কাগজ পত্র সব ওলট পালট করে দেয়। সেইদিন সকাল বেলাই একাউনটেণ্ট তাকে প্রস্তাব জানিয়েছিল—অরুণা বলেছিল ভেবে দেখব। জলের সঙ্গেই যেদিন নামল তুষারপাত। সারা শরীর অরুণার শিরশির করে ওঠে। কাপড়টাকে আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে একাউনটেণ্টের দরজায় ধাক্কা মারে।

—চোর না ডাকাত? পিস্তল নেবো না—বন্দুক?

—শীগগীর এসো। বেরিয়ে এসো। শিল পড়ছে বাইরে।

দু'জনে বাইরে এল। তাদের সামনের সবুজ জমিটুকু বরফের কণায় সাদা হয়ে গেছে।

—এই, তুমি গাইতে জানো।

—বাজাতে জানি—বাঁয়ে তবলা।

—কোরাস গাইতে পারবে।

—রবিঠাকুরের মীড় আমি পছন্দ করি না।

—নজরুল।

—তার চেয়ে তোমাকে পিঠে নিয়ে খানিকটা দৌড়াদৌড়ি করি শীত ভেঙে যাবে।

একাউনটেণ্ট তাকে পিঠে নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। দুজনে অদম্য ভিজল। শিল কুড়ালো। তাদের অনাবৃত শরীরে শিলের ধারা ঝরণার মত ঝরে। অরুণার হাসি বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দেয়। একাউনটেণ্ট ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।

—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীরটাকে'ত কম মজবুত করো নি। চা করতে করতে অরুণা বললে।

—সিগারেটের কৌটাটা যদি হাত বাড়িয়ে দাও দয়া করে। পাশ ফিরে একাউনটেণ্ট বললে। আরো রাত্রে জল থেমে গেল। উপরি উপরি কয়েক কাপ চা খেয়েও শীতের দুর্দমনীয়তা ভাঙলো না।

—দারুণ ঘুম পাচ্ছে আমার।

—তোমাকে ভূতের মত দেখাচ্ছে। অরুণা কলকল করে হেসে উঠল। বাদল রাত্রি সম্পূর্ণ মুছে গেছে আকাশে। নীল, হালকা চাঁদ উঠেছে। গুণগুণ করে গান গায় অরুণা। পায়ের পাথায় ভর দিয়ে এ'ঘর ও'ঘর আসা যাওয়া করলে অনেকবার—অকারণে। এক সময় একাউনটেণ্টের পাশে এসে বসল।

—এই কুম্ভকর্ণ, সরে শোও। একাউনটেণ্টের নাক দিয়ে নিদ্রার অবসাদ গর্জে উঠছিল। চুলের গোছা ধরে ঝাঁকুনি দেয় অরুণা। একাউনটেণ্ট পাশ ফিরে

শু'ল, বাকী জায়গাটুকুতে অরুণা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল। শীতে শিউরে উঠলেও চাপা গলায় গুণগুণ করছিল। একাউনটেণ্ট হাত বাড়িয়ে তাকে আরো ঘন করে নেয়। সারা রাত্রি তারা ঘুমালে না। ঠিক করলে বিয়ের পর কি করবে তারা। ছ'জনে মিলে যাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। কিম্বা সে থাকবে আটলাণ্টিকের ও'পারে—অরুণা উত্তর এশিয়ায়! বেতারে প্রেম করবে। আল্পস পেরিয়ে উড়ো জাহাজে তারা দেখা করবে। আরো হতে পারে T. E. Lawrenceর মত আরব আর বেদুইনের মধ্যে কিছুকাল প্রবাস বাস করে আসবে মাঝে মাঝে। তবে কেউ কারুর কাছে অধীন হবে না—না জীবিকায়, না যৌনে। একটা অফিস খুলবে তারা। টুরিং অফিসর হয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে পালা করে। অরুণা তার থিওরি শোনালে, একাউনটেণ্ট তার মতলব ফাঁস করলে।

* * *

বিকাশের ভালো লাগল এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। ছায়ায় মোড়া গ্রাম। গাছের তলায় বসলে স্বপ্ন দেখা যায়। আর বাতাস যখন গাছ পালার মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়—মর্মর করে ওঠে: 'আমারো বনভূমি, চুমিয়া যেও তুমি'

জানালায় দাঁড়ালে নদী চোখে পড়বে। বধূর কুঞ্চিত পদরেখার মত। লাল ধুলো। তিনটে কবিতা লিখে ফেললে। একটা সম্পূর্ণ সামাজিক। একটা প্রকৃতির উপর। আরও একটাতে তার আচমকা খুসীর ছাপ।

অনুপমের মগজ ক্রিয়াশূন্য হয়ে পড়ে। তার আসবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল বিকাশ নিয়ে এলো। সমস্ত অনুভূতিকে গভীর অবসাদ ঝিমিয়ে রাখে। লোটাস ইটারের দেশ! ঘর থেকে তার বেরুতে ভাল লাগে না। বিরক্তিতে সে ভরে ওঠে—অনাবশ্যক কথার জালে সে বাঁধা পাখীর মত ছটফট করে চারিদিকে তাকায়।

অরুণার ভাগ্য ভাল! সুরভি ভাবে, বাড়ীখানার প্যাটার্ণ কি চমৎকার! একটা ডালিম ফুলে যেন প্রজাপতি পাখা ছড়িয়েছে—বজবজের বাড়িটা করবার আগে যদি এটা চোখে পড়ত! কে জানত অরুণার ভাগ্যে এত আছে। যুদ্ধ থেমে

গেলে বিলেত যাবে আবার। মেয়েটাকে দেখতেও ভালো হয়েছে : মুটিয়েছে। বিয়ের জল! কিন্তু ও' বিয়ে টিঁকবে কতদিন। যা' পায় তাই ভালো। ঘর তার স্বামীর মত বনেদি নয়। হঠাৎ বড়লোক, ও'পয়সা দুদিনের।

এই ভালো! বড়মা খুসী হল। চোখ দুটি তার আনন্দে চিকচিক করে,—এই ভালো, দুজনে একটা জীবনের দিকে এগুচ্ছে; কি এসে যায় হিন্দুর প্রাচীন প্রথায় বিয়ে হল না বলে! একটি মধুর আনন্দলোক; সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছার উপর একটি তরুণ বাসনা। জীবন নতুন হোক : জীবন মধুর হোক।

সুরভি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিকাশ তা' বুঝতে পারে। অল্পক্ষণ আগে সে দল থেকে উঠে এসে এইখানে দাঁড়িয়েছিল। অনেকগুলো টবে বসানো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট খাচ্ছিল! কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ বাতাসে ভরালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখছিল। চারিদিকে আলো আর ফুল, আর আলোর মত মেয়েরা ফুল হাতে এ' টেবিল ও' টেবিল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ আগে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গতি নিয়ে এক পক্বশ্মশ্রু প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করছিল—মানে সামাজিক কেতায় শুনছিল ও সায় দিচ্ছিল। হঠাৎ সে ছায়ার মধ্যে উঠে এল। পায়ে তার মৃদুমৃদু তাল পড়ে। পাশের ঘরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কোরাসে রবীন্দ্রনাথের একটি আধ্যাত্মিক গান বাসর ঘরের আবেগে গাইছে।

—তুমি আসবে তা' ভাবতে পারি নি।

—কেন। সুরভির চোখের দিকে তাকাতেই তার দৃষ্টি নুয়ে পড়ল। তার সবুজ চোখে বড়বড় পাতাগুলি টলটল করছে। ছায়া অসম্পূর্ণ হয়ে পড়েছে সুরভির মুখে।

—তুমিও বিয়ে করলে! সুন্দরী বউ! কবির রুচি! সুরভির ব্যবহৃত কোনো বৈদেশিক গন্ধ তার মাথায় আটকে যায়। তারা দু'জনে বারাণ্ডায় ঝুঁকে দাঁড়াল। সুরভি বিকাশের নীচু, অপ্রস্তুত চোখের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো হাসছিল।

—বেবুনের জন্মদিনে তোমায় আশা করেছিলাম।

—দুঃখিত। পারলুম না। ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিছানায় তখন।

সুরভির দীর্ঘ, লতায়িত আঙুল তার শরীরের অত্যন্ত কাছে এলোমেলো ডালিয়া ফুলের পাতা ছিঁড়ছিল।

—বেশ বাড়িটা, না?

—সুন্দর।

—ভাল লাগছে না? টিপেটিপে হাসছিল সুরভি।

—মন্দ কি।

—আমার ভাল লাগে না। খানিকটা অলস আবেগে সুরভি দুলে উঠল,—আমার ভালো লাগছে না। কালকেই চলে যাবো ভাবছি। বাবাকে জানানো উচিত ছিল।

—একদিন দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে—মাসিমা এখন কেমন?

—ধন্যবাদ। ভালো নয়। বাবা'ত এখন রামকৃষ্ণ মঠেই থাকেন। অরুণাকে বাবা খুব ভালবাসত।

বিকাশ যন্ত্রণা বোধ করে। ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা কইতে গেলেই একটি শারীরিক পীড়া সুরু হয়। আনমনে তাকায়। সুরভি নিঃশব্দে হাসছিল। হালকা, ফিরোজা শাড়ীটি বাতাসে খসখস করে।

—ও'টা কিসের গন্ধ বল'ত। কাঁঠালি চাঁপা না রজনীগন্ধা?

—কাঁঠালি চাঁপা।

—তোমার প্রিয় ও প্রসিদ্ধ ফুল। আগে'ত তুমি চাঁপা ছাড়া কবিতায় ফুলের নামই করতে না। বাগানে বসে লিখতে।

বিকাশ বাগানে বসে লিখত। সে অনেককাল আগে। সুরভিদের বাগান ছিল। সুরভি চাঁপা রঙের শাড়ী পড়ে আসত, চাঁপা ফুলের গন্ধ উঠত চারপাশে।

সুরভি মনে করিয়ে দিলে তার কাছে এখনো একটা বিকাশের লেখা কবিতা আছে: নীল রঙয়ের কাগজ ছাই রঙে ছাওয়া; তখন বয়স অল্প—মন কাঁচা; তখন তার চোখ কাঁপত, মন দুলত। অনেক কবিতা লিখেছে বিকাশ। কিছু বলতে না পারার উত্তাপে তাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

—আমার বাগানের সব চাইতে বড় চাঁপা ফুল হয়ে ফুটেছিলে তুমি।

—তোমার দেহের ছায়ায় আমার ঘুম নিটোল হয়।

—তারা তুমি।

—বসতে দাও দু'দণ্ড তোমার পাশে। চোখ মেলেছি : চুল খোলো।

—ঢেকে দাও।

সুরভি শুনত। তার কাছে এলে না বলে সে পারত না। রাণীর মত নিঃশব্দ করুণায় উপহারগুলি সুরভি নিত। যেন তার প্রাপ্য সমস্ত!

বিকাশ চোখ তুলে চাইলে। হঠাৎ সে বুঝতে পারলে সেই টান আজও কোথায় যেন শেষ হয় নি। সুরভিও যেন তা' জানে। দু'জনে বোধগম্য হাসল। মায়ার মধ্য থেকে নিস্তার পেয়ে আবার সভার দিকে এগিয়ে গেল বিকাশ।

অনুপম সুজাতাকে বলছিল কলকাতায় কতদিন থাকবে তারা। সুজাতা বললে বেশী দিন নয়। তারা নিঃশব্দে আলাপ করছিল। অনুপম বললে সেও একটু বাইরে যাবে মনে করছে।

সুজাতা তাকে বললে নভেম্বরের পরে যদি যায় ঘাটশীলার ওখানে তখন তারা থাকবে যেন ঘুরে যায়।

—আপনারও'ত এবার বিয়ে করা উচিত। আপনার বন্ধুও'ত করলে।

—মেয়ে দেবে কে?

—কেন? কম্‌রেড-দের'ত মেয়েরা আজকাল পছন্দ করে।

—কিংবা সি কমরেডদের বাজার আজকাল চড়া। দুজনে হাসল।

বেশ মেয়েটি। মনে মনে ভাবলে অনুপম। একে বড়মা বলে বিকাশ। হাসতে জানে মেয়েটি।

দুজনে মুখোমুখী দাঁড়াল।

অনুভা আর সুজাতা। বিকাশ মধ্যস্থতা করলে।

—আমি কিন্তু অনায়াসে চিনে নিতে পারতুম। বিকাশের পাশে আর কাউকে মানায় না। হাসিতে রঞ্জিত হয়ে ওঠে সুজাতা।

—অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী শুনেছি আপনার। মন থেকে আপনার ছবি এঁকে দিতে পারি। সুনত্রতার অনুভা সজাগ হয়।

এই অনুভা! সুজাতা এক নিমেষেই বুঝতে পারলে কোথায় টান বিকাশের। আশ্চর্য্য কালো চোখ। শুষে নেয়।

একেই বড়মা বলে বিকাশ। অনুভা সুজাতার চিবুকের দিকে তাকিয়েছিল। আমের মত সুচালো হয়ে আসা—ঈষৎ চাপা ওপরের দিকে—কমলালেবুর মত: পৃথিবীর মত। তার বিয়ের আগে চিঠি লিখত। তারা দুজনে লিখত। একটা পূরো গল্পের এ আধখানা ও আধখানা। সুন্দর সাজানো দাঁত।

তারা বসল। বিকাশ অন্যত্র যায়।

—সেদিন ছবি দেখছিলাম আপনার। সুন্দর রঙ। কত রঙের খেলা।

—আমি কিন্তু ভাবি যদি লিখতে পারতুম আপনার মত। এত সহজে কি করে প্রকাশ করেন নিজেকে। কি সুন্দর, স্বচ্ছন্দ। আপনার লেখা উনি খুব ভালবাসেন।

—কিন্তু ওর লেখা ফুটিয়েছেন আপনি। আপনিই ওর শূন্যের নীহারিকা।

—আপনি ওঁকে অবশ্য আগে থেকে জানেন।

—জানতাম। একদিন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে সার্থক হবে।

—সার্থক হলে সার্থক হব। কিন্তু কি সেই সার্থকতা?

—ওর লেখা। আগে ও ভাবত। এখন ভাবনা ফুটল কথা হয়ে। কথার ফুল হয়ে। এ'ত যে ওর লেখার রঙ সে'ত নিজেকে ফাটিয়ে ফুটিয়ে।

—বিশ্বাস করুণ, আমি এত কম জানি! হাসিতে সচ্ছন্দ হয়ে ওঠে অনুভা! এই বড়মা। এ'কে তার ভয় নাই। তার অনেক জোর। অনেক গভীরে তার মূল। তার ভয় নাই। নির্ভয়ে হাসল অনুভা।

উচিত হয়নি এই মেয়েটিকে বিয়ে করা বিকাশের। ওদের চোখে খুসী নাই। কালো চোখের তারা ভাই বোনের। মনে মনে বললে সুজাতা।

*

—সাদা কাপড়ে তোমায় চমৎকার মানায় বড়মা। শান্তির প্রতীক। বিকাশ বলল।

—এই যে সু, কেমন আছো। ছেলেকে আন নি। চমৎকার দেখতে হয়েছে'ত তোমায়। সুরভির দিকে চেয়ে হাসলে সুজাতা।

*

—পান্নার লকেট'টা দিলাম খুলে ফেললি কেন। ত্রস্ত সুরভি অরুণাকে একান্তে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

*

—একলা কেন—আসুন। অরুণা অনুপমের কাছে গিয়ে ডাকল।

* * *

বিকাশ তার কবিতা পাঠ করছিল। স্বাধীন গলা। উঁচু নীচুতে খেলে। অনুপম এক কোনে বসে দেখছিল। এত খুসী ওরা জমিয়ে রাখে কি করে। এদের মধ্য থেকে বিকাশকে খুঁজে বার করা শক্ত। কত অল্প এরা চায়। বিকাশই ঠিক। তাই সে সুজাতাকে, সাদা, ফিনফিনে, সরু কালোপাড় কাপড় পরা মেয়েটি যে হাসতে জানে, তাকে বড়মা বলে। খানিকক্ষণ সে মনোযোগের সঙ্গে শুনল। বিকাশের উচ্চারণ পদ্ধতি অনুপমের ভালো লাগে। শব্দের ব্যঞ্জনা আছে বিকাশের উচ্চারণে। এক সময় আবার সে ভাবছিল। তার সঙ্গে কারুর মেলে না। তার অনুভূতির জিজীবিষায়—প্রাণের পরিকল্পনায়! অনেক দূরে, অনেক বড় সে। এদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে কোনো চরিত্রের সামনেই নিজেকে তার বড় মনে হয়। সকলের উচ্চ হাততালি ও প্রশংসার মাঝে বিকাশের কবিতা পাঠ শেষ হল। সোজা হয়ে বসে অনুপম ভাবলে অনুভার সঙ্গে বিকাশের বিবাহ ঠিক হয় নি যে, এই সুন্দর মেয়েটিকে যে, হাসতে জানে তাকে, বড়মা বলে। সকলে সুজাতাকে কিছু বলতে বলল। বিকাশ অনুপমকে জিজ্ঞাসা করল কেমন বোধ করছে সে। অনুপম উত্তর দিলে না, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল ঐ মেয়েটি অরুণার বোন নয়?

—হ্যাঁ।

—ওর বাবা রামকৃষ্ণ মঠে থাকেন আর মায়ের হিষ্টিরিয়া?

সুজাতার বলা শেষ হতেই অনুপম হাততালি দিলে। যদিও সে কিছুই শোনে নি।

—চমৎকার বলে'ত তোমার বড়মা।

—মেয়েটার বলায় ভঙ্গী আছে। আগে লিখত।

—অনুভাকে বোলো ভালো না লাগলে যেন আমার ওখানে মাঝে মাঝে চলে আসে।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে গুণগুণ করে গান গাইছিল বিকাশ। সামনেই পূজো। এখন থেকে খাটতে পারলে কাগজটা ভালভাবেই উতরোবে। কয়েকটা লেখা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে তার। দুটো ছবি তিন কলারের। অনুভা নিজের ছবি প্রকাশ করতে চায় না। মাকড়সার জালের মতন নিজের মধ্যে নিজেই বন্ধ থাকবে। অজ্ঞাতেই তার ঠোঁটটা কুঁচকে যায়। ইতিমধ্যে আবার কিছু না হয়ে পড়ে। কালকেও আবার বেদনাটা উঠেছিল। আশ্চর্য সহ্য শক্তি। ঐটুকু শরীরের মধ্যে কি ভয়াবহ মানসিক প্রতিরোধ বৃত্তি। সব শক্তি ওর চোখে। বাইরে একবার যেতে হবে। পাহাড়ে জায়গার চেয়ে সমুদ্রই তার ভালো লাগে। সে কখনো সমুদ্র দেখেনি। কিন্তু অনুভার পক্ষে পাহাড়ী আবহাওয়াটাই ভাল। হাজারীবাগ কেমন। কিংবা মধুপুর। বড় রুক্ষ দেশ। রোদে চড়চড় করে। পাহাড়ে চড়তে পারে না সে। ওপরে উঠলে মাথা ঘোরে। মাটি চোখের উপর ভাসে। সমুদ্র কিন্তু ভালো। ঢেউয়ের পর ঢেউ। চোখ বাধা পায় না। ঢেউয়ের উপর আলোর নাচ! তারার আলো, মাঝিদের টিমটিমে নৌকোর আলো: আলোর নাচ নাচায় চাঁদ। সূর্য যখন ডোবে আর ওঠে। অনু কে এই রকমের একটা ছবি আঁকবার আইডিয়া দিতে হবে। ফুলো ফুলো ফেনার র আলোর টুপী। তেকোনা গড়নে: জাপানী ধাঁচের। অনুভার কনশেপ্‌সনের অভাব। ওদের ফ্যামিলিটাই নিউরেটিক। কিন্তু আশ্চর্য শক্তি ওর মনের আর স্বভাবের। পমও তাই। ওর কঠিন চোখ দিয়েই একদিন তাকে সাপের মতন গিলে নিয়েছিল। অরুণার থিওরিটা সত্যিই সত্যি। আজ যদি তার বিয়ে না হত কিংবা, অনুভা হঠাৎ মরে যায়। দ্রুত একবার ঘুরে দেখে নিলে

বিকাশ। না, ঘরে নেই। গা ধুতে গেছে। আচ্ছা, খুসী'ত মনেরই আর সেই মনের খুসী নিয়েই' আমাদের ভালবাসা। কারণ ভালবাসতে পারাটা ভালো থাকতে পারার পরিপূরক। আর তারজন্য সুখটাই বড় কথা; অন্যতম উপলক্ষণ। আর সুখী হতে চাওয়াটা খারাপ বা অন্যায় কোথায়। ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত যাই বল না কেন সুখই আমরা চাই। আর সে সুখটা ভালো থাকতে পারার সুখ। 'আমার খুসী,' 'আমার ভাললাগা,' 'আমার ভালবাসা' একথা বল্লেই লোকে চটে উঠবে কেন? 'এসকেপিষ্ঠ' 'বুর্জোয়া' বলে গলা ফাটাবে। আমার বদলে বহুবচন ব্যবহার করলেই কাগজওলারা লিখবে দেশপ্রাণ, ছেলেরা সামনে নিয়ে মিছিল করতে সুরু করবে। আর অল্প বয়সী মেয়েরা ঘন ঘন চাঁদা চাইতে আসবে। আসলে, কথা দুটিই গোড়া মেরে দিয়েছে। পাত্র চাকরী করে না কবিতা লেখে শুনলে পাত্রী পক্ষ খুসী হয় না, সন্দেহ করে, ভদ্রলোকেরও ঐ দুটো কথা গায়ে মাখিয়ে দিলে খুসী হয় না—ভয় পায়, কোন খোঁজে। কিন্তু, আমি সুখী হলেই তবে অপরের সুখ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি। আয়নাতে অনুভার ছায়া পড়ল। হঠাৎ তার চিন্তা থমকে গেল। ক্রীম ঘষতে ঘষতে ঘুরে দাঁড়াল বিকাশ। স্নান সেরে এইমাত্র কাপড় পরেছে। খোঁপাটা আলগা কাঁধের উপর নোয়ানো। নরম, ঈষৎ কপালে ঝিকঝিক করছে কাঁচপোকার টিপ। এত নরম শরীর কিন্তু কি কঠিন মন! হঠাৎ বিকাশের মনে হল: সাপের মত—গিলে ফেলে। অনুভা দেরাজ খুলে চুড়ি বার করে পরে।

—বাইরে যাচ্ছ নাকি? ইয়ারিংটা কানে আঁটতে আঁটতে বলে।

—হ্যাঁ। আজকে বোধ হয় আসতে পারব না। একটু বাইরে যাবো বড়মার সঙ্গে, কালকেই এসে পড়ব!

—আকাশ দেখেছো, জল আসতে পারে। চোখ তুলে বলল অনুভা, —সে দিনের মত ভিজবে।

কিছু বলবে নাকি! বিকাশ সভয়ে অন্যদিকে তাকায়। যদি বলে যেও না; শরীর'টা কেমন করছে। বিকাশ বাঁকা চাইলে।

—রেইন কোটটা নিয়ে বেরিও। অনুভা একটু হাসল। ভাগ্যিস বলে নি।

কি বলত সে। কখনো অনুভা বলে না! কেন বলে না। অজান্তে বিকাশ তার কাছে সরে এল।

—সাজলে কিন্তু মানায় তোমাকে।

—সাজলুম কোথা।

—তবে সেজো না। অলকে কুসুম না দিও। টিয়া পাখী রঙএর টিপটা কিন্তু তোমার মুখটাকে খুলিয়েছে। বিকাশ সরে এসে মুখটা তুলে ধরল। একথালা জলের মত টলটলে মুখ। দু'হাতের মধ্যে ভাসছে। একটা চুমু খেলে। চোখের বড় আর ঘন পাতা বিকাশের গালে পাখা বুলালো।

—সত্যি, তোমার নিজের একটা study নাও না। চোখ দুটোকে মুখের উপর ভাসিয়ে দিও: মুখর চোখ। তোমার কলার সেট আমার ভালো লাগে।

—তোমার কথাও আমার সুন্দর লাগে। চোখ নীচু করে হাসল অনুভা, —যদি দেখো, আমার ছবি তোমার কথায় মিললো না—মন ক্ষুন্ন হবে'ত?

বিকাশ তীক্ষ্ণ করে চাইল,—মন নিয়ে এত উতলা হলে কেন?

—উতলা নয়! অনুভা কথা না কয়ে থেমে গেল।

—পুজোর পর হাজারীবাগ যাবো ভাবছি! Hilly change. ইদানীং কেমন বোধ করছ শরীর!

—ভালই'ত এখন। দাদার একখানা চিঠি এসেছে কাল।

—কি লিখেছে? আসবে নাকি কলকাতায়?

—বোধ হয়।

হঠাৎ হুড়মুড় করে জল নামল। অনুভা জানালা ভেজিয়ে দিলে। বিকাশ বিছানায় বসল। ঘড়িটা দেখে নিলে—সাড়ে পাঁচটায় গাড়ী। এখনো দেরী আছে আর লোক্যাল গাড়ী ঘন ঘন পাওয়া যাবে।

—তোমার ছবির ফাইলটা দাও না। বড়মা তোমার ছবির প্রশংসা করছিল।

—তিনি নিশ্চয়ই ছবি খুব ভালো বোঝেন।

—তোমার নিজের ছবি সম্বন্ধে মোহ আছে—খানিকটা গর্বও বলা যেতে পারে।

—নিজের ছবিকে ভালবাসাটা কি অন্যায়। তুমি'ত ব্যক্তিত্ববাদের গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক।

—কিন্তু আর্টের সমালোচক। কঠোর ও নির্ভিক।

—যদি তোমার সঙ্গে না মেলে।

—একের সঙ্গে অপরের বিরোধ ব্যক্তিত্ব নিয়ে।

—একের মন অপরের কাছে অনুভূত হয় কি করে? একের সৃষ্টি অপরের সুন্দর লাগে কেন?

—বোধ হয় তর্কাতীত বলে, কিংবা, বিরোধটাই আকর্ষণ। তাই সুন্দর।

—বোধ হয় কেন?

—অনুভূতিটা ব্যক্তিক।

—ওঃ। চোখ নামিয়ে অনুভা পায়ের নখ খুঁটতে থাকে। বিকাশ আবার তীক্ষ্ণ করে তাকায়। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে গুমোট বোধ করে বিকাশ। আক্রোশের গুমোট। আক্রমণে উদ্যত হয়ে ওঠে সে। চকচকে চাপা হাসি-ভরা চোখ নিয়ে অনুভার দিকে চেয়ে থাকে। আহত পশুর মত, পোষা পায়রার মত অনুভা কুশানে বসে নখ খোঁটে। কি আশ্চর্য শক্ত মন। পরদার পর পরদা।

—সরে এসো না। বিকাশ চাপা হাসতে হাসতে বললে,—অতদূরে যে তোমার নাগাল পাই না।

অনুভা চোখ তুলে আবার নামিয়ে নেয়।

—যেতে ইচ্ছে করছে না। মন নিয়ে আরো কিছু বল শুনি।

অনুভা উঠে জানালাটা খুলে দিলে। জল থেমে গেছে। শরৎকালের বৃষ্টি। আচমকা আসে আচমকা যায়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার মুখে লাগে। খানিকক্ষণ বিকাশের দিকে পিঠ করে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। নীচে মানুষ, দোকান, সভ্যতার সরিসৃপ স্রোত। তার ঠোঁট কাঁপে। গোড়ালি থরথর

করে। আর পারে না সে! বেদনায় সে'ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে যায়—কান্নায় সম্পূর্ণ মুছে যেতে! কেন পারে না। সে'ত তার ভালবাসায় নিস্পল, তার অপেক্ষায় মগ্ন, তার বেদনায় প্রগাঢ; কিন্তু তবু বিকাশ তাকে কেন মারে: কথায় কথায় খুঁচিয়ে তোলে। তার বড়মা: সুজাতা দেবী! তার সুখ! কবিতা! আজও আবার যাবে সেই সুজাতা দেবীর সঙ্গে কোথায়—রাত্রে বাড়ী আসবে না। আর পারে না সে! তার গোড়ালী থরথর করে। চোখে জল আসে।

বিকাশ এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। ক্ষিপ্র, অনুভা মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে শারীরিক চেষ্টা করে চোখের জল চাপতে—বিকাশকে দেখতে না দিতে। হাতটা ছাড়িয়ে কুশানটায় গিয়ে বসে।

বিকাশ বুঝতে পারে। পাশবিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। কাঁদুক। কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ুক ওর পায়ে। ওর প্রতিরোধের দেওয়াল গুঁড়িয়ে মিশিয়ে যাক মাটির সঙ্গে। বিকাশ তার কথার বর্ষা দিয়ে খোঁচায়—আর অনুভা যখন অব্যক্ত ব্যথায় ছটফট করে, আরক্ত হয়ে ওঠে তার দেখতে ভালো লাগে। বিকাশ আবার তার পাশে এসে দাঁড়াল—সুন্দর সন্ধ্যা, তার মুখটিকে জোর করে তুলে ধরল আলোর দিকে—এমন সুন্দর মুখ,—পৃথিবীর দিকে খানিক ফেরাও। পৃথিবী আলোকিত হোক। ধন্য হই আমরা। বিকাশ টিপে টিপে বলছিল। তার চতুর চোখ বিদ্রূপে চকচক করে। অনুভা নিস্পলক বসে থাকে।

—একটা কবিতা বলতে ইচ্ছে করছে। বিকাশ আবার বলে: End of Episodeটা মনে আছে:

> Induldge No more may we
> In this sweet bitter past time:
> The love light shines the last time
> Between you sweet and me.

অনুভা চোখ তুলে আবার নামালে। বিকাশ চাপা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—শেষ'টা আরো তীব্র:

Ache deep ; but make no moans :
Smile out ; but stilly suffer :
The paths of love are rougher
Than through-fare of stones.

বিকাশ হাসতে লাগল !

—তুমি জানো আমি বলতে পারি না।

—সব ভালবাসার-ই কি এক উপলব্ধি নয় : End of the Episode.

—এই কথাটা বার বাব শোনাও কেন ?

—তোমাকে শোনাই না, নিজে শুনি।

—কিন্তু এপিসডের শেষেও'ত তোমার জন্য অনেক কিছু আছে, সেখানে'ত হার্ডির কবিতা একটি সুন্দর আবৃত্তি।

—একটা কথা স্পষ্ট করে বল না কেন ?

অনুভা চোখ তুললে।

—ঈর্ষা, ঈর্ষা তোমার মনে। বিকাশের কথা পাৎলা, অনাবৃত, একটানা, যেন স্বীকারোক্তি দিচ্ছে,—নিজের উপর তোমার অহঙ্কার, তোমার ভাইয়ের মত। তোমার ছবি প্রকাশ কবতে চাও না ঠিক এই কারণে। সে হাঁফায়। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ে,—তুমি জানো, কোথায় তোমাব জোর : তাই এত স্বচ্ছন্দ তুমি। তোমাব স্বভাবেব সঙ্গে মিশিয়ে যা' না আসে তার উপব তাই উদাসীন।

—এত জানবার পরও কেন বিয়ে করেছিলে। তোমার বড়মার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আরো অনেকদিনের। সুখ যদি চাও ভালবাসার কথা বল কেন ! সর্বাঙ্গ থরথর করে অনুভার, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে।

—আরো সহজ করে বলতে পারতে ভুল করেছিলুম আমবা।

—আমার কথা বলতে চাই না।

—চাইলে ভাল কবতে। অন্ততঃ বাঁচতে তুমি, থাকত আমার সুখ।

—তোমার সুখ'ত তোমার কথা। কথার মধ্যেই'ত থাকতে চাও তুমি।

আমাকে বাদ দিয়েও'ত সে সুখ আছে তোমার। তোমার কবিতা আছে, তোমার বড়মা : সুজাতা দেবী।

—তার নাম অত নাই করলে। তার সঙ্গে তোমার কি !

—আমার কি ! তোমারই'ত সুখ ! তোমার সুখের ভালবাসা।

—ভালবাসি কি না জানতে চাও। হাঁা, ভালবাসি। ভালবাসি ! তার ভালবাসা পেলে ধন্য হই। ভালবাসার মত প্রাণের বায়ু আছে তার। রাগে অন্ধ হয়ে সিগারেট টানতে ভুলে যায় বিকাশ ; কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। হঠাৎ টান দিতে গিয়ে দেখে ছাই জমেছে আগুণ নিভে গেছে।

—যাও, যাও, তুমি যাও। দুহাতে অনুভা মুখ ঢাকল,—মনে পড়ে, মনে পড়ে তোমার, অনুভা দু-পায়ে উঠে দাঁড়ায়। খোঁপা খুলে গেছে, জলে মুখ ভাসছে। নিরালম্ব, শূন্য, প্রাতিভাসিক মুখ।

—একদিন বলেছিলে তুমি,— সব নাও আমার : সব দাও তোমার : সেও কি কথা, কথার সুখ। কি দিলে তুমি ! আজকে মারছ কেন এত। ভয় করো, ভীরু ! ভালবাসার সামনে দাঁড়াতে ভয় করো। কি করতে পারে তোমার বড়মা আমার। কথা দিয়ে আড়াল করো নিজেকে। অনুভা টলে ; কুশানের পেছনটা ধরে বসে পড়ে।

—অনু ! ভয় পেয়ে বিকাশ এগিয়ে আসে।

—না,—এসো না, ছুঁয়ো না,—দু'হাত শূন্যে তুলে অনুভা আশ্রয় খোঁজে : বিকাশ থমকে যায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় তাকিয়ে থাকে।

—যাও, যাও তুমি। সেই ভাল যদি তুমি কোন দিন না আসতে, না দুঃখ দিতে।

বিকাশ যে কেমন করে বেরিয়ে গেল ও বাসে গিয়ে উঠল ঠিক তার খেয়াল নাই। প্রগাঢ় বিহ্বলতা তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করে ধরে। হঠাৎ মোড়ের গির্জায় মাথার ঘড়িতে টং টং করে আটটা বাজল। ভয় পেয়ে যেন সে আঁৎকে উঠল। আটটা। হাতের ঘড়িটা দেখলে চার মিনিট ফার্স্ট ! সাড়ে আটটায় তাকে পৌঁছুতে হবে ; আধ ঘণ্টার উপর যেতেই লাগবে। ২—এ, ২, ৩৩ ঐ ৩ নম্বর

বাস। লোকের গায়ের উপর দিয়ে উঠে পড়ল বিকাশ। অসম্ভব ভীড়। কলকাতার পুজোব মত ভয়াবহ কিছু নাই। তায় লড়াই। একজন প্রৌঢ় নেমে যাওয়াতে বিকাশ বসবাব সুযোগ পেলে—ঘামে তখন সে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। হঠাৎ জন হয়ে যাওয়ায় গুমোট পড়েছে। কি যেন হয়ে গেল। বিকাশ মনে কবতে চাইলে একটা সিগারেট ধরিয়ে। বাস মৌলালির মোড পেরুল। অন্যমনস্ক চোখে ইতস্তত: অনুধাবন করতে করতে সে মনে করতে চেষ্টা করল। কোথা থেকে যেন কি কথা এল গড়িয়ে আর কি যেন ঘটে গেল। অনুভার মুখটা মনে পডল। কাঁদে কেন—এত মায়া হয়। অনুভার নিস্পল, অস্বচ্ছ, কান্নাব সরু সরু দাগ কাটা মুখখানি মনে আসে। মাযা করতে ইচ্ছা হয়। সব দাও তোমার, সব নাও আমার। হঠাৎ মনে পড়ে বিকাশের। আচমকা, তার ভেতরটা মুচডে ওঠে। এক ঝলক ছবির মতন সমস্ত বিকাশের মনে পড়ে। সব দাও তোমার: সব নাও আমাব। সব দাও তোমার, সব নাও আমার। বিকাশের মনে কেবল শব্দগুলি ওঠে ও পডে: সব দাও, সব নাও। সব দাও তোমার। তুমি আমার। কাকে বলছিল, অনুভাকে? এক অসহায় ঘৃণা আসে নিজের উপর। খানিকক্ষণ তার মনে কথা আসে না, ধাবমান পথের দিকে চোখ মেলে থাকে। সে কি কেবল কথাই বলে: কথার আড়াল। কেন অনুভা বলল। কিন্তু অনুভা'ত বলে না, সে অপেক্ষা করে। ঐ অপেক্ষা এত তীক্ষ্ণ, একাগ্র। অনুভাকে আবার মনে পডল তার। সরু নাক, নরম কপাল, স্পন্দমান বুক, ভীরু ভুরু! বিকাশের বুক দোলে। সে তরঙ্গিত হয়। এক বিবিক্ত ভালবাসায় সে অসহনীয় হয়ে ওঠে আবার। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করে। ভালবাসাটাই কি বিরোধময়। সুখের বাইরে কোন সমর্পণ। যাব শেষ নাই। যার মধ্যে অনুভা নিঃসীম। কড়ে আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে তার চিন্তা এক সময় নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে—যার মধ্যে মন হারিয়ে যায়, হাঁফিয়ে ওঠে। কিংবা ঈর্ষা; হয়ত অনুভাই ঠিক। বড়মার কাছে গেলে সে সুখী হয়। পৃথিবীকে ভালো লাগে। সুন্দর দাঁতে হাসলে, আর গজদন্তশুভ্র কপালে বিদ্যুতিক আলো চিকচিক যখন করে কবিতা বলা যায়। ভালবাসার মধ্যে অনুভা আটকে রাখতে চায়: Blackmail.

যে কোনো মেয়ের মত। বাঁ দিকে মাথাটা বিকাশের হেলে যায়, চুলগুলো কাণের পাশে ঝোলে। নিজের অধিকারের উপর বিশ্বাসী : ক্রিয়াশীল ও অমোঘ। বিয়ে সে করতে চায় নি—ঘৃণা এল ; প্রচণ্ড, অতর্কিত ঘৃণায় অনুভার প্রতি কণ্টকিত হয়ে উঠলো : আক্রমণাত্মক ! ঘৃণা আর বিপক্ষতায় এক মুহূর্তে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখ জ্বলে। অবরুদ্ধ অতীত হু হু করে তাকে ঝাপট মেরে যায়।

বর্ষণক্লান্ত আকাশে নক্ষত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জোলো বাতাস বৃষ্টির গুমোটের পর আরাম দেয়। স্যাঁত স্যাঁত করে। অনুভার আকর্ষণটা কি সত্যি নয়, বিকাশ একসময় আবার ভাবলে : যন্ত্রণাকর আকর্ষণ। যন্ত্রণার সুখ : সুখের যন্ত্রণা। তার চোখের দৃষ্টি সরল হয়। কি যেন বুঝতে পারে সে। বসবার ভঙ্গীতে সাবলীলতা আসে। জীবন দিয়েই জীবনকে জানা যায়। অনুপম একদিন বলেছিল। সেও একদিন বলেছিল অনুভাকে। সব দাও তোমার সব নাও আমার। হয়ত দোষ অনুভার নয়। জীবন কল্পনাই আমাদের আদিম ধারণার বেগ। কিন্তু সুখটা কি। সুজাতাকে মনে পড়ল। দীর্ঘ, স্বচ্ছন্দ, আয়ত মহিলা। সুখটা কি ব্যবহারিক বৃত্তি। সামাজিক সাড়ে বত্রিশ ভাজা। বাপ মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র। সুখের ফসল। আমার আমি, তোমার তুমি। তোমার আমার মিলিত স্বর্গ। হঠাৎ বাইরে নজর পড়ল। একটা উত্তাল ছবি। অয়েল কলারের জ্যাবড়া পোঁচ। দোকান, গাড়ী, বাড়ী, মানুষ, সমস্ত এক। চোখের সামনে সব একে একে পেরিয়ে গেল।

# ষষ্টদশ পরিচ্ছেদ

রৌদ্রালোকিত প্রান্তরটি দিগবলয়লীনের বিস্তীর্ণ আভাস ছুঁয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মাথার উপর। দিগন্তের ওপারে দুটো সবুজ, দীর্ঘ গাছ। বিকাশের পা ডুবে যেতে লাগল ঘাসের মধ্যে। উজ্জ্বল, মসৃন ঘাস : ঘাসের প্লাবন। বিকাশের পাশে পাশে, কখনো পিছনে, কখনো এগিয়ে চলেছে সুজাতা। তার দীর্ঘ, চিকন শরীর শুভ্র রেখার মত—বিকাশের মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে। তার মনে স্পর্শের শব্দ বাজে। ঘাসের উদভ্রান্ত বন্যায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আজকের এই হিল্লোলিত প্রভাতটি একটি মনোরম লাবণ্য নিয়ে উদবাটিত হয়েছে। অনেকদিন পরে একটি প্রভাতের সঙ্গে তার মন জড়িয়ে গেল। আলোয়, হাওয়ায়, মর্মরে, সুজাতার রেখান্বিত অদূরতায় সে ঠাসা। উজ্জ্বল, ঝকমক করছে সে। কম্পমান চোখে সে সামনে তাকায়।

খুব সকালে তার ঘুম ভেঙে গেছল। বিস্তৃত অবসন্নতায় সে চোখ খুলে পড়েছিল। প্রত্যূষের আলোয় গ্রামটি ফুটছে যেন। বাইরে এল। ঘুমের জড়তায়, শিশিরে, হাওয়ায় মুখ তার করুণ দেখায়। এলোমেলো চুল। চশমাটা নাকে লাগায়। চশমা না নিলে এক পা'ও সে চলতে পারে না। তার সেই জড়, নির্জিব মুখ চশমাতে হাস্যকর দেখায়। মানুষের কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছে এখানে ওখানে। বিকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গো-দোহন দেখতে থাকে। পাটকিলে রঙের গাভীটি। কৃষ্ণায়ত চক্ষু, পুষ্ট শরীর। ক্ষীরের মতন দুধ পড়েছে বালতিতে : ফেণায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে স্তবকগুলি। এমন সময় সুজাতা এসে দাঁড়াল পাশে।

—সুপ্রভাত।

—সুপ্রভাত।

—কেমন ঘুম হল।

—স্বপ্নহীন।

দু'জনে হাসল। বিকাশের নাকে ভেজা মাটির গন্ধ আসছিল। কয়েকটা কুচি কুচি নয়নতাবা ফুল গোলাপী আব সাদায় মাটির উপর জ্বলছে। সেইখানে চোখ রেখে সে বললে—গাড়ী কটায়।

—ঠিক জানি না, স্নান করবে?

—না। চুলের মধ্যে আঙুল বুলোয়। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল বিকাশ। হাওয়াব মত হালকা।

—ভালো লাগছেনা গাছপালার আবহাওয়া। সুজাতা বলল। বিকাশ কোনো উত্তর দিলে না। বাড়ীব কর্তা এলেন।

—প্রথম ট্রেণ কটায়।

—সে'ত বেরিয়ে গেছে। সাড়ে আটটাবও পাবেন না। এখন থেকে চলতে সুরু করলেও ঠিক সময়ে ষ্টেশনে পৌছানো শক্ত। গরুব গাড়ীতে গেলে অবশ্য সময় কিছু বাঁচবে। ববঞ্চ বিকেলেব ট্রেণ ধরুন, বাড়ী গিয়ে ঘুমোবাব আগে কিছু খেয়ে নিতে পারবেন।

বিকাশ তাকাল সুজাতার দিকে। কাল বাত্রে সুজাতাও ঘুমিয়েছে অকাতরে। ঘুমে তার শরীর ভরে গেছল। স্নান সেরে যখন সকালের ম্লানাভ ছায়ায় হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছিল চোখে তার গাছপালার ঝাপট লাগে। সজীবতায় সে উজ্জল হয়ে ওঠে। ইতস্ততঃ তাকায়। বিকাশ দাঁড়িয়ে আছে তার গেঞ্জিতে একটা ফুটো। ফুটো গেঞ্জি গায়ে হাস্যকর বিকাশকে কৌতুকোজ্জল চোখে দেখতে থাকে। তারপর এক সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

মাথার উপর সূর্য গোলাকার ও সাদা হয়ে উঠেছে। শিশিরের শব্দ উঠছে তাদের পায়ের আঘাত লেগে লেগে। শিশিরে সুজাতার পা ভিজে গেছে। নিজের পায়ের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে চলছিল সুজাতা। বিকাশ অনেক পিছনে পড়ে গেছল। খানিক দাঁড়িয়ে তাকে পাশে নিলে—তারা দুজনে

পাশাপাশি চলতে থাকে। সূর্য মাথার উপর স্ফীত হয়ে উঠল। সুজাতার আঁচল বিকাশের শরীরে ঠেকছিল। সে গুণ গুণ করছে—সুজাতা টের পায়।

'Viol the violet and the wine' বিকাশ অশ্রুত গুণ গুণ করছিল। কোথা থেকে এক টুকরো শব্দ উড়ে আসে তার মনে—viol, the violet, সুইনবার্ণ না বোদলেয়ার। কি জানি। ও জানে। পরম নির্ভয়ে বিকাশ চলছিল।

—মাঠ ফুরোবে কখন ?

—এই'ত বেশ। দু'জনে আড়চোখে চাইল।

—মাঠের পরে মাঠ মাঠের শেষে: সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে। সুজাতা উদ্ধৃত করল,—কতক্ষণ আমরা চলছি।

বিকাশ ঘড়ি দেখে বলল, একঘণ্টা তেরো মিনিট। সামান্য কিছু আহার করে তারা বেরিয়ে পড়ছিল। খানিকক্ষণ তারা কথা না কয়ে চলল। সুজাতার আসা এখানে নিষ্ফল হয়েছে। কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল এখানে। জীবিতকালে তার স্বামী এই বাড়ীর মালিককে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন, কারণ এক সময় তারা সহপাঠী ছিলেন। সুজাতার এতদিন সেই টাকাটা তোলবার প্রয়োজন হয় নি। টাকা সম্পর্কে আইনতঃ কোনো লেখাপড়া ছিল না—তারপর অনেকদিন বাদে ভদ্রলোক যখন জীবন-যুদ্ধে স্বীকৃত হলেন, মানে, ফেঁপে উঠলেন লোহার ব্যবসায়ে, পরিবার ও পরিজনে ভরাট ও বিস্তৃত হলেন—সুজাতা একটি চিঠিতে প্রায় ভুলে যাবার মত কথাটা জানিয়েছিল এবং কলকাতায় এসে দেখা করলে যে টাকাটা পাওয়া যাবে এমন আশ্বাসও পেয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে তিনি একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। বাড়ীতে যিনি আছেন তিনি কনিষ্ঠ; যদিও সে কথাটা উত্থাপন করেছিল তবু জোর দিতে পারে নি অনিশ্চয়তার উপর।

—রোদ লাগছে। বিকাশ বলল এক সময়। সুজাতার গৌর মুখে রক্তের আভা ফুটে উঠেছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছলে—চল একটু বসি। এখনও সময় অনেক।

একটি পত্রবহুল গাছের ছায়ায় এসে বসল তারা। ডাল পালায় প্রসারিত গাছটি। প্রবীন গুঁড়ি।

—জল খাবে। বিকাশের দিকে চেয়ে বলল সুজাতা,—হাঁটাটা রীতিমত ব্যায়াম। আমার'ত তেষ্টা পাচ্ছে। বিকাশ উত্তর দিলে না। সে শান্তিবোধ করছিল। নিস্তরঙ্গ মন। স্খলিত পত্ররাশি হাওয়ায় মর্মরিত। সুজাতা ফ্লাস্ক থেকে জল খায়। আড়চোখে বিকাশের দিকে তাকায়। একমুঠো জল মুখে ছিটিয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে।

—হ'ল কি কবির। কল্পনায় তা দিচ্ছ।

বিকাশ হাসল, উত্তর দিলে না। হঠাৎ সুজাতার পায়ের দিকে তার নজর পড়ল। পায়ের ঈষৎ আলতাপাটি মাঠের ধূলায় লাল। বিকাশ চোখ তুলল না। তার বুক দুলছিল। চোখ কাঁপছিল। হঠাৎ সে একখানা পা হাতের মধ্যে তুলে নিলে। ধুলোয় রাঙা, রক্তে নরম। অনেকক্ষণ ধরে সেই উষ্ণতা অনুভব করে। রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দেয়। প্রবল আনন্দ আর ভয়ে তার চোখে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সুজাতার চোখে হাসির ঝিকঝিকে আলো। সে বাধা দিলে না। শরীরে তার পরিশ্রমের মাদকতা। হাত দিয়ে বিকাশের রুক্ষ মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নেয়। দুজনে কেউ-ই গাছটার নাম জানে না।

—কি হয়েছে। মুখের উপর চোখ রেখে বলল সুজাতা। ঘনপল্লবে ও শাখা প্রশাখায় জটিল হ'ল গাছটা অনেকদূরে আকাশে বিছিয়ে আছে। পাতার ফাঁক দিয়ে পরা গোল গোল রৌদ্রগুলি হাওয়াতে দুলছে।

—আজকের দিনটা খুব চমৎকার—না? দুলন্ত রৌদ্রগুলির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বাদে বললে সুজাতা।

—সত্যি, সকাল থেকে উঠেই এত ভাল লাগছে।

—কিন্তু কলকাতা'ত পৌঁছতে হবেই।

—সেই কথাই ভাবছিলাম।

—কি!

—সত্যি বলব। তোমার কাছ থেকে সরতে ভাল লাগে না।

—সরবে কেন ?

—এক সময়'ত তুমি থাকবে না।

—বিয়ে করলে কেন ?

—জানি না। কিন্তু ঐ অন্ধকার আর আকর্ষণ আমাকে মেরে ফেলছে।

—গভীরতা তুমি সইতে পারো না। গভীরতায় ও তোমাকে টানে।

—তুমি ঠিক শব্দ ব্যবহার করতে পারো। ঐ গভীরতায় ওর অস্তিত্ব নাই।

—তোমার ধর্ম সুখ। স্রোতের ওপর ছটা। মনের রঙে রঙীণ তুমি।

—আমার সুখে কাঁটা কেন ? যার ইচ্ছা আছে আকার নাই তার নাম মন। এল হয়ত মনের মানুষ—যেন চিনি চিনি—কিন্তু, যন্ত্রণা কেন ভালবাসায় ? .

—একদিন তুমি ওকে জানবে। একদিন ওর ভালবাসার নিশ্চিহ্ন হবে. শান্ত হবে।

—সে'দিন আমি মরে যাবো।

—প্রকৃতি পালটালে প্রবৃত্তি পালটায়।

—কেন আমাকে কেউ বুঝবে না, কেন আমার শান্তি নাই।

—শান্তি তুমি চাও না, তুমি সুখ চাও। সুখ স্রোত · আরো গভীরে শান্তি ঐ গভীরে অনুভা বসে আছে।

—তোমার প্রবৃত্তি কই। তুমি এত শান্ত কেন এত পরিষ্কার ভাবতে পারো তুমি।

—তোমার মন আজ ভালো নাই। সুজাতা তার চুলে বিলি কাটে।

—আচ্ছা, তোমার স্বামীকে মনে পড়ে।

—ঐ কথাই ভাবছিলে নাকি এতক্ষণ।

—এমনি মনে হল। বিয়ের আগে তোমার কোনো ধারণা ছিল না।

—অদ্ভুত। তোমার কথায় আবার মনে পড়ল। তোমার মনে হয় না। আমাদের ভাবনাটা এক আর ভাবনার অনুভূতিটা আর এক।

—ঠিক বলেছ, আমারো এমনি মনে হয়।

—মনে হত কি রকম। কি রকম যেন! এক জীবন থেকে আর এক জীবন! অথচ পরিবর্তনটা কি গড়পড়তা—যেন এইটাই নিয়ম।

—তুমি মেনে নিলে জীবনকে ?

—ঠিক মানা'ত নয়। জীবনটাই পালটে গেল তখন। পটভূমিকা নতুন। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছিলাম। আশা করিনি কারণ আশ্বাস ছিল। তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে বলত ?

—মনে পড়ে না তোমার ?

—খুঁটিনাটি আমার মনে থাকে না। চাকরীর জন্য তখন খুব যাতায়াত করতে।

—একটা কবিতা বল।

সুজাতা নীচু হয়ে তাকে আদর করলে একটু। করুণায় আঙুলগুলি বিকাশের চুলে আর্দ্র হয়ে আসে। নীচু গলায় সুজাতা আবৃত্তি করছিল :

সেইখানে সেই বট ছায়ায়
সেখানে গেলে শান্তি পাই—

নিঃশব্দে বিকাশ শোনে। স্বরের ছন্দগতির সঙ্গে সুজাতার চোখের পালকপরা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল।

—তোমার গলা আরো মিষ্টি হয়েছে। আগে তোমার গলায় সুর ছিল এখন শ্রুতিতে পৌঁছে দেয়।

—সে'টা ভাল না খারাপ।

—তুমি আর লেখ না!

—আলগা দু-একটা প্রসূনের জন্য অনুবাদ করি মাঝে মাঝে।

—কোথায় যেন তুমি নিবিষ্ট হয়ে গেছ। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সেইখান থেকে তুমি কথা বলছ। ঈর্ষা হয় তোমাকে।

—তোমার আবৃত্তি অনেকদিন শুনিনি—একটা বল।

—একটা কবিতা মনে আসছে।

—তোমার ?

—না। পাউণ্ডের। A Girl.

—বল।

—বলি :

A tree has entered my hands
The sap has ascended my arms
The tree has grown in my breast.
Downwards :
The branches grow out of me like arms.
Tree you are,
Moss you are,
You are violets with winds above them.
A child so high you are
And all this is folly to the world

—এ'যেন তোমারই কথা শোনাল।

—এই কথাই শোনাতে চাইছিলাম।

—কাকে ?

—তোমাকে।

—কেন, folly কেন ?

—জানি না। বিকাশ মুখ গুঁজে দিলে ওর কোলে। আবেগে ও কাঁপে। ঘাস : ঘাস ঘাসের শ্রাবন। দৃষ্টি সীমা আচ্ছন্ন করে ঢেউ উঠেছে সবুজের। সেই ঘাসে ঘাসে সবুজ প্রান্তর উঁচু নীচু ঢেউয়ের মতন অনেক দূরে মিশে গেছে। ডটো খাড়া গাছ দিগন্তকে ছুঁয়ে। বিস্তীর্ণ রৌদ্রময় প্রান্তরটি সবুজের আগুনে জ্বলছে। বিকাশের চোখ জ্বালা করে জল আসে। সুজাতার মায়া হয়! তার দু'চোখে স্নেহ ঝরে। চশমাটা মুখে নাই বিকাশের। তার অসহায় ঘাড়ের ফালিটি বড়মা মায়ার মধ্য দিয়ে দেখতে থাকে।

—তোমার ধর্ম সুখের। তার ধর্ম শান্তির। অসম্ভবের কামনা থেকেই দুঃখ।

—সমন্বয় না' হলে সৃষ্টি কই। অসম্ভবই যদি না ঘটবে কেন ভালবাসা!

একটু নীচু হয়ে বিকাশের ঠোঁটে চুমু খেলে সুজাতা। শিশিরের মত ঠাণ্ডা, আর্দ্র ঠোঁট। মিঠেল গন্ধ মুখে।

—এক সময় তুমি এত সুখী ছিলে।

—তখন কেউ ছিল না।

—তখন অনুভা ছিল না।

বিকাশ একটা ঘাস ছিঁড়ে কামড়ায়। এক ঝাঁক বক সাদা রেখা এঁকে নীল দিগন্তে উড়ে যায়।

সুজাতা সুটকেসটা গুছিয়ে নেয়। বিকাশ উঠে দাঁড়াল। মাথা তার ঝিমঝিম করে। প্রবল নিরাসক্তিতে সে সামনে তাকায়। সুজাতা তার দিকে চেয়ে হাসে। চিকচিক করে সুজাতার সুনীল চোখ। চলতে ভালো লাগছিল না বিকাশের। এখনো পনেরো মিনিট চলতে হবে। তারপর স্টেশন, তারপর কলকাতা, সেখানে সে আবার স্বাধীন, মুক্ত; ঐ মেয়েটিকে পাশে নিয়ে চলতে হবে না ভেবে আনন্দ পেলে।

সুজাতার মনে কোনো ভাবনা ছিল না। সামনে দিকে চেয়ে অবারিত আনন্দে সে চলছিল। শরীর থেকে জড়তার স্তূপ গুঁড়িয়ে গেছে। সূর্যালোকে তার দীর্ঘ, প্রসারিত শরীর ঝিণঝিণ করে। হঠাৎ একটা হোঁচট খেলে সুজাতা। বিকাশ ধরে ফেললে।

—আস্তে চল, অনেক সময় আছে।

—যদি পা' ভেঙ্গে যেতো কি করতে? বিকাশের হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সে চলতে থাকে।

—তুমি'ত পা দিয়ে চল না, মনের পাখায় উড়ে চল।

পথের এক পাশে স্তূপের উপর, এক ঝাঁক ফুল বিকাশের নজরে পড়ে। লালচে নীল ফুলের একটা খোঁপা। বিকাশের তুলতে ইচ্ছা যায়। হাতটা সুজাতার হাতের মধ্যে থাকায় পারে না। মন খারাপ হয়ে যায়। 'মমতাজীবি'—মমতার মধ্যে মেরে ফেলে। সব মেয়েই সমান। গিলে ফেলে। স্বভাবের স্রোত নাই।

প্রসূন কেমন টেনে নেয় নরম, মাংসল হাত দিয়ে বুকের মধ্যে। বিকাশের ঠাণ্ডা, শীতল, নিস্পৃহ হাতটি ছেড়ে দেয় সুজাতা। আড়চোখে বিকাশকে দেখে। বিকাশের নির্বিকার মুখটা মনে পড়ে সুজাতার হাসি আসে। মিঠেল গন্ধ ওর মুখে। কি করছে প্রসূন এখন। প্রসূনের কথা ভাবতে ভাবতে সুজাতা পথ চলছিল।

গোধূলি নামলে তারা আসে। চাঁদের আলোয় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কুমারী মেয়েরা তাদের ডাক শুনতে পায়। তাদের ডালায় নানান্ রঙা ফল :

**Mellows and raspberries,**
**Bloom-down checked peaches.**
**Swart headed mullberries,**
**Wild free-born cranberries,**
**Crab apples, dew berries,**
**Pine apples, black berries,**
**Apricots, straw berries ;**

সুজাতা পড়ে। প্রসূন শোনে। নীল আলো বইটায়। ছায়ায় ভরা মুখ। কেবল প্রসূনের সুন্দর সাজানো দাঁত আর সুজাতার সাদা কাপড়। শুনতে শুনতে দোলে প্রসূন :

লুরা শুনে কানে হাত চাপা দেয়। লিজি লজ্জায় রাঙা হয়। তারা পাহাড়ের ঢালু জমিতে ফল নিয়ে হাঁকাহাঁকি করে। লুরা লুব্ধ হয়। লিজি বোঝায় .

**Their offer should not charm us**
**Their evil gift would harm us.**

লুরা ঘাড় তুলে তাকায়। যেন ঘাসের বিছানা ছেড়ে একটা হংসী। যেন নদীতে জাগা একটি পদ্ম। যেন চাঁদের আলোয় একটা অশোক শাখা। একদিন লুরা লুকিয়ে গেল তাদের কাছে। মাথা থেকে সোনা দিয়ে, চোখের জলের মুক্ত দিয়ে কিনলে সেই ফল। খেলে :

She sucked and sucked and sucked the more
Fruits which that unknown orchard bore.
She sucked until her lips were sore

প্রসূন ছুলতে ছুলতে একসঙ্গে গলা মিশিয়ে পড়ে। সুরে দোলে দুজনে :

তারপর তারা ঘুমায়। একটি ডানায় জড়ানো দুটি কপোত। একটি স্রোতের দুটি ফুল। সুজাতার সামনাসামনি জানালায় চাঁদ ওঠে। সুজাতার মুখে চাঁদের মুখ। চাঁদের মুখে সুজাতার মুখ। প্রসূন ঘুমায়। সুজাতা ঘুমায়। লুরা আর লিজি ঘুমায়। দুটি সোনায় ভরা মাথা পাশাপাশি ঘুমায় :

Cheek to cheek and breast to breast
Locked together in one nest.

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কাজে ডুবে গেল অনুপম। কাজের চাপে মাছের মত সে সাঁতরে বেড়ায়। ভোর ছটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। অবশ্য নাইট সিফট-ই তার ভালো লাগে। যুদ্ধ যত ভেতরে ঢুকছে তত কাজে চাপ বাড়ছে। কপালে ঘাম ভিজে ওঠে। সর্বাঙ্গ নুনে চিটচিট করে। এ্যানালেটিক্যাল রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিযে সিগারেট ধরায়। দু-পা টেবিলের উপর তুলে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ে।

—রিপোর্ট ঠিক মিলল অনুপম বাবু। দত্ত বাবু চশমাটা নাকে দিয়ে বললে।

—হ্যাঁ মিলিয়ে ছেড়েছি।

—বো সাহেব আবার ঘুরতে আসবে নাকি ?

—চুলোয় যাক হারামজাদা! এ' শালা যুদ্ধ আর থামবে না। হ্যাঁ মশায়, কক্সবাজার নাকি উড়িয়ে দিয়েছে।

—ধূলো : ধূলো। জানেন না'ত ভেতরের খবর—সুভাষ বোস! রেডিয়োয় বলেছে। দেবব্রত নামে একটি সব বি, এস, সি বলে উঠল।

—দেখছো না ব্যাপারটা,—সর্বেশ্বরবাবুই ডিপার্টমেন্টের বড় বাবু। চোদ্দ বছর আছেন এখানে। নধর মানুষটি। পানের রসে ঠোঁট সব সময়ে পুরু। চামড়ায় বয়স ধরা যায় না।

—কর্তাদের মুখের চেহারাখানা। হাঁক ডাক সব ঠাণ্ডা! সেদিন ক্রো সাহেবের ঘরে মিটিং বসল। উড সাহেব মাগকে পাচার করে দিলে কোথায়।

—অসাধ্য কিছু নাই। কাঁচা আলু আর পুঁটলি বাঁধা চিঁড়ে একবার জলে ভিজিয়ে নিয়ে রাস্তার মাঝে বসে খায় আর লড়াই করে। কি বীর জাত ভাবতে পারো। না হলে হারিকিরি করে। পেটের নাড়ি ভুঁড়ি নিজের

হাতে তলোয়ার করে খুঁচিয়ে বার করে। কাগজে লিখেছে মশাই। উল্টো টেবিল থেকে বললে নেপাল বাবু।

—যাই বল এ রাজত্ব যাওয়াই ভালো। সর্বেশ্বর বাবুর আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত হয়।—আজ দশ বছর কাজ করছি একটা প্রমোশন দিলে না। চশমখোর, চামার। এ'জাত যাবে না'ত কি!

—যেতে হবে না আমেরিকা শিঙ গলিয়েছে। বাবা লাল বেনে। গামছা পরিয়ে দ্বীপে পাঠাবে। যেখানকার ছেলে সেখানে।

—যাই বল আমাদের ভেতর আরামে আছে অনুপম বাবু। চায়ের গেলাসটা মুখের কাছে ধরে অনুকূল বাবু বলেন। এই সময়টায় তাদের চা খাবার বাঁধা নিয়ম। দু'জন ছোকরা বাইরে আগলায়। বো সহেব পঞ্চাশ গজ দূরে থাকবার সময় যেন খবর পায়। লোকটা জাঁহাবাজ। সমস্ত ফ্যাক্টরীটা সারা দিনরাত চষে বেড়ায়। রাত্রিবেলায় বেরালের মত চুপিসারে চলাফেরা করে। একদিন একটা ইঁট খেয়েছিল। সেই থেকে রাত্রে দুজন সঙ্গী নিয়ে বেরোয়।

—কেন, আমার অপরাধটা কি বলুন।

—আরে মশাই। বেচিলর মানুষ। অতগুলো টাকা থোক কামাচ্ছেন—আছেন ফুর্তিতে। তায় আবার মনাদা'র সঙ্গে। ও মাইরি, কি কুক্ষণেই যে ছেলের বাপ হয়েলুছম। ডিপার্টমেণ্টটা হাসিতে ভরে উঠল।

'মোনাদা' লোকটা ফ্যাক্টরী শুদ্ধ মোনাদা। সিনিয়ার ফোরম্যান। বহুদিনকার সার্ভিস। কথায় কথায় সাহেবদের বাপ তোলে। মদ খেয়ে কাজে আসে। চওড়া কব্জি। লাল চুল। বগের দুপাশে ফোলা ফোলা শির। যাকে তাকে মারে। তার জন্য দুবার ধর্মঘট ভেঙে গেছে।

—আরে, খবর জানো আজ'ত বো সাহেবের সঙ্গে বেধেছিল মোনাদার। বেণ্টলি এসে আবাব ঠাণ্ডা করে। একটা কুলি থাপ্পড় খেয়ে পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে।

ফ্যাক্টরী থেকে যখন সে বাইরে আসে গায়ে মাঠের বাতাস লাগে। সবুজ, খোলা মাঠ। তার ওপারে মদ আর মেয়েমানুষের পল্লী। অনুপম থাকে মোনাদার সঙ্গে।

তাদের বাসাটা অনেকখানি পেরিয়ে। কোয়ার্টারে থাকতে সে রাজী হয়নি। প্রথম দিনই এই লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল আচমকা।

—নয়া আদমী। কোন সেকশন?

অনুপম সেকশন বলল।

—আমাকে চেন। আশপাশের লোকগুলো কৌতুকে হেসে ওঠে।

—কি পাশ?

—এম, এস, সি।

—আহা, দেখনহাসি। খিস্তি জানো। আমাকে চিনে রাখো, আমি মোনাদা। মাইনে পেলে এক পাঁট খাওয়াতে হবে। না হলে চাকরী খতম। কোয়ার্টার দিয়েছে?

—দেবে বলেছে।

—ছাই দেবে। শালার কোয়ার্টাবে ভদ্রলোক বাস করতে পারে। মেমকে পুতুল কিনে দিতে পারবে—বিয়ে করেছ?

—না। অনুপম কৌতুক পায়। চওড়া কাঁধ। ময়লা হাফ প্যাণ্ট আর তেলচটা টুপী মাথায়। দরাজ গলা। টেবিল বাজায় আর চোখ টিপতে টিপতে কথা বলে।

—আমার এখানে চলে এসো, বুঝলে, আমার বৌ সৈরিন্ধ্রী। বেশ মোটা সোটা।

অনুপম তার বাড়ীতেই উঠল। অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এক অসামান্য ভালো লাগায় সে স্বস্তি পেল। ছ'মাসে সে স্বচ্ছন্দে ভুলে গেল তার গত জীবনকে। প্রচুর মদ খেয়ে ফোরম্যান যখন গলা ছেড়ে গান গায় মাথা নাড়তে নাড়তে অনুপম টেবিল বাজায়। কপালে লোনা ঘামের চিটে। নিকোটিনে বিস্বাদ ঠোঁট। মদটা ভালো লাগে। মদ আগেও সে খেত। কিন্তু এখন খেতে ভালো লাগে বলে খায়। আগের মত চেখে চেখে, ভাবতে ভাবতে, কোনো অনতিক্রম্য সময়কে কাটতে কাটতে নয়। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে নোঙরা রুমাল দিয়ে ঠোঁটটা মুছে শিষ দেয়।

ফ্যাক্টরী থেকে দু'জনে এক সঙ্গে বেরুয়। পঙ্গপালের মত এক সঙ্গে কালি

আর ভূষা মাখা শরীরগুলো চওড়া ফটক দিয়ে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইরে। অনুপমের দেখতে ভালো লাগে : ক্যাপা গোঙানীর মত। সকলের ধাক্কায় ধাক্কায় সেও এসে পড়ে বাইরে। কারুর মুখ নাই, চোখ নাই, চোয়াল নাই। কেবল একটা আওয়াজ। কাউকে পৃথক করে চিনবার দরকার হয়না। ঐ প্রাগৈতিহাসিক আওয়াজের উল্লাসে দু'জনে বাইরে ভেসে আসে।

অনুপমের এই কর্মক্লান্ত বিকেলটিকে অনুভব করতে ভালো লাগে। লম্বা লম্বা সবুজ ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ময়লা ছায়া। হাওয়া লুটোপুটি করছে। ছোট ছোট দল বেঁধে ঐ আকৃতিহীন শরীরগুলো আওয়াজ ওড়াতে ওড়াতে চলেছে মাঠ ভেঙে—মদের ভাঁটির দিকে। কিংবা, ভোরেরবেলা ঘুম ভাঙা পা দিয়ে ঘাস গুলোকে স্পর্শ করতে করতে—একটু একটু করে সূর্য উঠছে মাঠের উপর। অনুপম গান গায়। দিন রাত্রির উপর কালের ঘনতায় হাওয়ার মতন বিছিয়ে থাকে তার প্রমুক্ত আত্মা। সবচাইতে আরাম লাগে বিকেলে যখন গায়ে সাবান মেখে উঠে একটা সিগারেট ধরায়। হাত পা বিছিয়ে গায়ে বালতির পর বালতি ইঁদারার ঠাণ্ডা জল ঢালে। রাত্রির হিমে ঠাণ্ডা জল ঘুমের মত গা জুড়িয়ে দেয়। পিছন থেকে ফোরম্যানের বৌ তার মাথায় জল ঢেলে দেয়। কোনোদিন ঘাড়ে আর পিঠে সাবান মাখিয়ে দেবার আবদার ধরে অনুপম। দু'জনে জলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হাসে।

—বয়স কত? প্রথম যে দিন ফোরম্যানের সঙ্গে আসে দুটি চোখে কৌতুক নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

—ছাব্বিশ।

—মোটে। অত শক্ত চোয়াল কেন? গা-জ্বালা করে চোখে চশমা দেখলে। দিদি বলবে। আমার আটাশ।

চাবির গোছায় আওয়াজ দিলে যেমন হয় তেমনি গলার আওয়াজ মেয়েটির। এ' আওয়াজ অরুণার নাই। তার আওয়াজ হাড়ের মত সাদা। হঠাৎ শুনলে মানায় না। অনুভার কোন আওয়াজ নাই প্রাণের অতিরিক্ত আবেগে সে স্তব্ধ। সুজাতা—বিকাশ যাকে বড়মা বলে শুনেছে সে তার স্বর। গাছের

ছায়ায় বসে একটি মধুর অবসাদকে কবিতা করে শোনাতে পারে ঐ সুন্দর সুন্দর। ওদের সকলকে পেরিয়ে এসেছে অনুপম। হঠাৎ স্বর শুনে চমকে গিয়ে অনুপম তাকাল। তার চোখে কৌতূহল চিকচিক করে।

—বৌঠান বলব।

—বৌঠান! বাঙাল বুঝি। চোখ নাচিয়ে বলে,—ওগো এ' ছেলেকে জায়গা দিওনা বাড়ীতে। মেঘে মেঘে বেলা বেড়েছে! দিদি পছন্দ নয় বৌঠান! আমারা ডালে লঙ্কা দিই না।

—দরকার নাই তুমি কথা মিশিয়ে দিও।

—আবার কথায় প্যাঁচ আছে। না বাপু, দরকার নাই বিদেয় করো। গোমড়ামুখোগুলো আমার দু'চক্ষের বিষ।

স্থুল শরীর। কালো চোখ। তরুণ মাটির মত গায়ের রঙ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলেও চোখ জ্বালা করে না।

—না, না, বৌঠান বলিস। বেশ জমকালো। মাঝে মাঝে বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে যেতে পারবি। আমাকে দাদা বলিস। সাহেবকে বলে মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

—বৌটা বেশ জব্বর বাগিয়েছিরে। কাশীর চিজ। চোখ মুচকে ফোরম্যান হেসে ওঠে।

—আজ হয়েছিল কি বো সাহেবের সঙ্গে?

মুখ খারাপ করে উঠল ফোরম্যান—আমাকে শাসাতে আসে। মাগকে ঘুস দিয়ে নয় আজ ওপরওলা হয়েছে। বেটার খালি ভয় কখন ধর্মঘট বাধে। আরে, ধর্মঘট যদি বাধে তোর সাধ্যি কি থামাস। সেবারে গুলি চলে গেলো, ষ্ট্রাইক অবশ্য রাখতে পারে নি। কিন্তু দিন পালটেছে আজকে। সকলেই আজকে হুঁসিয়ার। সে সময় আর নাই যে লাথি মারলে মুখ তুলবে না।

—ইউনিয়ন'ত বেশ জাঁকাল এবার। তার মত কি?

—ইউনিয়ন না হাতী। শুঁচকে কাল বলিস নি।

—কেন, তুমি বিশ্বাস করো না এ'সব চেষ্টায়।

—কাজে না লাগলে বিশ্বাস কি! এ'কি তারকেশ্বরের মানত। তুইও'ত

দলে ছিলি—ছাড়লি কেন? শ্রমিক বিপ্লবের শিরদাঁড়াটা কোথায় তাই এরা বোঝে নি। কুলী মজুর নিয়ে চায় পাওয়ার পলিটিক্স করতে। যুদ্ধ শেষ হবে, ফ্যাসিজিম কাবু হবে, রাশিয়া ছড়াবে, কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে দেশকে সইয়ে সইয়ে বিপ্লব আমদানী করতে চায়। সব চাইতে ভাল সময়ে সব চাইতে খারাপ কাজ এরা করছে। একটা আঘাত যদি ঠিক জায়গায় মারতে পারে শ্রমিক শক্তি জিতে যাবে দু'দিক দিয়ে।

—কোন দিক থেকে বলছ?

—যুদ্ধের পরই দেশের পুঁজিবাদ দগদগে মুখ দেখাবে। দেশের মধ্যবিত্ত শক্তি এখন মিইয়ে আছে—সুবিধা পেলেই ন্যাশানালিজিমের শিকড় গেড়ে বসবে ফিউড্যাল চেতনায়। সময়টাই বৈপ্লবিক। ঠিক জায়গায় ঠিক ঘা মারতে পারলেই ফতে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির লাগাম কষছে এরা দেশের ভেতর। লড়াই করছি আমরা, অথচ আমাদের কোনো জোর নাই। শ্রমিক শক্তির এইটাই সব চাইতে অপব্যবহার।

—তুমি দলের বাইরে কেন? ভুল হোক, ঠিক হোক তোমার প্লানিংবিপ্লবে সংগঠন করবার চেষ্টা করছ না কেন? তুমিও'ত আসলে বুর্জোয়া—প্রতিক্রিয়াপন্থী। কথায় কাজে মিল নাই।

—বলতে পারিস একদিক দিয়ে। কিন্তু ও'দের কথার উপর কিছু বললেই ওরা বলবে কাউণ্টর রিভোল্যুশনিষ্ট, মার্কসবাদ জানে না। আর ঐ একপাল এঁচড়ে পাকা, সবজান্তা বক্কেশ্বর মার্কা ছোকরা আর উচ্চিংড়ের মত মেয়ে যাদের ভালো করে মা হবার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই ওদের নিয়ে রাশিয়ার রোমান্স হয়—বিপ্লব হয় না।

—মেয়ে মানুষকে দু'চক্ষে দেখতে পারো না—অথচ ওদের না'হলে তোমার একদণ্ডও চলে না।

—যা' বলেছিস। পিঠ চাপড়ে হেসে উঠল কোরম্যান,—বিধাতার আজব চীজ। চল, পান্নার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

অনুপমের তরতর করে দিন কেটে যায়। সিফট পালটে নিলে। সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমায়। দুপুরবেলা কোরম্যানের বৌয়ের সঙ্গে লুডো খেলে, রান্না ঘরে পা ছড়িয়ে বসে ইয়ারকি দেয়। কখনো তার মাত্রা ঠিক থাকে না। খোঁপায় ফুল গুঁজে দেয়।

—বড়ো বিক্রম বেড়েছে তোমার! অনুপমকে শাসায়। অনুপম হাসে। চকচক করে তার চোখ।

—ভয়ানক তোমার বুকের পাটা হয়েছে, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি!

—কি করবে আমার।

—জানো, সারা কারখানা ওকে ভয় করে।

—আমি তোমার কালো চোখ ছাড়া ঈশ্বরকেও ভয় করি না।

ফোরম্যানের বৌ ভুরু বেঁকায়।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, ঘর থেকে ক্যামেরা নিয়ে এসে অনুপম বলে,—আর একবার নয়নবান হান'ত বৌঠান।

—এই করতেই বুঝি দিনের বেলা থাকা হয়। লজ্জা করেনা মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘুরঘুর করতে!

নানা ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে তাকে ফোটো তোলে অনুপম। কখনো আলসে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে, কখনো জানালার পাশে একলা স্তিমিত চোখে তাকিয়ে। সবচাইতে ভালো ছবি অনুপম একখানা তুলছে—চোখের ভুরু দুটি গুটিয়ে শাসন করছে যেন, কিন্তু ঠোঁটের রেখায় হালকা খুশীর ভাঁজ। ছবিটার নাম দিয়েছে অনুপম "দূতী আঁখি"

অনুপম রান্না ঘরে ঢুকে বল্‌ল,—বৌঠান, আজকে তোমায় একটা প্রাইজ দেবো।

—চাই না ও' ছাই। একটা জড়ির চটি এনে দিতে সাধলুম বাবুর তা' হয় না, তোমার ফটোয় যদি একদিন আগুণ না ধরাই'ত!

—চল্লাম। পান্নার গলায় মানাবে এটা। লম্বা হাঁসের মতন গলায় মুক্তোর দানা।

—দেখি কৈ। সবেগে ছুটে এল ফোরম্যানের বৌ। খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির পর বলে,—চাইনা তোমার প্রাইজ। পান্নার বাড়ী মর গেলোগে দু'জনে। বেরোও, দূর হও।

—আচ্ছা, ব'লো তোমার নাম—তাহলে দেবো গলায় পরিয়ে।

—ওমা, নাম নিয়ে কি করবে—জপ করবে ?

—নামাবলী গায়ে দিয়ে বৈরাগী হব।

—তাই হও। বেরোও রান্নাঘর থেকে। আইবুড়ো ছেলের আবদার দেখো!।

অনুপম আরো সরে আসে। হাতটা চেপে ধরে,—দেখো, আবদার দেখো। বলো নাম ? কি নাম ? শ্যামলী, মাতঙ্গিনী, জ্যোৎস্নারাণী, হাসিরাশি, পটেশ্বরী।

হেসে উঠল কোরম্যানের বৌ,—মরি মরি কি নামের বাহার। বৌ হ'লে রোজ একটা একটা করে ডেকো।

—তবে।

—হাত ছাড়ো। চোখ তুলে আবার নামায়,—গুণ্ডার মত হাত।

—বল নাম। হাত ছেড়ে পথ আগলে দাঁড়ালো।

—আগে দাও !

—আগে বল।

—না।

—হ্যাঁ।

—কি করবে।

—জপ করব, মুখস্থ করব, ডাকব।

—লজ্জাও করে না।

—লজ্জা কোরো না।

পালাবার চেষ্টা করে। অনুপমের শরীরে লাগে। চোখের পাতা দ্রুত ওঠে পড়ে। নিঃশ্বাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শ্যামল মুখ তামাটে দেখায়।

—বল। অনুপমের গলার স্বর দৃঢ়, ঘন।

—সর্বানী। বাব্বা হয়েছে।

ইতিমধ্যে অনুভার একটা চিঠি পেয়ে কলকাতা ঘুরে এল অনুপম। অনেকদিন কলকাতায় আসেনি—কলকাতা নতুন লাগল। হাওড়ার পোলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার

হু'তীর দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে বহুদিনের এক দুস্তর ব্যবধান অনুভব করলে অনুপম। নিজেকে সে পেরিয়ে যায়নি। গুটিপোকার জাল কেটে প্রজাপতির মত ফুরফুর করে বেড়িয়েছে। মানুষের ফুটন্ত অজস্রতা, হাঁ-মুখো জাহাজের চোঙা ধোঁয়া উগরাচ্ছে, রূপোলী বেলুনগুলি আকাশের নীলে ভাসমান, এক, দুই, তিন! একটা সমকোনী ত্রিভুজ! রোদে অনুপমের মাথা চিনচিন করে উঠল। অথচ সে আরামে ছিল। একটি মধুর অবসাদকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে দিয়েছে তার শরীরে। তার সর্বাঙ্গে সেই মেয়েটির গায়ের নরম গন্ধ লেপে আছে—কলকাতাকে তার ভাল লাগলনা। একটি বৃহৎ জনতা কোনো রাষ্ট্রনেতাকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যাচ্ছিল। গলায় তার দিয়ে গাঁথা ফুলের মালা। গোলগাল চেহারা; প্রফেসর হলে মানাত। মেয়েদের সংখ্যাই বেশী! নানা ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল হ্যারিসন রোডে পড়লে অনুপম বাস ধরলে।

অনুভাকে দেখে সে খুসী হল না। এক মুহূর্তে তার মন পাক খেয়ে উঠল। সেই পূর্বতন সন্দেহ আর অবিশ্বাস আর সবার উপর সেই সুচতুর তীক্ষ্ণতা। চারপাশে এই জীবনের সম্মিলিত গতিবেগ মনে মনে সে রূপ দিতে চেষ্টা করলে—পাঁকের মত। নাদুসনুদুস সেই দেশপ্রেমিকের মুখটা সমস্ত কিছু ঘুলিয়ে দেয়! কিন্তু এরপর এত আশ্চর্য লাগল অনুভার চোখ। এত উজ্জ্বল চোখ দেখবার সে আশা করে নি। সজীব পত্রলতার মত চারু ও চিকন দেহ ওর; রহস্য জমেছে চোখে, চিবুকের চাপমান মাংসে, একটি আশ্চর্য তৃপ্তির স্বাদ রুচক চূড়ায়, কাঁধের রেখা সুডৌল।

—অনেকদিন আসনি দাদা! কলকাতা আর মনে পড়ে না। কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ারে হাত রেখে অনুভা বললে।

—তুইও'ত লিখিসনি অনেকদিন, সময় পাস না?

—সত্যি, সময়গুলো এমন কেটে যায়। আদুরে বেড়ালের মতন শরীর ঘনীভূত করল অনুভা।

—কি করিস সমস্ত সময়?

—বই পড়ি আর ঘুমোই।

—একটু পরিশ্রম করা ভাল এখন। ডাক্তার দেখছে ?

—ডাক্তার'ত বলছে চেঞ্জে যেতে। ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে তোমার ওখানে যাই। কেমন জায়গা ?

—তোর ভাল লাগবে না ; ফাঁকা মাঠ। সারাদিন লাল ধুলো ঢেউয়ের মত ওড়ে। দেশটাই কারখানায় ভর্তি। বিকাশের সঙ্গে'ত যেতে পারিস ; শিলঙে যা না ? ঝরণার গান শুনবি। ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকবার অনেক বিষয় পাবি।

—ছবি আর আঁকি না।

—তোর ছবি'ত বিকাশ খুব ভালবাসত। কি খবর তার ?

—ভাল আছেন। নতুন একটা পত্রিকা খুলছেন সুজাতা দেবীর সঙ্গে। আমাকে ছবি দিতে বলছিল।

—তাই নাকি। ভাল ত। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে আয়। আলো লাগুক নাম ছড়াক।

অনুপমের চোখ মিলল অনুভার চোখে। দুজনে হাসল। চা খেতে খেতে অনুভা বললে,—দাদা, তোমার গায়ে মাংস লেগেছে।

—সুখে আছি ভাবনা নাই।

—ভাব কেন ? ভেবে কি হয়।

—সত্যি, এই ভাবনা কেউ পার হতে পারে না। বাবাও পারে নি।

—আমরা বাবাকে কেউই বুঝতে পারিনি।

—কিসে বুঝলি, তুই ত খুব কাছে থাকতিস।

—চাপা থাকতুম।

—আলো পেয়েছিস।

অনুভা সুন্দর হাসল। কথার মোড় পালটে দিলে :

—বাড়ীটা বিক্রী করে দাও।

—তার চেয়ে তোর নামে লিখে দি।

—তোমার নিজের কিছু রাখবে না।

—না রাখলেই বা।

অনুভা চুপ করল। অনুপমের অভিমান সে জানে। তার ভেতরে ছায়া ঘনায়। ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান : একটি পরিপূর্ণ দীপ্ত আবেগের খণ্ড খণ্ড বিভক্তি : পাপড়ির পর পাপড়ি : মধ্যিখানে রক্তে রাঙা মধুকোষ। অনুপমের অজ্ঞাতসারে অনুভা অনেকক্ষণ তাকে দেখল। ইচ্ছে হ'ল দাদার ওই নিরপেক্ষ মুখটি বুকের মধ্যে ধরে : কান্নায় ভিজিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে চোখের জল চাপলে। ইদানিং প্রায় তাব চোখে জল আসে—কাঁদলে তার বুক ভরে ওঠে। গভীর ভালবাসায় সে প্রশান্ত হয়। ভালবাসার নিস্পল বৃন্তটির উপর বসে সে চারিদিকে তার শান্তির পাপড়ি বিছিয়েছে। ফুলের বাহার নয়—ফলের পরিণতি। সে জানত তার ভয় নাই। বিকাশ সম্পর্কে তার কোনো সংশয় নাই। তার মাধ্যাকর্ষণে অহরহ সে স্পন্দমান। তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না সে। সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে! কিন্তু হঠাৎ অনুভা বোধ করল তার অপেক্ষার আড়ালে আর একটি আকর্ষণ যার বেগ অকস্মাৎ নয় যাকে ভালবাসা বলা যায়না, যা পরোক্ষ নয় ; একটি পৃথক ধারাবাহিক পথ রক্তানুবেক্ষণিক নৈর্ব্যক্তিকতায় তার মধ্যে মিশে হারিয়ে গেছে। সেই পথে অনুপমের যাতায়াত তাকে চঞ্চল করে, সেই পথে একলা দাঁড়ায় তার ব্যথার মুখোমুখী। ভাই বোনের এই পরিব্যাপ্ত বেদনার সমুদ্রে প্রতিদিনকার পৃথিবী বুদ্বুদের মত ভাসে ও ডোবে। আচমকা তার মনে হল তার ভালবাসা একটা কাঁটার মত : বেঁধে! তার সমগ্র সমর্পণের মধ্যে সজাগ তীক্ষ্ণ ও অনুলুপ্ত। বিকাশ বলে 'ছায়া', 'দুঃখ দাও তুমি' ; সভয়ে অনুপমের দিকে তাকাল সে। অথচ এ'থেকে পার নাই।

—কলকাতায় থাকবে কদিন। অনুভা প্রশ্ন করল।

—বোধ হয় একদিনও নয়।

—এত ভাল তোমার লাল ধূলোওড়া পশ্চিমা সহর।

—ওই যে বলছিলি ভেবে কি হয়। মন ছড়িয়ে দেবার মত যথেষ্ট আকাশ পাওয়া যায়।

—কিছুদিনের ভেতর আসবে না বোধ হয় ; এতদূরে আছ যে করলেই তোমার দেখা পাওয়া যায় না।

—ইচ্ছে করে কোনো সময় ?

—স্পষ্ট করে কিছু মনে হয় না ; সব ঝাপসা মনে ভাসে।

অনুপম তীক্ষ্ণ করে ওর মুখের দিকে তাকাল :

—খুব সুখী হয়েছিস অনু! খুসী তোর চোখে মুখে উথলোচ্ছে। ভুলে যাওয়া ভাল।

—একদিন যদি হঠাৎ তোমার কাছে চলে যাই'ত বেশ হয়।

—একথা কেন মনে হয় তোর !

—এমনি হল।

অনুপম আবার তাকাল ওর সম্পূর্ণ মুখটির দিকে। রেখায় নিটোল, শান্তিতে নিবিড় মুখ, কিছু পেল না খুঁজে।

—বিকাশ কোথায় ?

—আজ কোথায় সাহিত্য সম্মিলন আছে।

—সেই বড়মা আছেন।

অনুভা সুন্দর হাসল।

—একটা কথা বলবি।

হাস্যোজ্জ্বল চোখ অনুভা তাকাল।

—ঈর্ষা হয়না তোর।

—আমি জানি আমার কাছে একদিন ফিরে আসতে হবে।

—সে কি! তোর প্রেম! এত নিরুদ্বিগ্ন কি করে। তুই আর বাবা সমান! অসম্ভব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারিস।

অনুভা তখনো হাসছিল।

—তোমার মনে পড়ে যে রাত্রে বাবা মারা যায় !

—বাবার কথা খুব ভাবিস।

—যখন তখন মনে পড়ে।

জানালায় দাঁড়িয়ে অনুভা বিদায় দিলে অনুপমকে। মাঝ পথে বাস থেকে নেমে পড়ল অনুপম। সরাসরি এসে ঢুকল একটা হোটেলে। অনেক বন্ধুরা

এখানে এসে জমা হয়। আশে পাশে মেয়েমানুষগুলো ছিটিয়ে থাকে, ছাঁদিয়ে চুল ফেরায়, রুজ মাখে। আভিজাত ভাবে খুসী রাখে পরাজিত আত্মাদের। তাস পিটতে পিটতে গ্লাসে হালকা চুমুক আর পলকা চুমু জীবনের স্রোত বাড়িয়ে দেয়। পুরানোদের ভেতর দেখতে পেলে আহ্মেদকে। একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে হাঁটুর উপর বসিয়ে আদর করছিল। অনুপমকে দেখে লাফিয়ে উঠল।

—কি হে, ফেরারী আসামীদের মত গা ঢাকা দিয়েছিলে কোথায়।

—চাকরী। গেল কোথায় পুরানো দল।

—বাসা ভাঙা ভালবাসার পাখী। পুরাণো রেকর্ডের দু'একখানা গান আহ্মেদ চমৎকার গাইতে পারতো।

অনুপম হেসে উঠল। মেয়েটিও পিছন থেকে কলকলিয়ে ওঠে।

—সব লড়াইয়ে। ভেবেছিলাম তুমি'ও নাম লিখিয়েছ। বড়দরের মেকানিষ্ট।

—তুমি যাও নি।

—পা মচকে গেছে হে! পুরোনোদেব ভেতর আসে দু'একজন। এই'ত বিকাশ এসেছিল সেদিন। হারল কিছু টাকা।

খেলতে খেলতে বেশ খানিকটা রাত হল। অনুপম মাঝে মাঝে চনমন করে তাকাচ্ছিল। ট্যাশ আর ইহুদি মেয়েগুলোর ভীড়ই বেশী। বাঙালী মেয়ে দুটো ভালো লাগছিল না খেলতে। জিতেছে কিছু—কিন্তু মন বসছিলনা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে একাগ্র ছিল, উন্মুখ ছিল! অনুভার বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমতঃ সে তার গন্তব্য স্থান ঠিক করতে পারে নি। হঠাৎ অনুভা তাকে স্পর্শ করেছিলো দীর্ঘ দিন রাত্রি ও সময়ের বিস্তীর্ণতা পেরিয়ে আবার সে অনুভব করলে আত্মার নিরপেক্ষতা। অনুভার সুন্দর, মোলায়েম স্বরে তার আভাস ছিল। কিন্তু মুখের রেখায় তার চিহ্ন খুঁজে পায় নি। অনুভা সুখী। কিন্তু তার ঈর্ষা নাই। সে প্রাতিভাসিক। অনুপমও তাই ভেবেছিল যে সুখের মধ্যে সে সম্পূর্ণ হবে, খুসীর মধ্যে অতীতকে অতিক্রম করবে। কিন্তু অনুভাকে দেখে মনে হল বেঁচে থাকবার যে গতানুগতিক ক্ষেত্রটির মধ্যে সুখী হতে চাওয়া তা' কোনো একটি পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতার যোগ চিহ্ন ফল। এই অতীত আমাদের সত্তায় অবচেতন।

কিন্তু আমাদের কোনো বর্তমান নাই। বিকাশ কোনোদিন ফিরবে। অনুভার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল সে—একদিন অবশ্য বিকাশ আসবে—কিন্তু কেন এবং কিসের জন্য। সে ভুলে ছিল ভাল ছিল। কিন্তু ভোলাটাই ভুল। ঝাপসা সব মনে আসে অনুভার! হঠাৎ এক একদিন ইচ্ছা করে! হয়ত সে ডুবে যাবে প্রেমের মধ্যে। ডুবে গিয়ে পাবে বিকাশকে। হঠাৎ মনে হল সেইটাই অনুভার সৃষ্টির অন্ধকার যেখানে সে নিঃশান্ত, সঙ্গীহীন ও পরিত্যক্ত। আর সেও হয়'ত তাই চায়। তার সচেতনতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে নতুন হয়ে উঠতে। সেটা সুখের আরাম নয়, একটি গভীর যন্ত্রণাদায়ক বেদনাবোধ—অনুভার প্রেমের মত, অপেক্ষার মত! চনমন করে তাকাল অনুপম। খেলা জমে উঠেছে। বাইরে হলে এসে বসল। টেবিলে টেবিলে মদ আর হল্লা চলেছে। খাকী কোর্তা পল্টনদের ভীড়ই বেশী। মেয়েগুলো ঝকমক করছে। দুটো ফিরিঙ্গির মাঝখানে টেবিলের উপর বসে একটা মেয়ে পা দোলাচ্ছে। পর্দার আড়াল দিয়ে পা খানা চোখে পড়ল: মডেলের মত। পেশীসরল, উন্নত, সজীব, মাংসে দাগ পড়েনি। ডিমের মত সুললম্ব; জানু থেকে ঈষৎ বিস্তৃত; বাঙালী মেয়ের পা নয়—অরুণার হতে পারত। নখ ম্যানিকিউর করা। সিপ করতে করতে পা খানার গড়ন দেখতে লাগল। চোখে সংযোগ আছে। আহ্‌মেদ একসময় উঠে এল। কিছু টাকা হেরেছে। দু'জনে পথে নামল। একটা মাদ্রাজী মেয়েকে চ্যাঙদোলা করে একটি মার্কিন গোরা হোটেল থেকে নেমে ট্যাক্সিতে উঠল। মেয়েটা গলা জড়িয়ে কলকল করে ওঠে।

—একটা বই লিখব ভাবছি। আহ্‌মেদ হঠাৎ বললে,—মাল মশলা সব জোগাড় করেছি। Diffusion of blood. Diffusion of cultureএর পাদপূরণ। মানুষের চেহারা নতুন। নীল চোখ, নীচু কপাল, সরু হাড় আর চাপা চোয়াল; রক্তের রঙ ধূসর। এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।

—চীনেরা কি করেছে। অনুপম কথাটা গায়ে না মেখে বললে,—মোগল আমলেও তাই ঘটেছে। গ্রীকরাও এ'দেশ থেকে মেয়ে নিয়ে গেছে। রক্তের বিশুদ্ধতা একটা কাল্পনিক বস্তু—অষ্টাদশ শতাব্দীর।

—বিশুদ্ধতা নয় প্রজননের কথা বলছি। ভিৎ পাকা না হলে'ত মানুষ

গুলো হাওয়ার মুখে কুটো। ধর চীনের কথা: ধর্মের এত মিল থাকতেও জাতটা এখানে একটেরে কেন? এইটাই ইলিয়ট স্মিথের ভুল। কালচারটাই বড় কথা নয়। দেওয়া-নেওয়া ছু'টোই ঐতিহাসিক ভাবে সম্ভব হয় যখন সমাজের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এটা যুক্ত হয়। উপায় থাকে না বলেই উপায়ের খোঁজ। চীনের বনিয়াদটা এখানে পাকা নয়। তাদেব রাষ্ট্রশক্তি এখানে অকর্মক। মানুষগুলোকে বেঁটে দেখায়। সব এক চেহারা মনে হয়। জুতোর দোকান আর দাঁতের দোকান ছাড়া আমাদের সঙ্গে তাদের যোগটা প্রফেসর আর পর্যটকদের বইয়ের পাতায়। কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে দেখ কম্যুনিটি হিসাবে তাদের জোরটা কত। তাদের দাবীর শিকড় একই মাটিতে পাশাপাশি গেড়ে বসেছে। তার মূলে একটা বিরাট রাষ্ট্রশক্তির বহুদিনকার অধ্যবসায়। গ্রীকের বেলাও তাই, কিন্তু তার জেরটা অল্প দিনের; ভারতবর্ষের পুরানো মাটিতে তাব বীজ ফলতে পাই নি। ঠিক আজকের যুদ্ধটা তেমনি একটা সুযোগ দিয়েছে।

—সুযোগ বলতে কি বোঝাতে চাও।

—একটাকে বলেছি diffusion of blood. অপরাকে বলব: pervartion of domestic religion into racial politics. ধর, ভারতবর্ষে মুসলমান স্বার্থ। এর ক্ষেত্রটা রেশ কালচার। সেই দিক থেকে এ'দের স্বার্থটা সব সময় রাষ্ট্রনৈতিক। তাই সময় যখন এলো আশ্চর্য রকমের পালটে নিলে এদের ভূমিকা।

—ইতিহাসের দিক থেকে'ত এইটাই সাধারণ। সুযোগটাই ঐতিহাসিক।

—কিন্তু হাওয়া বদলের দিকটা লক্ষ্য কর। আমি একটা উদাহরণ ব্যবহার করেছি মাত্র। মোগল আমলে রাষ্ট্রশক্তি এদের হাতে আসে। ভারতবর্ষের মাটিতে যে বীজ পোঁতা হয়েছিল তার ফল দুটো জাতই খেয়েছে তারপর মজে গেছে। লক্ষ্য করে দেখো ভারতবর্ষের সভ্যতা বলতে তখনো বোঝাত একটি অখণ্ড অভিব্যক্তি। সেই 'এক দেহে হল লীন'। তাই ইংরেজের হাতে যখন চলে গেল রাষ্ট্রব্যবস্থা দুটি সম্প্রদায়ই বোধ করেছিল সেই একই ক্ষতি: সেই একটি আঘাতেই দুটি জাত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তফাৎটা আজকে উদগ্র হয়ে

উঠল কোনদিক থেকে ? এইটাই আমি বলতে চাইছিলাম পম। যেটাকে আমরা ইতিহাস ঘেঁটে প্রমাণ করেছিলাম মরে গেছে সেটা আসলে চাপা ছিল।

—সেটা কি ?

—analysis of religion. কারণটা খুঁজতে হবে ধর্মের দিক থেকে। ধোঁকাবাজী ওইখানেই। মোগল আমলের উদার নীতিতে বৈষম্যটা ভুলে থাকা সম্ভব ছিল না। ওটা একটা গৌণ কারণ। আসলে, ধর্মের ভিতটা মুসলিম সভ্যতায় খুব বনিয়াদ নয়, জীবনের নীচে পর্যন্ত গড়ায়নি, মাটিতে শিকড় গেঁথে নিশ্চল হয়ে যায়নি। সংঘাতের মধ্য দিয়ে বার বার আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে বলে ধর্মের বিশুদ্ধতা থাকেনি। সেইজন্য বেগটা প্রিমিটিভ। রাষ্ট্রের দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে আরামের লাগামটা আলগা ছিল। হিন্দু সভ্যতার আত্ম-সম্পূর্ণতায় টোল খায় নি। ঐতিহ্যের দিক থেকে পথ করে নেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু গ্লানির মধ্যে, পরাজয়ের মধ্যে সেই রিলিজন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল! আরো দেখো, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম জন আন্দোলন তুলেছে এই মুসলমান সমাজ। তারপরে, সিপাই বিদ্রোহে দেখো, দুটো জাতের রাষ্ট্রনীতিক চেতনা একটি বিক্ষোভে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সম্মিলিত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটা সামান্য সুবিধাবাদী মুসলমান নেতা এদেরকে সামনে রেখে মিছিল চালিয়েছিল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য, অথচ সেইটুকু সময়ের মধ্যেই দেখো নিজেদের সংবদ্ধ করে ফেললে কেমন করে। চেতনাটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কত ব্যবহারিক হয়ে উঠল। আজকে দেখো পার্থক্যটা কি ভয়ঙ্কর! কবেকার পোঁতা বীজ আজ হয়ে উঠেছে মহীরুহ। কোনো মিলই আজ খুঁজে পাবে না দুটো জাতের মধ্যে। এ'দের মধ্যে সত্যিকারের প্রলেটারিয়েটের সংখ্যা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, নেতারা রাষ্ট্রের দিক থেকে না দেখে ধর্মের দিক থেকে দুটো জাতের হাত মেলাতে গেছল। সহযোগীতা দানা বাঁধল না। মাঝখানে বিদেশী রাষ্ট্রের স্রোত : সুবিধাবাদ! সবার ওপরে যুদ্ধ। একটা কথা পম, এটা transitionএর যুগ। এর বিপুল বেগটা চোখ দিয়ে দেখবার নয়! পালটাচ্ছে, পালটাচ্ছে,—মানুষ, নীতি, মানুষের ধর্ম, ঈশ্বর পর্যন্ত বিকৃত হয়ে উঠল।

—ভয় করছো কোন খানে ?

—ভয়ের নয় পম। তাল রাখতে পারার কথা বলছি। সুবিধার মধ্য দিয়ে সকলে পথ করে নিতে চায়। কোনো ইতিহাসেই এর সুফল ঘটেনি। যুদ্ধ মানুষকে আদিম অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—এসো, সিগারেট খাও। কথার মাঝখানে বলল অনুপম,—ক' পেগ টেনছ। হাসিতে তার চোখ ঝিলিক দিচ্ছিল।

—না, না মাতাল হই নি। আমার কথা তুমি বুঝছ না।

—আমি তা' বলছি না। তোমার subject যে sociology ছিল তা' জানি। এম, এল, এ, হবার চেষ্টা করছো না কেন ?

—কি হবে তাতে ?

—তবে যুদ্ধে যোগ দাও। দেবে ? আমি দিচ্ছি। একদিন তোমাকে আমি উত্তর দেবো।

আহ্‌মেদকে ছেড়ে ফের এল অনুপম হোটেলে। চোয়াল তার শক্ত হয়ে উঠেছে: তীক্ষ্ণ চোখ। '১৫' নম্বর ঘরে এসে টোকা দিলে। গনগনে গাউন পরেছে মেয়েটা। ভরালো বুক। ঢালু কোমব। এইমাত্র ফের ড্রেস করেছে।

* * *

গোল, লাল অন্ধকারের মধ্যে নির্জন, নিঃসীম, নিঃসহায় হারিয়ে যায় অনুপম। এক বিচিত্র আদিম গন্ধ তার মুখের মাংসে লাগছে।

সোফায় বসে কপালের ঘাম মুছলে অনুপম। মেয়েটা জানালা খুলে দেয়।

দৃষ্টি একাগ্র হয় অনুপমের। ঘন বুক। পুরু উৎসঙ্গ প্রদেশ। ডিমের মত নিটোল, সরস পা তির্যক ছড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চল লোলুপতায় অনুপম নির্বেগ বসে থাকে।

চাপা হাসির তরঙ্গ অনুপমের শরীরের অনেক নীচে থেকে ধ্বনিয়ে ওঠে।

* * *

টিক ! টিক ! টিক !

আবার সেই হাসির ভৌতিক তরঙ্গ। অনুপম খানিকক্ষণ আনমনা হয়ে যায়।

খানিক থামে। অনুভব করে। অতলের কোন উৎস মুখ হ'তে ঐ হাসির তরঙ্গ উৎসারিত কিছু ঠাহর করতে পারে না।

* * *

অনেক তারার মাঝে একটি তারা। একটা উড়ো জাহাজ লাল আর সবুজ আলো জ্বেলে উড়ে যাচ্ছিল।

—সকলকে পেরিয়ে,—আকাশকে পেরিয়ে, মানুষের সভ্যতাকে পেরিয়ে। ট্রেণের জানলার ফোকর থেকে মুখ বাড়িয়ে অনুপম দেখছিল।

* * *

মদ খেয়ে বস্তির এক মেয়েমানুষের বাড়ী মারামারি করার ফলে ফোরম্যান হাজত বাস করছে দু'দিন! মেয়েটা হাঁসপাতালে। সর্বানী কেঁদে ফেললে। সুন্দর চোখ দুটি ভয়ে শুকিয়ে গেছে। অনুপম জামিনে খালাস করিয়ে আনলে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। দু'দিনে দাড়ি শক্ত হয়ে গেছে।

—এসে গেছিস। পিঠ চাপড়ে বলে উঠল,—তোকেই ভাবছিলাম।

—মারামারি করতে গেলে কেন?

—হয়ে গেল। মাগীটা হাড় বজ্জাত। বো সাহেব ওকে ঘুষ দিয়ে লাগিয়েছিল পিছনে।

—তোমার বৌ যে কাঁদছিল।

—ও'ত কাঁদবার মেয়ে নয়। তা'হলে তোর জন্য। হো হো করে হেসে উঠল ফোরম্যান,—কলকাতায় কাজ মিটল। বোন ভাল আছে?

—আছে। লড়াইয়ে নাম লিখিয়ে এলাম ওস্তাদ্। উড়ো জাহাজের পল্টন।

—তুই'ত যুদ্ধ পছন্দ করতিস না।

—পছন্দের কথা নয়! নিষ্কর্মা হয়ে যাচ্ছি। হাতের কাজ চাই, পায়ের জোর চাই : মন চালাও থাকবে।

—'মন' 'মন' করিস কেন অত : মন কি?

—সেইটাই'ত জানতে চাই। তোমার কি মনে হয়?

—মন বলে কিছু আছে নাকি! যা ভালো লাগে তাই মন। মনের ভালো লাগা।

—আর বা ভালো লাগে না।

—স্বভাব। যেমন মেয়েমানুষ। ওদের ভালো লাগে না অথচ, না হলে চলে না।

—স্বভাবকে কাটিয়ে না গেলে চলে না ওস্তাদ। ঘুরে ফিরে এক জায়গায় দাঁড়ায়। গড়পড়তা মন নয়। নিজেকে বন্ধ না করলে মনের গতি নেই। নিরপেক্ষ মন।

—বৌকে বলেছিস। জানে ও?

—না। এখনো সব ঠিক হয় নি।

—তোকে ও' খুব ভালবাসে। জানিস, মেয়েমানুষগুলোর মনে কোন হাড় নেই।

—রাগ হয় না তোমার।

—দূর। একটা কথা বলব—হাসবি না। মদ না খেয়ে হয়ত দুর্বল হয়ে গেছি। যে মেয়ে ভালবাসে সে সুন্দর হয়ে ওঠে আপনাতেই। তোকে ছাপিয়ে ওর ভালবাসা। আমাকেও যখন প্রথম ভালবাসত তখনো এমনি ছিল। ঢেউটা তলায় তলায় অনেকখানি জমি ভিজোয়। চল পান্নাকে দেখে আসি।

ফোরম্যানকে দেখে মুখ ঘোরালে পান্না। মেয়েটি বস্তির। কলে কাজ করতো! কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাত ধরতে খিস্তি করলে প্রথমে, তারপর কেঁদে ফেললে। কপালে হাত বুলিয়ে দেয় ফোরম্যান।

দু'দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে অনুপম সব ঠিক করে ফেললে। রয়েল কোর্সে ঢোকবার অনুমতি পেল। তার অদ্ভুত লাগছিল। নিজেকে একাগ্র ও উজ্জ্বল মনে হয়। সকলকে ছাড়িয়ে তার নিজেকে মনে পড়ে। সে'দিন আহ্‌মেদ তাকে অনেক কথা বলেছিল। আজকে হয়ত সে উত্তর দিতে পারে: নির্ভুল আর অকাট্য উত্তর। আদিম পাখীর মত তার আধিভৌতিক ডানা! সূর্যের কাছাকাছি তার আনাগোনা! অনেক তারার মধ্যে একটি তারা। একটি আদিম, নিরালম্ব উল্লাস অনুভব করে অনুপম। এই'ত যুদ্ধ! রাস্কিনের মতে নয়। সভ্যতার অগ্র-পশ্চাৎ অনুপম একবারও ভাবেনি; কি ভেবেছে সে নিজেই জানে না। কিন্তু, তবু এটুকু সত্যি সে আজ যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

—ভালবাস আমাকে তুমি। লাজুক হয়ে উঠেছে সর্বানীর গলা।

—কেন?

—বল না?

—ভালবাসা কি জানি না।

—বল, ভালবাস। কাউকে কোনদিন বাসতে না?

—তুমি'ত তোমার স্বামীকে ভালবাস।

—জানি না। অনুপমের চোখের দিকে চেয়ে হাসল—একদিন'ত সব্বাই সকলকে ভুলে যায়। কি ভেবে বলল সর্বানী।

অনেক সময় কেটে গেল। সর্বানী আঙুল দিয়ে তার শরীরে দাগ কাটে। গলায় তার আবেগ মরে গেছে। স্নিগ্ধ, সহজ আর সুন্দর আওয়াজ রিণরিণ করে, চোখের দৃষ্টিতে একাগ্রতা ধুয়ে গেছে।

—জানতাম, তুমি থাকবে না! প্রথম তোমার চোখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলাম একদিন চলে যাবে। এত কঠিন চোখ। সরল তাকায় অনুপমের চোখের দিকে। যখন সে বুঝতে পারলে অনুপম তাকে চায় না, নারীকে চায় না, তার কামনা সঙ্কুচিত হয়ে এল। তার ভেতরে ঈর্ষা ছিল, ভয় ছিল। হিংস্রতায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ সে পালটে গেল। করুণায় নিবিড় হয়ে উঠল। অনুপমকে স্নেহ করতে, সেবা করতে, ছায়া দিতে, মধু দিতে, চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল বুলিয়ে দিতে।

—এখন কোথায় যাবে। চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল।

—মিশর।

—ভালো লাগবে যুদ্ধ করতে। মনে পড়বে।

কেউ কোনো উত্তর দিলে না। ভোরের ঠাণ্ডা আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঠের শিশির গন্ধ-ভরা বাতাস এক ঝাঁক খবে এল। দুজনে শীতে নড়ে উঠল। পরস্পরের দিকে চাইলে। হাসলে!

# শেষের পরিচ্ছেদ

একটি পরিপূর্ণ দিন অনুভার পাশে বসে কাটিয়ে দিলে বিকাশ। কখনো তাকে এ'বই সে'বই থেকে পড়ে শুনিয়েছে। কখনো চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কখনো একখানা হাতের মধ্যে তার মুঠি ধরে চুপ করে তাকিয়ে থেকেছে জানালার বাইরে। ঝলমল রৌদ্রে আতপ্ত একটি দিন অনুভার পাশে বসে কাটিয়ে দিলে বিকাশ।

মাঠের ওপারে পাহাড়। ফুলে, ফেঁপে, কুঁকড়ে, ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের গায়ে। সকালবেলায় দেখায় কালো, দুপুরবেলা নীল, বিকেলবেলা ধূসর। প্রথম কিছুদিন এখানে ভালো ছিল অনুভা। খিদে হ'ত, উঠত, হাঁটত; সকালবেলা কখনো কখনো বেড়িয়ে আসত বিকাশের সঙ্গে। স্থান পরিবর্তনের প্রথম গুণগুলো কিন্তু স্থায়ী হল না। পুরাণো উপসর্গ ফের মুখ দেখালে। অল্প অল্প জ্বর, কাশি, প্রসবের পর থেকেই বেড়ে উঠল। সন্তানটি বাঁচেনি। অনেকগুলো ইনজেকশনের পরও উন্নতি দেখা গেল না। এখানে হাজারিবাগে ছুটি নিয়ে চলে এল।

দু'জনে সকালবেলা ঘুরে বেড়াল বাগানের লনটুকুতে। অনুভা ফুল তুললে বিকাশ প্রজাপতি ধরলে। তারপর চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়লে। তিনখানা চিঠি এসেছিল। একখানা বাড়ীর। অনুভার শরীর কেমন। কতগুলো ইনজেকশন হল। জায়গাটা শরীরে খাপ খাচ্ছে কিনা।

দ্বিতীয়টা অরুণার। সে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে। কারণ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে শ্রেণী সংগ্রাম তার বিভেদবিন্দু মাতৃত্ব। এরপরই দু'জনের দায়িত্ব দু'দিকে। বর্তমান রাষ্ট্রে এই বিভেদের ফলে নারী শোষিত ও পুরুষ শোষক। সোভিয়েট

ব্যবস্থায় কতকটা মীমাংসা রয়েছে। কিন্তু পুরাণো গলদ ফের নতুন চেহারায় দেখা দিচ্ছে। সে ভাবছে।

তৃতীয়খানা অনুপমের। যুদ্ধে যাচ্ছে। উড়োজাহাজের পল্টন হয়ে। বিদায়!

দুপুরবেলা অনুভাকে নৌকাডুবি পড়ে শোনালে। বিকেলবেলায় বসে বসে দু'জনে ছবি দেখলে। ন'টার মধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়া ডাক্তারের নির্দেশ। অনুভা শুয়ে পড়ল। খানিকটা পড়াশোনা করলে বিকাশ। তারপর সেও শু'য়ে পড়ল। তারপর কেন জানি না কখন তার ঘুম ভেঙে গেল, হয়ত অনেক জ্যোৎস্না তার গায়ে এসে পড়েছিল বলে। তাকিয়ে দেখলে কেউ ঘরে নাই! আর জ্যোৎস্নার জোয়ারের মধ্যে সে শু'য়ে আছে। সমস্ত অন্তরাত্মা বিকাশের শিউরে উঠল। মনে হ'ল তার যেন কেউ নাই। একা। নিশ্চিহ্ন একা, নিরাবৃত একা, পরিত্যক্ত একা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অনুভাকে দেখতে পেলে। উন্মুক্ত জোছনার মধ্যে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকে দেখছে। হঠাৎ মনে হল অনুভা মরে গেছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে অনুভার প্রেতাত্মা তাকে লক্ষ্য করছে। তার হাড় শুদ্ধ কেঁপে ওঠে। হাওয়ায় অনুভার চুলগুলো উড়ছে ঈষৎ। একটা সরু ডাল তার গালে হাত বুলাচ্ছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল বিকাশ অনেকক্ষণ। তারপর উঠে এসে দাঁড়াল আঙিনায়। অনুভা হাসল। হাতছানি দিয়ে ডাকল। তারপর অনেকক্ষণ বাদে অনুভার গভীর বুকের মধ্যে মুখ রেখে সে কাঁদছিল। তার ঠাণ্ডা, ভিজে মুখে অনুভা হাত রাখলে। চুলের ওপর মুখ রাখলে।

—কেন তোমাকে পাব না অনু। পেয়ে হারাবো।

বিকাশের গালে গাল ঠেকিয়ে অনুভা বসেছিল। হাসিতে অশ্রুতে তার ভাসমান মুখ চাঁদের আলোয় চিকচিক করে।

—ভুল করেছি। আঘাত দিয়েছি। মাপ করো।

—ছিঃ, বলো না ও'কথা। বলতে নেই।

—যেওনা তুমি। বাঁচবো না আমি তোমায় ছাড়া।

—যাবো না আমি। থাকবো তোমায় ভরে।

—ফুলের গন্ধ তোমার গায়ে। চাঁদের আলো মেখে কি অপরূপ তুমি। এত রূপ তোমার আগে দেখিনি কেন অমু।

—চাওনি কিছু। পাওনি কিছু।

—আজ চাই। তোমায় চাই। পেতে চাই। ভালবাসা চাই।

—নাও। এবার নাও। চেয়েছিলাম তোমাকে পেলাম তোমাকে। আর ক্ষোভ নাই। কাঁটা ছিল কাঁটা গেল। এবার ফুল নাও। আমার খোঁপার ফুল। আমার মুখের চুমো নাও।

* * *

—হ্যালো, বিকাশ।

—হ্যালো, পম। অমুতা নাই। সে মারা গেছে। কানতে কানতে চলে গেছে।

—জানি। আমার দুঃখ নাই। তোমাকে দেখতে এলাম। কেমন আছ?

—বসে আছি। A lover mourns at the loss of her love. ইয়েটসের কবিতা পড়ছি:

Pale brows, still hands and dim hair,
I had a beautiful friend.
And dreamed that all despair
Would end in love in end
She looked in my heart one day
And saw your image was there
She has gone weeping away

—এবার তুমি স্মৃতির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো বিকাশ। জীবনের মধ্যে দাঁড়াও। আমার কথা শোনো। জীবনের আনন্দ আমি গায়ে মেখে আসছি। যে জীবন স্মৃতিকে পেরিয়ে, মৃত্যুকে ছাড়িয়ে।

—আমি দ্রষ্টা। আমি সুখে হাসব। দুঃখে কাঁদব। বিলাপ করবো আমার প্রিয়াবিরহের। জীবনকে আমি অনেক দেখেছি পম: সুজাতাকে, বড়মাকে! শাখের মত চিকণ, আকাশের মত অনায়াস, পৃথিবীর মত যার মুখ।

—ও জীবন নয়—জীবনের ধারণা—যার ধৃতি নাই। যা' নির্ণিরেখ। ও'র স্বস্তির মধ্যে একটি চড়ুই পাখীর মত একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—আমি মৃত্যুকে দেখেছি : অনুভাকে! স্তব্ধ। নিমগ্ন। শীতল ও প্রেমময়।

—ও' মানুষের কল্পনা। প্রাতিভাসিক। যাকে কোনো দিন জয় করা যায় না। যা' অনধিগম্য।

—আমি বাস্তবকে দেখেছি : অরুণাকে! জীবন মৃত্যুর মধ্যিখানের অফুরন্ত চাঞ্চল্য।

—ও' হ'ল আপেক্ষিক। সমাজ চেতনার চাপবোধ। তুমি বাঁচো বিকাশ। জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এবার তুমি বাঁচো। অনাবৃত, পরিমুক্ত, পরিপূর্ণ জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি বাঁচো।

স মা প্ত